একটি যুগের জন্মকথা

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮
—ডিসেম্বর, ১৯৩১

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
অজিতকুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

দাম : ১৬ টাকা

উৎসর্গ

অতীত, বর্তমান ও ভাবী – কোন কালই
সম্পূর্ণ গ্রহণীয় নয়, তেমনি আবার,
সম্পূর্ণ বর্জনীয়ও নয়।
যাঁরা এই ত্রি-কালের মধ্যে
সামঞ্জস্য ঘটিয়ে
নবাগতকে স্বাগত
করে নিতে পারবেন,
বইখানি তাঁদের উৎসর্গ করলাম।

ব. ভ. ম.

এই লেখকের অন্যান্য বই

শ্রেষ্ঠ গল্প
স্বর্গাদপি গরীয়সী
লীলাঙ্গুরীয়
পুঁটুরাণী
বরযাত্রী
নয়ান বউ
ফেরারী ফিরে এলো
কৈলাসের পাটরাণী
রাণু

ভূমিকা

একস্থানে নায়ক বীরেশ বলছে— 'ইতিহাস যে-পথ ধরে যাচ্ছে'—যুগধর্মেই—আমি তার কথাই বলছিলাম, ইতিহাসের পরিণতির কথা বলিনি। সেটা আমরা দেখতে পাবনা; কেননা, সেই শেষ পরিণতি, সেই শেষ অধ্যায় ভালো ক'রে এসে পড়তে এখনও অন্ততঃ একটা শতাব্দী লাগবে। দেখতে পাবনা, কিন্তু কল্পনায় তার একটা চিত্র এঁকে নিলে হয়তো ভুল হবে না। আমি জাতপাঁত-বিড়ম্বিত এই ভারতবর্ষের কথাই বলছি। একটা উজ্জ্বল চিত্র, বিপু! যুগযুগ-ব্যাপী অন্ধকারের পর বলে আরও বেশি উজ্জ্বল। বুদ্ধ পারেন নি, চৈতন্যদেব পারেন নি, অর্থাৎ ধর্ম যাতে ব্যর্থকাম হয়েছে, সেদিন কিন্তু বিনা আয়াসে, মাত্র কালের গতিতে হয়ে গেছে। সেদিনের শিশু যে-ঘরেই জন্মাক—ফেলে-আসা দিনের—ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল, যে-ঘরেই হোক, সে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি অ-জাতিশুদ্ধ মানুষের ঘরে জন্মাবে, বিপু। তার অন্য কোন পরিচয় থাকবে না, অন্য কিছু দিয়ে চিহ্নিত হবে না সে। সে-যুগ এখনও এসে পড়েনি বলেই এ-যুগের মানুষকে এত সহ্য করতে হচ্ছে।

*　　　　　*

এই গ্রন্থে সেই অনাগত যুগের কিঞ্চিৎ পূর্বাভাস দেওয়া রইল।

ব. ভ. ম.

এক

বিপাশা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে সোজা ঘরের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল, ডাইনে বারান্দার শেষ দিকে নজর পড়ে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—"আমি এসে গেলাম।"

ব'লে জানাতে হোল। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার শব্দেই বীরেশের টের পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হুঁস হয়নি, উল্টোদিকে মুখ ক'রে বারান্দার রেলিঙে পা তুলে চুপ ক'রে ব'সে ছিল। নিশ্চয় খুবই অন্যমনস্ক, কানে যায়নি। ওর কথায় ঘুরে ব'সে বলল—"ও !···এসে গেছ ?··· এসো, বোস।"

—ভেতরের একটা উদ্বেগকে চেপে রাখবার চেষ্টা রয়েছে কণ্ঠস্বরে। পাশে একটা চেয়ার রাখা ছিল, দেখিয়ে বলল—"বোস।"

উদ্বেগ চেপে রাখবার চেষ্টা বিপাশারও রয়েছে। একটা নার্ভাস্ কাঁপুনিও চেপে রাখবার চেষ্টাও তার দিকে; দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যেই একটু স্পষ্ট। না ব'সেই বলল—"কিন্তু আফিস তো ওদের বন্ধ হ'য়ে যাবে।···আমারই দেরি হয়ে গেল। তৈরিও তো নেই আপনি! উনি কোথায় ?—ধরণীদা।"

একটা গেঞ্জী মাত্র পরে বসে ছিল বীরেশ। বলল—"বোস তুমি, ক্ষতি নেই আফিস বন্ধ হয়ে গেলে; যাচ্ছিনা।···ধরণী একটু বাইরে গেছে।"

আসল কথাটা ব'লে ফেলে যেন বেশ হালকা হয়ে গেল।

সহজভাবেই বলল—“বোস'না। অনেক কথা আছে, মত বদলে ফেললাম।”

চেয়ারের হাতল ছুটায় ভর ক'রে ধীরে ধীরে নিজেকে নামিয়ে দিল বিপাশা। উদ্বেগে মুখটা রাঙাই ছিল এতক্ষণ, রক্তটা নেমে গিয়ে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। একটু নির্বাক হ'য়ে চেয়েই রইল ওর দিকে; কিভাবে কী বলবে ঠাহর করতে পারছে না। একটু পরে, যেন একটা অতি ক্ষীণ আশার খুঁট ধ'রে নিয়ে বলল—“আজকের জন্যেই বদলালো মত, না একেবারেই?”

“একেবারেই বিপু। ভেবে দেখলাম…”

“কিন্তু আমি যে ফেরার পথ বন্ধ করে এসেছি, বৌদিকে বলেই এসেছি…”

“কি বললেন তিনি?”—বীরেশও ওরই মতো আগ্রহভরে কথার পিঠে প্রশ্ন করল।

বিপাশা বলল—“মেয়েছেলে, উনি যেন আঁচ পাচ্ছিলেনই ক'দিন থেকে, এদিকে চেষ্টা করলেও কিছু চঞ্চল হয়েই গিয়ে থাকব। একটু হতভম্ব হ'য়ে গিয়ে 'ঠাকুরঝি!' ব'লে ওঠবার সময়টুকু পেয়েছেন, আমি ততক্ষণে সদর দরজা পেরিয়ে এসেছি। দাদা বাড়ি নেই, মাকে নিয়ে আশ্রমে গেছেন। খোকা খেলতে গেছে। বাবা সন্ধ্যের আগে ফেরেন না, তাঁর আহ্নিকের সময়। ততক্ষণ এদিকে যা হবার হ'য়ে গেছে। হয়তো আতালি-পাতালি হয়ে কোনরকমে বাবাকে ডেকেই আনিয়েছেন বৌদি…কী করি? ফিরি কোন্ মুখ নিয়ে আমি!…কী সর্বনাশটা হোল!…”

কাঁপুনিটা বেড়ে গেছে।

আদ্যোপান্ত সব বিবরণটা দিলে। বীরেশেরও ধরে এসেছে গলা। বলল—“আমি সর্বনাশটা বাঁচাতেই ও-পথ ছেড়ে দিলাম বিপু।… চলো বরং আমিও যাচ্ছি; বৌদিদিকে সব কথা বলি কাকা এসে পড়বার আগে। যদি এসে পড়েই থাকেন, পায়ে ধ'রে ক্ষমা চেয়ে নোব।

আমিই তো দোষী। তিনি মহাপুরুষ, অনেক দেখেছেন, যুগের দুর্বলতাই তো, ক্ষমা করতে পারবেন…"

"কিসের দুর্বলতা!"—মুখটা হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল বিপাশার, বলল—"বামন-কায়েৎ, এই তো? আমি জাত খোওয়াতে বসেছি, তাই না? কিন্তু জিজ্ঞেস করি, জাত ছাড়া মানুষের আর কিছু নেই? বলুন!…আমাদের বংশে ন' বছরের মেয়েকে সত্তর বছরের বুড়োর হাতে সঁপে দিয়ে জাত—মানে কুলীনত্ব বজায় রাখা হয়েছিল। সে দুগ্ধপোষ্য শিশু—বুঝে গিয়েছিল—না বুঝলেও উপায় ছিলনা—কিন্তু আমাকে…আমাকে যে আপনি…সব জেনেশুনেও…"

—বলতে বলতেই দু'হাতে চোখে আঁচল চেপে হুহু করে কেঁদে উঠল বিপাশা।

বেশ খানিকটা নীরবে কেঁদে যেতে দিল বীরেশ। তারপর ডান হাতটা বাড়িয়ে পিঠেই দিতে যাচ্ছিল, সরিয়ে নিয়ে বলল—"চুপ করো বিপু, লক্ষ্মীটি। মনে কোরনা আমি ঠিক পরীক্ষার সময়টিতে কাপুরুষের মত পেছিয়ে গেলাম।…মনে আছে সেদিনকার কথা? ভুলবেই বা কি করে? আজ থেকে তিন মাসের কথা—তিন মাস দু' দিন—ভরা বর্ষার সময়। ধরণী চিত্রা আর মলুকে নিয়ে বাজারে গিয়ে আটকে গেছে, তুমি এসে উঠলে। পথেই বৃষ্টি পেয়ে ভিজে গেছ, সোজা চিত্রার ঘরে গিয়ে শাড়ি-ব্লাউস পাল্টে বেরিয়ে আসতে—আমি সেদিনও এইখানেই ব'সে ছিলাম। তোমায় ডেকে নিলাম…"

কতকটা অন্যমনস্কভাবে বলতে বলতে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে যেন আত্মবিচারের ভঙ্গিতে বলে উঠল—"বেশ তো! এসব কাকেই বা শোনাচ্ছি!…হ্যাঁ, তোমায় যা বলতে যাচ্ছিলাম বিপু—আমি তোমার কাছে কথাটা আদায় ক'রে লাল কালিতে লিখে রাখলাম আমার ডায়েরিতে। আজ হঠাৎ পিছুচ্ছি না বিপু—সেইদিন থেকেই আমার পেছুনোও শুরু হয়ে গেল…"

বিপাশা হেঁট মুখে শুনে যাচ্ছিল, আঁচলটা হাতে জড়ো করাই ছিল, মুখ তুলে চাইল। বীরেশের মুখে খুব ক্ষীণ একটা হাসি ফুটে উঠল, বলল—"হ্যাঁ, সেও এক অদ্ভুত ব্যাপারই। তার মাস চারেক আগে তুমি যেদিন চিত্রার সঙ্গে এসে এ বাড়িতে পা দিলে—একদিনেই দু'জনে কলেজে নাম লিখিয়ে—একই কম্বিনেশনে—সহপাঠিনী হিসেবে ভাব হয়েছে—বলতে গেলে সেই দিন থেকেই আমি ক্রমাগত এগিয়েই চলেছি। অনেক বাধা—প্রধান, জাত—তা'ও একেবারে দুরতিক্রম্য—উল্টোটা হলেও কথা ছিল। জাত আমি মানি না—কিন্তু এক্ষেত্রে তুমি উত্তম, আমি অধম হ'য়ে বাধাটা যেন আরও…"

"আমিই কি মানছি?"—আবার মুখটা কঠিনই হয়ে উঠল বিপাশার, চাপা কান্নার বেগে দু'বার ফুঁপিয়েও উঠল।

বীরেশ বলল—"এই যুগে, যখন পৃথিবী থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে মানবার জিনিসই নয় ব'লে কেউ আর মানতে চাইছে না। এই যুগ না বলে এই জেনারেশন (generation) বলাই ঠিক। তাও যে একধার থেকে সবাই, এমন নয়—জেনারেশন তো একটা নির্ধারিত সময় ঠিক ক'রে সারি বেঁধে উপস্থিত হয়না; আগু-পিছু হয়েই আসে, অর্থাৎ কারুর টান পেছনে, কারুর আগে। তবে এটা ঠিক যে, জয়যাত্রায় যারা আগুয়ান, জয় শেষ পর্যন্ত তাদেরই। ইতিহাস এই কথাই বলে।"

মুখ তুলে রেখে একটু যেন বিমূঢ়ভাবেই শুনে যাচ্ছিল বিপাশা। বলল—"আপনি যা বলছেন সবই তো আমার দিকেরই যুক্তি বিরুদ্ধ। বেশ তো, ব্রাহ্মণের মেয়ে হই, যাই হই, যুগধর্মে হোক, অন্য কিছুর জন্যে হোক, আমি তো মানছি—চলবে না তো আজ আমরা না মানলে—আপনি—আপনি আর 'অন্য কিছুর' কথাটা না স্বীকার করলেও…"

আবার উদগত অশ্রুটা একটা ঢোঁক গিলে সামলে নিয়ে বলল—"বেশ তো, আগুয়ানদেরই যখন জয়যাত্রা তখন আমরা সেই সঙ্গেই

কেন থাকব না ?···না, না, আমার আর উপায় নেই ! আপনিই আমায় এগিয়ে নিয়ে এসে আজ মাঝপথে এমন ক'রে একা ফেলে যাবেন না···উঃ বাবা গো ! কোথায় যাই ? কী করি ?···"

আবার আঁচল চেপে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

এবার আরও অনেকক্ষণ কেঁদে নিতে দিল বীরেশ। বিপাশা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসবার পরও একটু চুপ করে রইল। মনটা খুবই চঞ্চল। বুঝছে, যা বলতে চায় সেটা ঠিকভাবে বলা হচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ ধরে মনটা গুছিয়ে নিয়ে বলল—"ইতিহাস যে পথ ধরে যাচ্ছে—যুগধর্মেই—আমি তার কথাই বলছিলাম ; ইতিহাসের পরিণতির কথা বলিনি। সেটা আমরা দেখতেও পাবনা ; কেননা সেই শেষ পরিণতি—সেই শেষ অধ্যায় ভাল করে এসে পড়তে এখনও অন্তত একটা শতাব্দী লাগবে। দেখতে পাব না, কিন্তু কল্পনায় তার একটা চিত্র এঁকে নিলে হয়তো ভুল হবে না। আমি জাত-পাত-বিড়ম্বিত এই ভারতবর্ষের কথাই বলছি। একটা উজ্জ্বল চিত্র বিপু। যুগযুগব্যাপী অন্ধকারের পর ব'লে আরও বেশি উজ্জ্বল। বুদ্ধ পারেননি, চৈতন্যদেব পারেননি, অর্থাৎ ধর্ম যাতে ব্যর্থকাম হয়েছে, ভাবীকালের সেই শুভ দিনটি বিনা আয়াসে, মাত্র কালের গতিতে আপনি এসে গেছে। সেদিনের শিশু যে-ঘরেই জন্মাক—ফেলে-আসা দিনের ব্রাহ্মণ, বা চণ্ডাল—যে-ঘরেই হোক, সে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি অ-জাতিশুদ্ধ মানুষের ঘরেই জন্মাবে বিপু ; তার অন্য কোনও পরিচয় থাকবে না, অন্য কিছু দিয়ে চিহ্নিত হবে না সে। সে-যুগটা এখনও এসে পড়েনি বলেই এ-যুগের মানুষকে এত সহ্য করতে হচ্ছে।"

"তখনকার জন্যেও তো সহ্য করতে হবে ; বলুন ?"

একটু চুপ করেই রইল বীরেশ। যুক্তিটা তো অকাট্যই। তবে এই যে আজ তার মাঝপথে থমকে দাঁড়িয়ে পেছিয়ে যাওয়া, এই যে দ্বিধা, এর মধ্যেও তো মস্ত বড় একটা সত্য রয়েছে। যে-কথা

আনতেই মাঝখানে এত কথা এসে গেল, এবার তাকে কি ক'রে এনে ফেলা যায়?

একটু ভেবে নিয়ে বলল—"কথাটা খুবই ঠিক বিপু; কিন্তু একটা জিনিস ভেবে দেখো?—আমার কথাটা ছেড়ে দাও, পুরুষের প্রাণ কঠিনই, তার দ্বারা সবই সম্ভব। তুমি আজ যে জিনিস সহ্য করতে যাচ্ছ,—বা সহ্য করতে বলছি তোমায়—সমাজের একটা প্রচলিত নিয়ম ভেঙে—তার কাছে যে নির্যাতনটা সইতে হোত; সেটা কি তার চাইতে অনেক বেশি সহ্য করাই নয়?"

ওকে একটু বিমূঢ়ভাবে চেয়ে থাকতে দেখে বলল—"বুঝেছি, ভাষাটা যেন একটু হেঁয়ালির মতন হয়ে গেল। চেষ্টা করছি আরও স্পষ্ট করে বলবার। তোমায় যা করতে ডেকেছি, বিবাহ-রেজেস্টারি আফিসে গিয়ে সেটা করে ফেললে—এতক্ষণ হয়ে যাওয়ারই কথা তো—ক'রে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভদ্রসমাজচ্যুত। বিধিবদ্ধ আইন, সুতরাং কিছু করতে পারবে না, কিন্তু অন্তত ঘৃণার বক্রদৃষ্টি দিয়ে আমাদের দগ্ধ করায় কোন আইন তো সে-সমাজকে রুখতে পারবে না। কিন্তু তার উত্তাপ যতই হোক, তা বাহ্যিক। আর আমি আজ তোমাকে যে এই বারণ করছি, তাতে আমাদের ভেতরটা কি পুড়ে একেবারে ছারখার হয়ে যাবেনা বিপু? সেখানে তো সমাজের রাস্তা নেই তার সান্ত্বনা, তার প্রশংসা নিয়ে প্রবেশ করবার?—আমাদের বুকের সে-আগুন নিভিয়ে দেওয়ার..."

গলাটা ধরে এসেছে, চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

যে-কথাটা মনের এক কোণে ছিলই, সেটাকে টেনে এনে ভাষায় ব্যক্ত করতে তার স্বরূপটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যেন দুর্বল, দোমনা করে দিয়েছে বীরেশকে।...হোক না, যা হচ্ছে, পারবে সে অন্তর্দাহ সহ্য করতে? উচিত সে আগুন জ্বেলে দেওয়া বুকে?—যাকে আলাদা করে ভাবতে পারল না; সম্ভব হবে না কখনও ভাবা?

দুই

নীচে গলির মুখে মোটরের হর্ন্‌ বেজে উঠল। বীরেশ চিন্তার মধ্যে একটু চকিত হয়ে উঠেই বলল—"ঐ ধরণীরা এসে গেল। তোমায় যা বলতে যাচ্ছিলাম—যা বলবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম বিপু, আজ হোলনা সে-কথা—বাকি থেকে গেল—বোধ হয় ভালোই হোল—ভাববার সময় পেলে তুমি—আজ টাটকাটাটকি আমিও যেন গুছিয়ে বলতে পারছিলাম না।···আমিও যেন ভেঙে পড়ছিলাম বিপু—যদিও জানি, ভেঙে পড়লেই সর্বনাশ।···নইলে, তবু তোমায় কথা দিচ্ছি—তুমিও মত না পাল্টালে যা বলবে তাই হবে—আর একটা দিন আমায় দাও—যা বলতে যাচ্ছিলাম তোমায়—শেষ করতে দাও···তারপর যদি···"

চাকর গিয়ে আগল খোলার শব্দ হোল। ওদের সদর রাস্তা থেকে গলিটুকু বেয়ে আসতে যেটুকু সময় পেল, তার মধ্যে সংলগ্ন-অসংলগ্নভাবে যতটা সম্ভব ব'লে নিয়ে থেমে গেল বীরেশ। শুধু আর একবার একটু নিম্নস্বরে বলল—"গুছিয়ে নাও মনটা।"

ওরা সিঁড়িতে পায়ের শব্দ তুলে উঠে এল। বাজারে গিয়েছিল। চিত্রার হাতে প্ল্যাস্টিকের একটা জালিদার ব্যাস্কেট, তাতে কয়েকটা কাগজের মোড়ক। ছোট ভাই মলয়ের হাতে একটা কমলালেবুর ঠোঙা, হাতছাড়া হতে দেবে না বলেই বুকে চেপে আস্তে আস্তে উঠে এসেছে; ধরণীর হাত খালিই। উঠে বিপাশার ওপর নজর পড়তেই যেন একটু অবাক হয়ে গিয়ে তখনি সামলে নিয়ে বলল—"এই যে, আপনিও রয়েছেন।"

বিপাশাও একটু রেঙে উঠেছিল, কোনরকমে 'হ্যাঁ'টুকু মুখ দিয়ে বের ক'রে সামলে নেওয়ার জন্যে মলয়ের দিকে দু'পা এগিয়ে বলল—"নেবু মলু বুঝি আমার জন্যে এনেছ?" চিত্রা ব্যাস্কেট্‌টা নিয়ে

ভেতরে চলে গিয়েছিল, ওদের থমকে যাওয়াটা দেখতে পায়নি, বেরিয়ে আসতে আসতে বলল—"তাই এনেছে রে বিপু; তোকে যে কী ভালো নজরে দেখছে!"

"কোটায়!" হঠাৎ চোখ বড় বড় ক'রে এমন আপত্তির ঢঙে ঠোঙাটা আরও একটু বুকে চেপে ধরল যে, সবাই হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

চিত্রা বলে উঠল—"ওমা বললি নি?"

একটু অপ্রতিভ হয়ে, চিবুক তুলিয়ে মেনে নিল মলয়, হাত-দুটো বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, বিপাশা এগিয়ে এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—"আমি কিন্তু নেবুর চেয়ে তোমাকেই বেশি ভালোবাসি যে সোনা…"

মুখের দিকে চেয়ে কথাটুকু বলতে গিয়ে হঠাৎ চোখ ছলছল করে ওঠায় মুখটা ঘুরিয়ে নিল। চিত্রা বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে বলল—"কি হোল!"

ধরণী বলল—"চ'লে যাচ্ছ তো তোমরা, তাই বোধ হয়…"

বিপাশা ওর মন্তব্যের সুযোগ নিয়ে নিজেকে আর একটু সামলে নেওয়ার জন্য বলল—"চলে যাচ্ছিস, তা কি কিনে আনলি দেখালি নাতো।"

চিত্রা বলল—"দেখাতেই তো যাচ্ছিলাম—তুই মলুকে কথাটা বলতে বেরিয়ে এলাম। তা আয় না দেখবি। দাদাও এসোনা।… দাঁড়াও বরং টেবিলটাই বের করে আনছি, আলোয় ভাল করে দেখবে।"

"তুমি কেন? আমিই নিয়ে আসছি।"—ধরণী ওর পাশ দিয়ে ঢুকে গিয়ে ব্যাস্কেটসুদ্ধ চা-খাবার ছোট টেবিলটা বের ক'রে আনতে বিপাশা টিপ্পনী করল—"বাবাঃ, এঁরা যেন মুখিয়ে থাকেন, কখন্ পাকের ওপরে আর একটা পাক জড়িয়ে দিতে পারি।"

চিত্রা কড়া চোখের কোণে ওর দিকে একবার চেয়ে নিল একটা মোড়া খুলতে খুলতে। ধরণী বলল—"তবু, কৈ মন তো পাই না!"

কতকগুলো প্রসাধনের সামগ্রী আর বাড়ির কিছু দরকারী জিনিস কিনে এনেছে; তাদেরই মূল্য, রুচিসাম্যতা নিয়ে আলোচনা হোল খানিকটা। ঘুরে এসেছে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিপাশাই চায়ের অয়োজন করল।

খানিকটা সময় কাটিয়ে যখন যাওয়ার জন্য উঠল বিপাশা, ধরণী বলল—"আপনাকে না হয় বাড়ি পর্যন্ত দিয়ে আসি?"

বীরেশ যেন প্রস্তুতই ছিল, বলল—"থাকনা। এতটা ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এলে তোমরা।"

বিপাশা বলল—"হ্যাঁ, দরকার কি?...মোলু বাবু আসি"—বলে নেমে গেল।

বীরেশ আর ধরণীধর তুজনে বাল্যবন্ধু। তুজনেরই বাড়ি চব্বিশ পরগণায়, কলকাতা থেকে অনেক দক্ষিণে; তুটি গ্রাম খুব কাছাকাছি নয়, মাইল তিনেকের তফাৎ। বন্ধুত্বটা শুরু হয় স্কুলে। হাই স্কুলটা বীরেশদের গ্রাম অঙ্গনায়। গ্রামের মিডল্ স্কুল থেকে পাস করে ধরণী এসে ভর্তি হোল। বন্ধুত্ব সাধারণভাবেই আরম্ভ হোল, তারপর পাকা হয়ে উঠল দূরত্বের জন্য। গ্রামের ছেলেদের তিনচার মাইল যাওয়া-আসা ক'রে স্কুল করা কিছু বেশি কথা নয়, তবে বর্ষাকালে বিশেষ করে, এবং অন্য সময়ে বৃষ্টি হলে অসুবিধা আছে। বাড়ির লোকেরা আটকে রাখতেন ধরণীকে, তু'একবার লোক দিয়ে খবর পাঠিয়ে; তারপর আর দরকার হয় না। বৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং ধরণী বীরেশদের ওখানেই আছে। পরে, থেকে যাওয়ার জন্য বৃষ্টির দরকার হোত না; বাড়ির লোকই হয়ে গিয়েছিল ধরণী।

স্কুল থেকে বেরিয়ে কাছে-পিঠে জেলারই একটা নূতন কলেজ থেকে পাস করল তু'জনে। ছাত্র হিসাবে ধরণীই ছিল ভালো। ভালোভাবেই পাস ক'রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ছাত্র হয়ে উৎসাহের সঙ্গে পড়াশুনা শুরু করে দিল। তু'বছর পরে

বেশ উঁচুর দিকে সেকেণ্ড ক্লাসও পেয়ে চারিদিকে দরখাস্ত ছাড়তে লাগল।

বীরেশ ছিল অন্য ধাতের ছেলে। একটু অস্থির-চিত্ত এবং প্রশ্নপ্রবণ ; চলছে বলেই, চিরাচরিতভাবে চলে আসছে বলেই মেনে না-নেওয়ার একটা প্রবৃত্তি। এই জন্যেই সায়েন্সের ছাত্র হয়ে ঢুকল কিনা কলেজে বলা যায় না, তবে ঢোকার পর সায়েন্স যেন এ প্রবৃত্তিটাকে আরও পুষ্ট করে তুলল। মফঃস্বল কলেজ হলেও বাইরের নূতন হাওয়া লেগে একটা ছাত্র-আন্দোলন জন্ম নিয়ে একরকম স্থানু হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল, বীরেশ সেটাকে সচল করে তুলল। এরপর, গতিশীল হয়ে উঠলে তার অগ্রগতির দিক নির্ণয় করে দেওয়ার জন্যে যখন বির্তক আর ভোটাভুটির পালা শুরু হোল, ও আস্তে আস্তে নিজেই সরে দাঁড়াল।

কলেজ থেকে বেরিয়ে বন্ধুর মতো পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের দিকে গেল না বীরেশ। বাড়ির অবস্থা ভালো, বাপমায়ের একটিমাত্র সন্তান, তাঁরা জীবিতও, উপার্জনের ভাবনা নেই, দিনকতক জীবনটাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করল। বছর তিনেক। এর মধ্যে ব্যবসা আর সাহিত্যচর্চা—দুটো পরস্পর-বিরোধী ব্যাপারও ছিল। এরপর দুটো একসঙ্গে গেঁথে একটা নূতন পরীক্ষা করবার জন্যে গ্রাম থেকে একটা মাসিক পত্রিকা চালাতে গিয়ে বেশ কিছু লোকসান দিয়ে একটু খতিয়ে দেখবার সময় নিল।

লোকসান দেওয়ার ক্ষমতা আছে ; পেছুল না বীরেশ। ওর মনে হোল ক্ষতি যেটা হয়েছে সেটা এতটা দূরে পাঁড়াগা থেকে নানা অসুবিধার মধ্যে কাগজ চালাতে গিয়েই। কলকাতার একেবারে মাঝখানে থৈ পাবে না। বেশ কাছাকাছি একটা নূতন কলোনী গড়ে উঠছে, দক্ষিণের দিকেই, সেইখানে একটা ছোটখাট বাড়ি কিনে নিল। ওপর নীচের দুখানা করে ঘর, মালিকের অর্থ বিপর্যয়ের জন্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে ছিল, কিনে ঠিকঠাক ক'রে নিয়ে উঠে গেল। এবার

নিজে প্রেস করে অন্য সব বিষয়েও স্বনির্ভর হয়ে নিয়ে আবার বের করল কাগজটা। বাড়ি সংলগ্ন কিছুটা জমি আছে ; প্রয়োজন মতো আস্তে আস্তে বাড়িয়ে যেতে পারবে। একবার ঘা খাওয়ায় একটু সতর্কভাবেই অগ্রসর হচ্ছিল, এই সময় পিতা কীর্তিময় মারা যেতে একটা বড় রকমের বিরতি এসে পড়ল।

এই বছর তিনেকের মধ্যে ধরণী চারিদিকে দরখাস্ত ছাড়া আর বীরেশের ভগ্নী চিত্রাকে বিবাহ করা ভিন্ন অন্য কিছুই করতে পারেনি। চিত্রা বীরেশের বিধবা মাসিমার মেয়ে, ওদের বাড়িতে মানুষ হয়েছে।

বাপমায়ের একমাত্র সন্তান হওয়ার সুবিধা অনেক। স্নেহটায় ভাগ বসাবার কেউ না থাকায় সেই অভঙ্গ স্নেহ ভাঙিয়ে খেয়ালখুশি মতো জীবনটা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায়। কিন্তু এই একচেটিয়া অধিকারের বিপদও কম নয়, তু'জনের কেউ একজন চোখ বুজলে নিজের চোখেও অন্ধকার নেমে আসে। বীরেশের চোখে এটা আরও উৎকট হ'য়ে দেখা দিল। প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি, তবে এখানে-ওখানে ছড়ানো। এর ওপর বীরেশও উদাসীনই ছিল, কীর্তিময়ও কিছু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যাওয়ার সময় পেলেন না, ওঁর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল। আর কাগজের কথা ভাবা চলে না। প্রেসও স্বপ্নই হয়ে রইল। পত্রিকা সম্পাদনা করতে গিয়ে মনে যে সাহিত্যের ছোঁওয়া লেগেছিল, মুছেই গেল। ওর একমাত্র উদ্দেশ্য রইল, বিপুল বিচ্ছিন্ন সম্পত্তিটাকে গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে নিজের আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলে, তারপর অন্য কিছুর কথা ভাবা, নিশ্চিন্ত হয়ে।

এই অবস্থায় আংশিকভাবে পৌঁছাতেও বেশ কয়েকটা মাস লেগে গেল, বছর খানেকের কাছাকাছি। এ যাবৎ একরকম নিশ্চিন্তই থেকে এসেছে, এই অবস্থাটি ফিরে পাওয়ার জন্যে কিছু খেসারৎও দিল।

যাদের বিষয়-সম্পত্তি বড়, সেটা সুষ্ঠুভাবে চালাতে, দেওয়া-

নওয়ার মধ্যে কিছু ঋণ থেকেই যায়। বদ্ধ নয়, সচল ঋণ; সঙ্গতি মাছে, হচ্ছে, আবার মিটে যাচ্ছে।

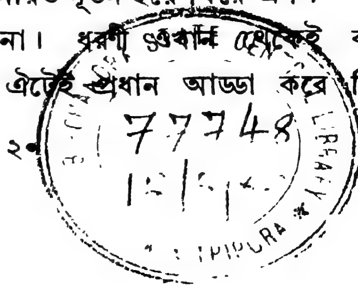
রহস্য ঠিক জানা ছিল না, বীরেশের কাঁধে বোঝার মতো অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। হালকা হওয়ার জন্যে জমিজমা কিছু বেচে বেচে দিচ্ছিল, একটু নিরেশ, কতকটা অপ্রয়োজনীয় বা অল্প প্রয়োজনীয় দেখেই। হঠাৎ একদিন কলকাতার বাড়িটার কথা মনে পড়ল। সুসময়ের একটা খেয়াল, এ সময় তার আর সার্থকতা কি? বরং যেগুলো গেল সেগুলোর অভাব কতকটা পূরণ করতে পারবে। বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে মনটা বিষয়ী হয়ে আসছে। কলকাতার উন্নতিশীল নূতন অঞ্চল, দর ভালোই পাওয়া যাবে।

নিজেদের সেই সাবেকী প্রথা না ধরে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিল বীরেশ। বেশ দর উঠতে লাগল। একটা পার্টির সঙ্গে প্রায় ঠিক ক'রে ফেলবে, এই সময় একটা ব্যাপার ঘটে সব উল্টে গেল।

ধরণী পাশে-পাশে রয়েছে, তবে এই সময়টায় এম-এর অভিমান ভুলে গ্রামের স্কুলে একটা চাকরি নেওয়া, চারিদিকে দরখাস্ত ছাড়তে থাকা, এবং তারই মধ্যে একদিন চিত্রাকে বিবাহ করা ভিন্ন আর কিছু করছিল না। একদিন দরখাস্তর উত্তরে কলোনীরই একটা নূতন কলেজে ডাক পড়ল। পেয়েও গেল চাকরিটা, ইতিহাস বিভাগে লেকচারারের পদ।

ঘটনাটুকুর প্রভাব কার জীবনে বেশি করে দেখা দিল, বলা শক্ত। ধরণী তো নিজের শিক্ষার মর্যাদা অনুযায়ী একটা স্বীকৃতি পেলই, বীরেশের জীবনের দিগন্তও হঠাৎ বদলে গেল। বদলে যাওয়া বলা ঠিক হয় না, জীবন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নূতন সুযোগের পটভূমিকা—পিতার মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত যেটা চাপা পড়ে ছিল, হয়তো থাকতই চাপা চিরকাল—সেটা আরও নূতন হয়ে ফিরে এল।

ঠিক হোল বাড়ি বেচা হবে না। ধরণী ওখান থেকেই কলেজ করবে। একা নয়। বীরেশও ঐটেই প্রধান আড্ডা করে নিজের



প্ল্যান রচনা করবে—কাগজ, প্রেস ; ঠিক হয়তো তাই, নয়তো অন্য কিছু। জগৎ চিরদিনই এগিয়ে চলেছে, করবার মতো কত কি যে নিত্য সামনে এসে পড়ছে, বেছে নেওয়াই শক্ত।

একটা চাকর আর একজন পাচক-বামন নিয়ে উঠল গিয়ে দুই বন্ধুতে।

ধরণী কলেজ করে। বীরেশ বসে বসে চিন্তা করে। পরিচয় বাড়ছে ; মাঝে মাঝে কলকাতা গিয়ে ঘুরে ফিরে আসে।

জীবনের পরিধি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মনের যে একটা পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছিল, কতকটা নিঃসাড়েই সেটা একদিন একটা স্পষ্ট রূপ নিল। আপাতদৃষ্টিতে একটা ক্ষুদ্র আকারেই, তবে নিজের সঙ্গেই নিজের একটা নূতন পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে।

একদিন কলোনীতেই একটি পরিবারে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল দু'জনের। প্রগতিশীল ছোট পরিবার। বেশ উপভোগ্য হয়েছিল, তবু পথটাতে একটু মৌন ও চিন্তিত রইল বীরেশ। ধরণীকে একটু টুকলে, বলল—"একটা রিটার্ন দিতে হবে তো ?"

ধরণী বলল—"তা এত চিন্তার কি আছে, একদিন ডাকলেই হয়।"

"চাকর আর বামনের ভরসায় ?"—প্রশ্ন করল বীরেশ।

"বাড়ি থেকে কেউ আসতে চাইবেন ?" ধরণী প্রতিপ্রশ্ন করল।

সমাধান বের হোল একটা। আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহপ্রবেশ হয়নি। সেই অছিলায় বাড়ি থেকে একদিন সবাইকে আনিয়ে নেওয়া হবে, সেই সূত্রেই পাল্টা নিমন্ত্রণও সেরে নেওয়া। কিছু বেশি বলে পরিচয়ও বাড়ানো। বীরেশদের একেবারে পুরাতনপন্থী গ্রাম্য পরিবার। নূতন ও পুরাতনে যোগাযোগটা কিন্তু বেশ ভালোই হোল। ওদিকে কয়েক-জনই পাস-করা মেয়ে, নয়তো পড়ছে পাসের পড়া, চিত্রা তার ম্যাট্রিকুলেশনের পুঁজি নিয়ে কতকটা সামলাল। খুব বেমানানও হোল না। গ্রামের ছেলেদের স্কুল থেকে চারটি মেয়ে, ক্লাসের একধারে ব'সে পাস করা—জড়তা কিছুটা ভাঙাই ছিল।

তুদিন একটু চিন্তিত রইল বীরেশ। ধরণী তার বইপত্র নিয়েই থাকে, চিন্তার দিকটা বীরেশেরই থাকে। তু'দিন একটু মৌন থাকার পর বলল—"চিত্রাকে নিয়ে এসে কলেজে ভর্তি করে দে।"

"ওর বিয়ে হয়ে গেছে !'—বিস্মিত হয়েই চাইল ধরণী, বলল—"এই আমার সঙ্গেই তো। ভুলে যাচ্ছিস কি করে ?"

বীরেশ বলল—"ভুলিনি বলেই তো আসল লোককে ধরেছি। মা-মাসির দল আপত্তি করলে বলব—"কি করা যাবে ? পাস-করা অতি-আধুনিক জামাই করেছ, সে যদি চায় তার বউ হিলতোলা জুতো পরে কপালে সিঁদুর দিয়ে কলেজে যাক তো আমাদের বলবার কি অধিকার আছে।"

অত করতে হোল না। বন্যার আগেই ভেতরের জমিটা আস্তে আস্তে ভিজে নরম হয়ে আসে। ভর্তির সেসনের মাস কয়েক দেরি ছিল। এসে পড়লে যথারীতি নাম লিখিয়ে এল চিত্রা। ঐ কলেজেই সকালের মেয়েদের বিভাগে। সঙ্গে নিয়ে এল তার নূতন সঙ্গিনী বিপাশাকে।

একটা পরীক্ষাই ছিল নিশ্চয় চিত্রার পক্ষে। মনে যাই থাকুক, মুখে একটু লোক দেখানো গোছের আপত্তি করতেই হয়েছিল, সে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়ে যেন ভাইকে একটা পরীক্ষায় ফেলল। জ্ঞাতসারে নাই হোক। প্রশ্নপত্র হোল বিপাশা।

তারপর বীরেশ যখন টের পেল, চোখ ভুল করেছে—তুস্তর প্রভেদ, তখন আর উপায় নেই, অগাধ জলে।

তখন আবার অন্য দিক দিয়ে যুক্তিতর্ক এসে হাজির হোল। ...কেন, বাধাই বা কোথায় ? এই যুগ, একটা অন্ধ সংস্কারকে, একটা মূঢ় অভ্যাসকে আঁকড়ে থাকা...

এই সর্ব-মুক্তির যুগে আরও একটা নিশ্চিত, নিঃসংশয় পদক্ষেপ থাকুক না। শক্ত কি একথা ?

যুক্তি বিচার কিন্তু এইখানেই থেমে গেল না। প্রশ্নপ্রবণ মন,

একদিন আবার প্রশ্ন উঠল—যদি সত্যই ভালোবাসা তো তার মর্যাদা কিসে রক্ষা হয়—ভোগে। না, ত্যাগে?

বিপাশাকে যেমন হিসাব দিল, প্রথম দর্শনের পর চারমাস অন্তর্দ্বন্দ্বে কাটাল বীরেশ। তারপর এক বর্ষণ-সন্ধ্যায় একা পেয়ে বলল কথাটা। দেখল, এসব জিনিস মুখের ভাষার অপেক্ষা রাখে না। তবু ভাষারই অপেক্ষা করছিল বিপাশা; সম্মতি পেতে দেরি হোল না।

জানাল শুধু ধরণীকে বীরেশ।

ধরণী বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকে বলেই এইসব নূতন ধরণের কথা-গুলায় প্রথমটা চমকে যায়। তারপর, হয়তো ইতিহাসের লোক বলেই নির্বিবাদে মেনে নেয়।...কত পবিবর্তন হয়ে গেল মানবসমাজে, নিত্য হচ্ছে, আরও হবে!

রেজেস্টারি করে বিবাহ। ও থাকবে সাক্ষী।

কথা নেওয়ার পরদিন থেকেই যে উল্টো স্রোত বইতে আরম্ভ করেছে মনে, সেকথাও বলেছে বিপাশাকে। সেও মাস তিন হয়ে গেল।

শেষ সিদ্ধান্তটা ধরণীকে জানিয়ে ওদের ইচ্ছা করেই বাড়ি থেকে সরিয়ে দেয়।

কিন্তু শেষ সিদ্ধান্তই বা শেষ হয়ে থাকতে চায় কৈ? বিপাশাকে বলল—"ভেবে ছ্যাখো স্থিরভাবে। মত বদলাতে না পার তো যা বলবে তাই হবে।"

তিন

ধরণী বাজার থেকে ট্যাক্সিটা বাড়ির জন্যে ঠিক করেই এনেছিল, গোছগাছ হয়ে গেলে চিত্রা আর মলুকে নিয়ে নেমে এল এবং বীরেশও সঙ্গে এল তুলে দিতে। ওরা চলে গেলে অন্যমনস্ক হয়ে বাড়িটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েই রইল কিছুক্ষণ। রাস্তাটা এখানে সোজা, প্রায়

আধ মাইল পর্যন্ত গিয়ে ডান দিকে ঘুরে গেছে। বাঁকের মুখে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেলে ঘুরে গলিতে ঢুকতে যাবে, হঠাৎ উল্টা দিক থেকে হর্ন্ দিয়ে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল।

বীরেশের বুকটা ধক্ করে উঠেই কয়েক সেকেণ্ড পর্যন্ত ধুকধুকুনিটা এমনভাবে লেগে রইল যে, কোন কথাই বের করতে পারল না মুখ দিয়ে। তারপর, হাতঘড়িটা বাঁধাই থাকে হাতে, উল্টে দেখে নিয়ে বলল—"বড় লেট্ করে ফেলেছ।"

"হ্যাঁ, হয়ে গেল আধঘণ্টাটাক, ব্রেকটা···"

"প্রায় ঘণ্টাখানেক।"—বাধা দিয়ে বলল বীরেশ।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ভাল মিথ্যা জুগিয়ে গেল, বলল—"আমার তাড়া ছিল, অন্য গাড়ি ক'রে এইমাত্র পাঠিয়ে দিলাম।"

অজুহাতটা বেশ মানানসই হওয়ার জন্য মনটা যেন একটু উদার হয়ে পড়ল, বলল—"যাক্, কারে পড়ে যখন দেরি হয়ে গেছে বলছ, কিছু দিয়ে দিচ্ছি তোমায়, দাঁড়াও।"

ওপরে পাচক ঠাকুর জগবন্ধুকে নিয়ে গিয়ে একটা পাঁচ টাকার নোট পাঠিয়ে দিল। তারপর নিজের ঘরের সামনে বারান্দার শেষ দিকটায় ইজিচেয়ারে বসে গা এলিয়ে দিয়ে নিজেকে নিয়ে পড়ল।

আজ সমস্ত দিনই মনের অবস্থা এমন গেছে যে, পদে পদেই ভুল করে এসেছে। এই ট্যাক্সিটাকে ডেকেছিল ওদের ছু'জনকে বিবাহ-রেজিস্ট্রি আফিসে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে। ঠিক আফিসে নয়, খানিকটা তফাতে এক চৌমাথায়। সেখান থেকে ওদের হেঁটে যাওয়ার কথা। জায়গাটা বাসা থেকে সাত-আট মাইল দূরে। ট্যাক্সিওলা তেমন কিছু ভুল করেনি। যে সময়টা বীরেশ দেয় সে সময় এলে—ধরণী-চিত্রাদের থাকাকালেই—বীরেশ বিব্রতই হয়ে পড়ত। ধরণী অবশ্য জানতই বীরেশ ভেঙে দেওয়ার চেষ্টাই করবে, তবে চিত্রা একেবারেই কিছু জানে না, বিবাহের কথাটাও নয়। হয়ে গেলে, যেমন আর সবাই, তেমনি সেও টের পাবে। তখন আর কোন উপায়ও নেই।

চিন্তার মধ্যেই ধরা দিল—দু'জনে মিলে সমস্ত প্ল্যানটা পাকা করলেও—অর্থাৎ ও আজ বিপাশার সঙ্গে কিভাবে যাবে—তার আগে চিত্রাকে সরিয়ে দেওয়া—তারপর মত পাল্টে বিপাশাকেও নিরস্ত করার চেষ্টা—এই সব চিন্তার মধ্যে কি করে ট্যাক্সির কথাটাই ভুলে বসেছিল।

বড় আশ্চর্য লাগছে, এ ধরণের মতিভ্রমও হতে পারে মানুষের!

কিছুক্ষণ এই চিন্তা নিয়ে থাকার পর মনটা অনেকখানি সহজ হয়ে এল। বিপাশা কি অবস্থায় পড়েছে এতক্ষণ? এরপর যখন আসবে, কি কথা নিয়ে আসবে?···আসতে পারবেই কি আর? বৌদিদি সব কথা ফাঁস করে দিল, তারপর? হয়তো বিপাশাই মরিয়া হয়ে উঠল। তাকে আটকে ফেলার চেষ্টাই তো হবে।··· চিন্তাটাকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারা যায় না।

নিজের দিকে ঘুরিয়ে আনল মনটাকে বীরেশ।···ধরে নেওয়া যাক, বিপাশা এসেছে—কোন প্রকারে—বীরেশ কি বলবে তাকে—কিভাবে—কি ভাষায়?···

নীচে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হোল, একটু যেন ত্রস্তই। জগবন্ধু বাজারে গেছে, দরজায় খিল দিয়ে এসেছিল বীরেশ, নিজেই নেমে গেল তাড়াতাড়ি, তারপর কপাট খুলেই যেন ধাক্কা খেয়ে এক পা পেছিয়ে বলে উঠল—"বিপাশা !!···আবার তুমি !! এত শীগগির··· আর, এ কী চেহারা হয়েছে তোমার!" এখান থেকে গেছে ঘণ্টাখানেকও হবেনা, এর মধ্যে যেন কত বয়স হয়ে গেছে বিপাশার। একটু একটু কাঁপছেও, ঠোঁট দুটো জিভে ভিজিয়ে নিয়ে, চাপা, খসখসে স্বরে বলল—"পরে শুনবেন···আমি একটা কথা বলতে এসেছি···বলে এক্ষুনি চলে যেতে হবে···বৌদি দোর খুলে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল···আমায় দেখে বিশ্বাস করতে পারছে না···কথা বেরুল না··· বললাম, ফিরে এলাম—বাবা দাদা এসেছেন? বললে, না, আসেননি এখনও···বললাম, এলে বোল না—মত পালটেছি···শুধু একটা কথা

বলে এক্ষুনি আসছি···কথা মানে, আংটিটা ফিরিয়ে দিয়ে আসছি··· তুমি দাঁড়িয়ে থাক এখানেই···”

“তাহলে সত্যিই পালটালে মত?”—প্রশ্ন করল বীরেশ।

“পাগল?···আর তা পারি?”

“মিথ্যে কথা?···কিন্তু···কিন্তু···”

—কি বলে শেষ করবে খুঁজছিল বীরেশ, বিপাশা বলল—“সমস্ত ব্যাপারটাই যেখানে মিথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে এই মিথ্যেটুকু আর এমন কী বীরুদা?···আমি আসি।···”

ও একটু ঘুরতেই বীরেশ বাধা দিয়ে বলল—“এক মিনিট; তোমায় একটা দিন সময় নেওয়ার কথা বলেছিলাম···”

একটু চোখ ঘুরিয়ে ভেবে নিয়ে বলল—“দিন···দিন তিনেক পরে এসো তুমি—তার আগে নয়—বেশ ভালো ক'রে ভাবো গিয়ে।”

এসে আবার গা এলিয়ে দিল চেয়ারে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। কোন একটা দিকে চিন্তাটাকে ধরে রাখতে পারছে না, বর্তমান আর ভবিষ্যতে জট পাকিয়ে যাচ্ছে যেন। কতক্ষণ প'ড়ে ছিল হুঁস নেই, জগবন্ধু কখন সিঁড়ি বেয়ে উঠেছে, টের পায়নি; চেয়ারের পেছন থেকেই প্রশ্ন করল—“চা তৈরি করব?”

একটু চমকেই উঠল বীরেশ, প্রশ্ন করল—“ও! তুই? দোরটা বুঝি খুলেই রেখেছিলাম?···চা করবি তো কর একটু।···হ্যাঁরে, ভালো চা পেয়েছিস তো? সেই ব্র্যাণ্ড্‌টা ফুরিয়ে গিয়েছিল বলেছিলি আমায়···”

চিন্তা থেকে বেরিয়ে এসে কথা কইবার জন্যই খানিকটা বলে গেল; ওর মুখের দিকে চেয়ে, বেশ সোজা দৃষ্টি তুলেই। বিপাশার শুকনো আতঙ্কগ্রস্থ মুখটা ওকে যেন ঘিরে ঘিরে ফিরছে; কারুর একটা সুস্থ, সহজ মুখ দিয়ে চাপা দিতে চায়।

জগবন্ধু নেমে গেলে আবার চিন্তাগুলা ভিড় করে এল। ওর সঙ্গে ঐটুকু কথাবার্তায় যে একটু অন্যমনস্ক করে দিয়েছে, তাতে এইটে স্পষ্ট

নিয়ে...

চা পা...

একটা ট্যাক্সি নিয়ে

খাটে এদিকে, বেরিয়ে গিয়ে খা...

সামনে রাত্রি বলে যা চায় রাজি হয়ে য।

ট্যাক্সি পেতে দেরি হোলনা। দুঃসময়ে ...

চেয়ারে নিঃসাড় হয়ে পড়েই ছিল, মোটর হর্ন দিয়ে এসে দাঁ... যেমন ছিল তেমনিই, গেঞ্জির ওপরে একটা কামিজ টেনে, তারপর তাড়াতাড়ি একটা ব্যাগে দুটো কাপড়জামা পুরে নিয়ে দোরে তালা দিয়ে হন হন করে নেমে গেল। ঠাকুরকে বলে গেল তার দিন তিনেক দেরি হবে। খালি বাড়ি, যেন সাবধানে থাকে।

সন্ধ্যার একটু আগেই গিয়ে পৌঁছল। বড় রাস্তা থেকে খানিকটা পায়ে হাঁটা পথ, মোটর যায় না। ভাড়া চুকিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে

মাত্র।

হোলনা

আগে এল, কিছু

তোর!"

রে দেখছে বীরেশ। অন্যমনস্ক হয়েই

করতে ভুলে গেছে। হেঁট হয়ে পায়ের

একটু হেসে বলল—"হবে কি? বেশ ভালোই আছি। চলো, সব বলছি। ওরা চলে আসতে, কেন জানিনা মনটা বড় আইঢাই ক'রে উঠল। বিশেষ করে মলুটার জন্যে। এবার অনেকদিন গিয়ে ছিল তো। কোথায় গেল সেটা?"

"তাকে ধরণী নিয়ে গেল। চিত্রাই জিদ করলে। আসার সময় নিয়ে আসবে…"

—গল্প করতে করতে ওরা ভেভরে চলে এসেছে। পুরনো

তোমা...

—বলে, "আ...

চলে গেল।

বীরেশ হেসে বলল—"সুচটা ...

গৌরীদেবী একটু হাসলেন। দাক্ষা...

তবু রেখেছে বাবা ; বড্ড যেন নিঝুম হয়ে পড়েছে ...
যায় না।"

বোনের দিকে চেয়ে কিছু যেন বলতেই যাচ্ছিলেন, পাশের বাড়ির গিন্নি এসে প্রবেশ করলেন। বাড়ি নিয়েই গল্প হচ্ছিল। আদায়-পত্র, জমিজমা, কয়েক ঘর প্রজা আছে—তাদের কথা, উনি আসতে গল্পের মোড় ঘুরে গেল। পাড়া, গ্রাম, ও যাওয়ার পর নিস্তরঙ্গ গ্রামটায় ছোটখাট কি সব বিচিভঙ্গ হয়েছে ; জন্ম, বিবাহ ; প্রতিবেশী ঘোষেদের মেয়ের যমজ সন্তান হোল, তর্কালঙ্কারের নাতির বিয়েতে 'ঘোঁট' হতেই

মা... ঢটো

...কর, একটা

...—গৌরীদেবী বললেন।

...রে..., বলল—"আমি বলব? বড়টা চিত্রার

...আসুক..."

...হঠাৎ মাছ...রাতও হয়ে যাবে তো।"—গৌরীই বললেন।

চলো "বলবে, ভেসে উঠছিল, কিছু ধরে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।...

আ হ্যাঁ, যে যাবে, আমার কথা যেন একেবারে না বলে। কেন, কি বৃত্তান্ত—একরাশ জবাবদিহিতে পড়ে যাবে। অত ব'লে দেওয়ার সময় নেই আমার।...আর হ্যাঁ...ছোটটার আদ্দেকটা কাকিমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।...গঙ্গা আর মদন এখানে খাবে কিন্তু কাকিমা।... মুখুজ্জেমশাই একটু বলে আসুন।"

গলা—নিস্তব্ধতা ভেদ করে ত্রস্ত প্রশ্ন—"গৌরী, ছাখ্ তো এসে—খাটে বীরু নেই !!..."

গৌরীদেবী শান্ত প্রকৃতির মানুষ। উঠেই পড়লেন, তবে পাশের ঘর থেকেই আগে জানলা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি ফেলে বললেন—"ঐ তো উঠোনে চৌকিতে শুয়ে রয়েছে।"

ছুজনেই বেরিয়ে এসেছেন। উনিই বললেন—"তা বাইরে গা আছুড় করে শুয়ে আছিস কেন? নতুন হিমটা পড়তে আরম্ভ হয়েছে।"

দাক্ষ্যায়ণী চুপ করেই ছিলেন, হঠাৎ আতঙ্কে হয়তো বাক-স্ফূর্তির মতো অবস্থা হয়নি। একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়েছেন, চৌকির ধারে বসতে বসতে বললেন—"সে হুঁস আছে ছেলের?"

বীরেশ উঠে বসেছে, তার পিঠে বাঁ হাত তুলে দিলেন।

"গরমও পড়েছে বাপু বেয়াড়ারকম"—গৌরীদেবী বললেন—"ভাদ্দর শেষের ভ্যাপসানি, সেখানে-পাখাটা প্রায় মাথার ওপর।"

পাশে বসলেন।

"না, ঠিক তার জন্যে নয়।...অবিশ্যি গরম আছে...তবে..."

শুরু করে থেমে গেল বীরেশ। ও-ও মায়ের মতোই কথার অভাবে পড়ে গেছে। তবুও তো প্রায় একই রকম অবস্থা তাঁর ওভাবে আচমকা চেঁচিয়ে ওঠায়। বুকটা এখনও ধুকধুক করছে।

"তবে...বলছিলাম..."

একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"বলছিলাম, খাটে নেই, তা একবার বাইরের দিকে দেখলেই তো হয়...তাহলে, এই যে এত দূরে পড়ে রয়েছি—কি করছি, কোথায় যাচ্ছি..."

চুপ করে গেল আবার। সামলাতে গিয়ে এমন যে উৎকট রকম ছন্দপতন হবে ভাবতে পারেনি। আবার একটু আমতা-আমতা ক'রে গৌরীদেবীকে সাক্ষী মানল—"কি বল মাসিমা? ঠিক বলছি না?"

"তা, তোকে এত দূরে অমন ক'রে পড়ে থাকতে বলেছে কে?...

বল্ গৌরী ?—দরকারটা কি তোর অমন ক'রে পড়ে থাকবার ? কি অভাবটা রেখে গেছেন তোর ? দেখার অভাবে সব নষ্টই তো হচ্ছে, বল্ গৌরী ; মুখুজ্জেমশাই—বয়স হয়েছে—তায় আফিমখোর মানুষ···”

“সে সব হবে'খন।”—স্রোতটা একবার নামলে রোখা যে শক্ত হবে, আশঙ্কাই করছিলেন গৌরীদেবী, বাধা দিয়ে সামলে নিলেন। বললেন—“এখন একটু ঘুমুবার চেষ্টা করবি চল্, দাওয়ায় পড়ে থাকতে হবে না। জ্বর-জ্বালার সময়। আরম্ভও হয়ে গেছে। চল, পাখা করছি, ঘুমিয়ে পড়বি'খন, হাক্লান্ত রয়েছিস এতটা পথ এসে।”

হেসে উঠল বীরেশ, এবার খানিকটা সহজভাবেই ; বলল—“চমৎকার ব্যবস্থা—কচি ছেলে, হেঁটে-ছুটে বাইরে গিয়ে কাজ নেই—মা কথায় কথায় আঁতকে উঠুন, মাসি পাখা হাতে ক'রে ঘুম পাড়ান। বেশ, চলো তাই হবে।”

উঠে পড়ল। ঘরে খিল দিচ্ছে : গৌরীদেবীকে পাখা হাতে ওঘর থেকে আসতে দেখে বলল—“দাও। তা বলে অত আদর কি এ বয়সে আর সহ্য হয়।”

একটু গলা তুলে বলল—“মা, শুয়েছ তো ?···যদি আমার নাক ডাকে তো ধরে নিওনা, ছেলেবেলার মত ভাঁওতা দিচ্ছি, তোমার নাক ডাকলেই পালিয়ে যাব।···কী জ্বালা বাবা, ছেলে বদলাক, মা-মাসি কখনও বদলাবে না।”

—হাসতে হাসতে মশারী তুলে উঠে পড়ল খাটে।

ঘুম এল একেবারে শেষ রাত্রে ; যার জন্যে উঠল অনেক দেরি করেই। তাড়াতাড়িতে টুথব্রাশ, মাজন, সেভিং সেট—এসব আনা হয়নি—একটি নিমডাল ভাঙিয়ে অনেক আগের মতো তার মুখটা থেঁতলে দাঁতন করে নিয়ে বাইরের দিকে বেরিয়ে গেল বীরেশ। অত্যই বড় শ্রীহীন হয়ে পড়েছে চারিদিকটা—কাল সন্ধ্যায় বড় রাস্তা ছেড়ে ভেতরে আসতে দুদিকে তার নমুনা পেয়েছিল কতকটা। পুকুর,

বাগান, কাছাকাছি কয়েকটা খেত। জন খাটছে, তবে বেশ বোঝা যায়, ও আসার জন্য তাড়াতাড়ি কিছু লোক লাগিয়ে দেওয়ার ভাব।

দাঁতন হাতে খানিকটা ঘুরেফিরে পুকুরঘাটে গিয়ে বসল। ঘুম যেটুকু হয়েছে, বেশ গাঢ়ই হয়েছে। রাত্রির স্বপ্নের পথ বেয়ে যে-চিন্তাটা এসেছিল, সেটা ফিকে হয়ে গিয়ে পরিবেশটা ভালো লাগছে। শ্রীহীনতার জন্যই একটা মায়া এসে পড়ে মন আরও যেন জড়িয়ে ধরেছে সমস্তটুকুকে—বাড়ি, পুকুর, গাছপালা, তাদের ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের টুকরো, নীচে সবুজ ঘাস—আগাছায় ঢাকা মাটি। ক্রমে কাছে থেকে সমস্ত গ্রামটাতেই ছড়িয়ে পড়ছে মন। ওদের গ্রামের নাম অঙ্গনা, পুকুরটার নাম কাজলদীঘি।...দু'তিনবার মনে মনে আওড়াল। বড় মিষ্টি লাগছে।

ফিরে আসা যায় না? কী হোল বাইরে গিয়ে? এতদিন তো হ'য়ে গেল, কী করতে পারল আজ পর্যন্ত?

অঙ্গনার পাশে কলোনীটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল। কী দিল কলোনী? শুধু একটা কঠোর ট্রাজেডীর সামনেই তো এনে ফেলেছে!

বিকালে এই সুরটিই আরও চড়া-পর্দায় রণরণিয়ে উঠল।

দিনের বেলার ঘুমটাও ভালো হয়েছে; উঠে বাইরে খোলা রকে এসে দাঁড়াল বীরেশ! পশ্চিমের দোতলার ছায়া উঠানে এসে পড়েছে। চৌকিটা পাতাই থাকে, নেমে গিয়ে উঠে বসল। মা-মাসিমা ঘরেই, বোধহয় এখনও ওঠেননি। সুচিত্রাও এখনও স্কুল থেকে আসেনি। বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ, পাশের বন থেকে শুধু ঝিঁঝির একটানা শব্দ, চুপ করে বসে রইল বীরেশ। একটু পরে দাক্ষায়ণী এসে পাশে বসলেন অভ্যাসমতো পিঠে হাত তুলে দিয়ে। কথা নেই কোন। মায়ের এটা যে কোন তেমনি দরের কথা কওয়ার লক্ষণ এটা জানা বীরেশের। একটু কৌতুক-হাসি মনে চেপে রেখে সেও চুপ করে রইল। একটু পরে হাতটা সচল হয়ে উঠল দাক্ষায়ণীর, কতকটা যেন উদ্দেশ্যহীন

কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন—“তা, এবার এলি তো এতদিন পরে, থাকবি ক'দিন? না…”

“থাকবার জো আছে?”—উত্তরটা সহজভাবেই দিল বীরেশ। প্রশ্নটুকু যে গতরাত্রির অনুযোগের পূর্বাভাসই—যেটা গৌরীদেবী মাঝপথে থামিয়ে ছিলেন—এটা আন্দাজ ক'রেই।

ভুলও নয়। দুই বোনের একটা যেন পূর্বকল্পিত ব্যবস্থা মতোই গৌরীদেবী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। দাক্ষায়ণী বললেন—“ঐ শোন্ গৌরী, তোর বোনপো কি বলে।”

গৌরী পান চিবুচ্ছিলেন, একটু জর্দ্দা মুখে ফেলে দিয়ে নিদ্রাশেষের অলসগতিতে নেমে এলেন। ওঁকে কিছু না ব'লে বীরেশকেই প্রশ্ন করলেন—“হোল ঘুম একটু এখন বাবা?”

ওর উত্তর দেওয়ার আগে দাক্ষ্যায়ণীই বললেন—“হয় ঘুম কখনও? কলোনী যা করে মাথায় চেপে বসেছে! শোন্‌না, কি বলে।”

“ও! তোমাদের কলোনীর কথা হচ্ছে?” প্রশ্নটা মুখে করে একপাশে বসলেন গৌরীদেবী, বললেন—”আমিও সেই কথাই বলছিলাম দিদিকে। থাকতেন তিনি বেঁচে, যা মন চায় করতিস? আর চলে? দেখলিও তো কটা বছর। কী করতে পারলি বল? এদিকে বাড়ির অবস্থা কি হয়ে গেছে ছ্যাখ। চাকরবাকরদের হাতে ছেড়ে চলে গেলি—তা, মনিব না থাকলে চাকরবাকরের কোনও দাম আছে বাবা? মুখুজ্জেমশাই একেবারেই অথর্ব হয়ে গেছেন। আফিম খাওয়া বেড়েছে। তুই আয়, বিয়ে থা কর—আর ওরকম বাউণ্ডুলে হয়ে বেড়ালে…”

“তুই বুঝিয়ে বল্ গৌরী।” হাত দুটো কোলে জড়ো ক'রে নিলেন দাক্ষ্যায়ণী, বললেন—“দেখছেই তো। সকালের দিকে যা একটু সাড়াশব্দ থাকে, মেয়েটা ইস্কুলে যাওয়ার পর যেন নিঝুম হয়ে পড়ে। সেই বাড়ির এই চেহারা দাঁড়িয়েছে। রাত্তিরে যে কী ক'রে কাটে… বাইরে সব পাঁচভূতে লুটে খাচ্ছে—খাবেই, যা নিয়ম। আমি বলিনা

—বলবনা ব'লে একরকম দিব্যিই করেছি—জেদী বাপের জেদী ছেলে—তাঁকেও সাহস ক'রে কোনদিন মুখে কিছু বলতে পারিনি, ছেলেকেও বলতে সাহস হয়না—কিন্তু কী হচ্ছে বল্ দিকিন? বলিনা, ভয় হয়। হয়ত খেয়ালের মাথায় টুকতে গেলে—চিরদিন বারমুখো—না জানি আরও কত কি কপালে আছে আমার···আমার কথা বলবি,—উনি গেছেন পর্যন্ত আমার আর এ-বাড়িতে একেবারে আহ্নিক নেই। তবে তাঁর ধন তাঁর ধনকে তো বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে।···দেখছিস, এদানিং আসাও কমিয়ে এনেছে—ভয় হয়—নিজের জন্যে নয় গৌরী—আমি জানি আমার আর বেশিদিন নেই। আমি স্বপ্ন দেখি গৌরী—স্বপ্ন দেখি, তিনি এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—বলই পাই বুকে—তবে, শুধু ঐ স্বপ্ন তো নয়—স্বপ্ন দেখি তাঁর ছেলে যেন কোথায় চলে গেছে—গুছিয়ে যে দিয়ে যাব—তা, আতালিপাতালি করে মরছি, কোনমতে খুঁজে পাচ্ছিনা—সে যে আমার কী আতঙ্ক গৌরী—তোকেও বলতে সাহস হয়নি এতদিন···"

গলা অনেক আগেই ধরে এসেছিল, আর টানতে পারছেন না। "তোর মনে কি আছে বীরু বল খোলসা করে"—বলতে বলতে ওর কাঁধে মাথা লুটিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠলেন।

সুচিত্রা কপাটের বাইরে থেকেই হৈ হৈ করতে করতে আসছে—"এবার বীরুদা, আমাদের পুতুলের বিয়ের সব খরচটা···"

—উঠোনে পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অস্বস্তি কাটাবার একটা রাস্তা পেয়ে গিয়ে বীরেশ বলল—"আয়। তা হবে। তোর মেয়ে, না, ছেলে? মেয়ে হলে পারব না কিন্তু!"

সুচিত্রা অপ্রতিভ হয়ে ঘরের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বলল—"আয় বইখাতা রেখে, পরামর্শ হবে।"

পাঁচ

গোড়ায় যেটা ছিল অস্বস্তিই—হঠাৎ ঐ অবস্থায় পড়ে গিয়ে—সেটা রীতিমত আতঙ্কে দাঁড়িয়ে গেছে। পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যেই, একটু বেলা প'ড়ে এলে বেরিয়ে গিয়ে গ্রামের এ-বাড়ি সে-বাড়ি করে খানিকটা ঘুরে গল্পগুজব করে বেড়াল। ফিরতে কিছু রাতই হয়ে গেল, অন্যমনস্কভাবে ঘুরতে ঘুরতে গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে গিয়ে পড়েছিল, তবে, তাতে একটানা অনেকখানি সময় পাওয়ায় খানিকটা সুসংলগ্ন চিন্তা করবার সুবিধা হোল, কাছাকাছি এ-বাড়ি সে-বাড়ি ক'রতে যেটা হ'য়ে উঠছিল না। নানা ধরণের গল্পে মনটা হালকাও হয়ে এসেছে।

ওর প্রথম কাজ হবে মায়ের মনটা যতটা সম্ভব পরিষ্কার ক'রে দেওয়া। আপাতত। এরপর জীবন কোন্ পথ ধরবে কিছুই বুঝতে পারছে না। ঠিক এই সময়টা সে-চেষ্টাও করবে না বীরেশ। নিজের ওপর বিশ্বাসও নেই। এই তো চলে যেতে হচ্ছে এখন শুধু দেখা, ওর অনুপস্থিতি নিয়ে মা এভাবে না গোমরাতে থাকেন নিজের মনে।

কিছু-কিছু যেন আসছে মনে। জ্যোৎস্না রাত্রি। যে বড় রাস্তাটা উত্তরে কলকাতার দিকে চলে গেছে তার ওপর দিয়ে যাচ্ছিল, একটু পা চালিয়েই, শ্লথ করে দিল গতিবেগ। ঝিরঝিরে বাতাস আর জ্যোৎস্নাটুকু গায়ে বুলিয়ে নিতে নিতে, যা বলবে তা মনে গুছিয়ে নিতে নিতে।

এক সময় হুঁস হোল রাত হয়ে যাচ্ছে, আবার পা চালিয়ে দিল। তখন কাছাকাছি এসেও পড়েছে, কি বলবে, আর কিভাবে বলবে কথাটা তাও ঠিক করে ফেলেছে।

উঠানের তক্তাপোষেই বসেছিলেন ছু'জনে। কপাট ভেজানো এই ছিল। গৌরীদেবী. যেন এদিকে মুখ ক'রেই বসেছিলেন, ঠেলে প্রবেশ করতে দেখে বলে উঠলেন—"ঐ এসে গেছে।···হ্যাঁরে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ।···এতখানি রাত হয়ে গেল···"

"যেখানেই যাই, মার স্বপ্ন দেখার আগেই তো এসে পড়েছি—"

—বলতে বলতে বীরেশ হাসিমুখে দাক্ষ্যায়ণীর পাশে বসে, এবার সেই ওঁর পিঠে হাতটা তুলে দিল। রান্নাঘরের দিকে চেয়ে বলল—"বামনপিসি, আগে একটু চা।" মুখটা মায়ের দিকে ঝুঁকিয়ে একটু হেসেই বলল—"কেমন, ঠিক বলিনি মা?···এত ক'রে ভাবলে···এবার আমার সেখানে গিয়ে স্বপ্ন দেখার পালা—মা যেন···"

"হয়েছে!···"

—স্নেহপরশটুকুতে অভিমানটা বেড়ে যাওয়ায় উনি চুপ করে যেতে গৌরী বললেন—"তাহলে আমিই বলি বাবা। স্বপ্ন মায়েই দেখে—বেশিই যেন, ছেলের একটু কিছু হলেই; মায়ের হাজার ছুঃখেও ছেলে যদি স্বপ্ন দেখত তাহলে ছুনিয়াটা উল্টে যেত।"

"এই ছাখো কাণ্ড!"—ছু'জনের মাঝখানে গিয়ে বসেছিল বীরেশ, একটা হাত ওঁর পিঠেও তুলে দিল, বলল—"ছুই বোনই রাগ ক'রে বসে আছেন, আমি তাহলে দাঁড়াই কার কাছে?···বেশ, তোমাদের মোদ্দা কথাটা কি?—বিয়ে কর। সব ছেড়েছুড়ে বাড়িতে এসে বোস, এই তো? আমি ছুটোতেই রাজি আছি।"

ছুজনেই মাথা ঘুরিয়ে মুখের দিকে চাইলেন। দাক্ষ্যায়ণী মুখ খোলবার আগেই গৌরীদেবী মন্তব্য করলেন—"ঠাট্টা হোল? ঠাট্টার সময়?"

"মোটেই নয়।"—গম্ভীর হয়ে গিয়ে উত্তর করল বীরেশ। প্রশ্ন করল—"তাহলে এবার আমায় বলতে দেবে?"

"বলনা, মানা করছে কে?"—গৌরী উত্তর করলেন। দাক্ষ্যায়ণী একবার দৃষ্টি তুলে আবার নামিয়ে নিলেন।

বীরেশ বলল—"অনেকদিন পরে একবার গ্রামটা ঘুরে আসা গিয়েছিলাম। ভাবলাম, যাই কয়েকজনের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।··· মা, তুমি একটু মন দিয়ে শুনো। এ-পাড়ার মিত্তিরদের বাড়ি সেরে মনে হোল আগে দত্তপাড়ায় গিয়ে জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখাটা করেনিগে—মার 'গঙ্গাজল'এর কথা বলছি। সেবার অবস্থাটা খারাপই দেখে যাই, এবার জিজ্ঞাসা করাও হোল না—দেখেই আসি। ওদের বাগানটা ঘুরে এগুবো, বাড়ির মধ্যে তুমুল হৈ-চৈ! বাইরের দিকে কেউ ছিলনা, একটু এদিক ওদিক দেখে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। সেই পুরনো ব্যাপার, শাশুড়ী-বৌয়ের ঝগড়া। গলা অবশ্য মেজ বৌয়েরই—জ্যাঠাইমার—'ও বৌমা···ব্যাগ্যতা করি--বলা ঘাট হয়েছে, ঘরে ঐ একটা লোক ধুঁকছে!···' —এই রকম টুকরো টুকরো কথাগুলো তোড়ের মুখে ভেসে যাচ্ছে।

কেউ দেখতে পেল কিনা, একবার এদিক ওদিক চেয়ে নিয়ে চোরের মতন আস্তে আস্তে সরে পড়লাম।"

চুপ করল বীরেশ। বামনঠাকরুণ চা নিয়ে এলেন। আস্তে আস্তে চুমুক দিতে লাগল।

দাক্ষ্যায়ণীর একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বললেন—"ঐ এক পোড়াকপালী হয়েছে, বৌটা এসে পর্যন্ত···"

টুকে দিলেন গৌরী। পাতানো 'গঙ্গাজলের' ওপর গভীর সহানুভূতিতেই শুরু করেছেন উনি, বললেন—"এ যে তোমার অন্যায় কথা দিদি। ওঁর অদিষ্টে ঐ ছিল, তা বলে কেউ ছেলের বিয়ে দেবে না? তাহলে তো···"

"না, তা বলছি না···তাই কি বলতে পারি?"—সামলে নিলেন দাক্ষ্যায়ণী। একটু মনটা গুছিয়ে নিয়ে বললেন—"আর, তা যদি বললি—কোন্ বাপ-মা নিজের দিকে চেয়ে কবে ছেলের বিয়ে দিয়েছে বল্? আমার অদিষ্টে থাকে ওর মত, ঐ রকমই হবে। কেউ পারবে খণ্ডাতে? আর, আমার আর ক'দিন বল? যাওয়ার সময়

এই আশ্বাসটুকুতো থাকবে যে ছেলের একটা হিল্লে করে যাচ্ছি, তারপর···”

“তারপর তার কপালে যা থাকে ; এই তো ? বেশ মেনে নিচ্ছি। মায়ের দায়িত্ব শেষ হোল···”—একটু ব্যঙ্গ-পরিহাসের সঙ্গে উত্তর করল বীরেশ।

“কপালে মন্দই বা থাকবে কেন ?”—গৌরী মন্তব্য করলেন। বললেন —“এত বড় অঙ্গনা গ্রামটার ঘরে ঘরেই কি দত্তদের মেজো বৌ ? তাছাড়া, আজকাল মা-বাপকে দায়িত্ব নিতে দিচ্ছেই বা কে বল্ !—ছেলেই হোক। মেয়েই হোক···”

হাতটা হঠাৎ এমন একটু বেঁকে গেল বীরেশের যে, খানিকটা চা চলকে জামায় পড়ে গেল।

“কি হোল ?” বলে গৌরী থেমে গেলেন।

“না, হাতটা কেন যেন একটু আলগা হয়ে গেল। যা আবল-তাবল ব'লে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছ দুজনে !”

একটু হেসে উঠেই বলল —“তারপর ?···দুজনকেই জিজ্ঞেস করছি —তারপর নিজের হাতে নিতে গেলে যদি এই রকম আলগা হয়ে যায় হাতটা···মা, তোমাকেও জিজ্ঞেস ক'রে রাখি···”

বিরক্তই হয়ে উঠলেন দাক্ষ্যায়ণী, কিম্বা হয়তো ভানই করলেন বিরক্তির, কেননা তর্ক হলেও, এতগুলি মনের অনুকূল কথা এদিকে শুনেছেন ছেলের কাছে বলে মনে পড়ে না। বললেন—“হয়েছে। হাত আলগা হ'লে নিজে ভুগবি, আমি সেখান থেকে যেন দেখতে আসছি !···নে, হাতটা ধুয়ে নে। রাত ক'রে এসে এক আদাড়ে তর্ক জুড়ে দিলে দ্যাখোনা !···বামন ঠাকরুণ, তোমার হয়ে থাকেতো বেড়ে দাও। মেয়েটাও ‘দাদা দাদা’ ক'রে বুঝি ঘুমিয়েই পড়ল।”

খাওয়ার সময় এই কথারই জের চলল। বিবাহের কথাটা আপনি হতেই কলোনীর কাছাকাছি এসে পড়েছিল। অবশ্য, বিপাশাকে নিয়ে যা হয়েছে, ঘটনা যে-পথে এগুচ্ছে সেসব একে-

বারেই তোলা যাবে না, তবু স্বেচ্ছায় বিবাহের প্রসঙ্গটা যে খানিকটা এগিয়ে রইল, স্বীকৃতও হোল—এটা তো মন্দের ভালো। ওর জীবনের একটা অধ্যায়ের প্রথম পাতায় একটু আঁচড় কাটা রইল। তারপর সে-অধ্যায়ে লেখা কি হবে, তার আন্দাজ নিজেই কি পাচ্ছে?

একটা জিনিস হয়েছে। ওঁদের দু'জনেরই মন খানিকটা পরিষ্কার হয়েছে, যার জন্য নিজের মনও বেশ হাল্কা হয়ে এসেছে বীরেশের। সুচিত্রাকে তুলে তার সঙ্গে খানিকক্ষণ ফষ্টিনষ্টি করল। বিয়ের কথা নিয়েই। ওরা পুতুলের বিয়ে নিয়ে পড়েছে, এদিকে মা-মাসিমাদেরও ওর বিয়ের ভাবনা ভেবে ঘুম হচ্ছে না। পুতুলের বিয়েই যদি দাদার ঘাড় ভেঙে ভালো ক'রে দিতে চায়, তবে সময় লাগবে। তা কোন্‌টা আগে চায় সুচিত্রা?

ঘুমের ঘোরের জন্য বেশ সাড়া পেলনা। সুচিত্রা তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে গেলে নিজেই উঠানের প্রসঙ্গটা আবার তুলে বলল—"ছেলে রাজি হয়েছে বলে তোমরা রাতারাতি দু'জনে দু'দিকে মেয়ে খুঁজতে বেরিয়ে যেওনা যেন; ওটা তোমরা খুব পার। আগে আমায় বাড়ির দিকটা ঠিক ক'রে নিতে দাও। এসে বসবই একরকম ঠিক করে ফেলেছি; তবে সেখানেও অনেকখানি এগিয়ে গেছি—একটা উদ্দেশ্য নিয়েই তো—একেবারে গুটিয়ে না ফেলে দেখিনা দু'দিক সামলানো যায় কিনা। ধরণী রয়েছেই—তবে যা জামাই করেছ, বইয়ের পোকা, ওর ওপর তো ভরসা করা যায় না। তা, সে যাক, পরের কথা পরে হবে। আগে এদিকটা ঠিক করে নিই। হ্যাঁ, বেশ মনে পড়ে গেল, এসব পথে বাস চলাচল শুরু হচ্ছে শুনে এলাম এবার কলকাতা-ক্যানিং; আরও সব রুট ঠিক হচ্ছে। ও হয়েই যাবে। তাহলে অঙ্গনা থেকে ঘণ্টা দুয়েকের ব্যাপার—দিন গিয়ে দিন আসা। দু'দিক সামলানও তেমন বেশি কথা নয়।..."

জল খেয়ে উঠতে উঠতে বলল—"নাও, তোমরা লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে এবার থেকে স্বপ্ন দেখা বন্ধ কর দিকিন।"

আজ রাত্রেও অনেকক্ষণ জেগে রইল বিছানায়, তবে কালকের মতো দুশ্চিন্তায় নয়। নিজের মনে একটা গাঢ় তৃপ্তির স্বাদ। মায়ের মুখটাও যখন মনে পড়ে যাচ্ছে—সেই আতঙ্কের দৃশ্যটা সরে গিয়ে একটা চাপা প্রসন্নতার আলো।

ছয়

পরের দিনও উঠতে বেশ দেরি হয়ে গেল। সুচিত্রা সবার বারণের জন্যই তোলেনি, তবে খবরটা সবার আগে দেওয়ার জন্যে বই খাতা নিয়ে চৌকাঠের পাশেই বসে ছিল, বীরেশ দোর খুলে বেরুতেই জানাল, ধরণী এসেছে।

যে লোকটা মাছ দিতে যায়, আদেশ মতো সে প্রকাশ করেনি, তবে মাত্র তিন মাইলের ব্যবধান, লোকের যাওয়া-আসা লেগেই আছে, গতকাল প্রথম রাত্রেই খবরটা পেয়ে যায় ধরণী। কাল আর হয়ে ওঠেনি, আজ সকালেই বেরিয়ে পড়েছে।

এসেছে একাই। বাইরে গিয়ে কাছাকাছি ঘুরছিল, সুচিত্রা গিয়ে ডেকে নিয়ে এল। বীরেশ ঘরের ভেতর গিয়ে গেঞ্জিটা পরতে পরতে বেরিয়ে এসেছে, ওর প্রথম প্রশ্ন হোল—"কি হোল? চলে এলি যে।"—দৃষ্টিতে দারুণ আগ্রহ।

"বলছি।"

সুচিত্রা মুখ তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখের কোণে খুব সূক্ষ্ম একটু ইঙ্গিত করে গেঞ্জিটা টেনে দিতে দিতে বলল—"তুই টের পেলি কি করে? চিত্রা-মলুকে এনেছিস?"

"না। একাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম।···টের পেলাম···যেন মার কাছেই শুনলাম। তিনি কার কাছে শুনেছেন জিজ্ঞাসা করা হয়নি···"

বীরেশের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠতে বলল—"হাসলি যে ?···ও বুঝেছি···তা হয়না অন্যমনস্ক হয়ে যেতে ?"

"প্রফেসার !"

কথাটা উচ্চারণ করে এবার একটু স্পষ্ট ক'রেই হাসল—"না, অন্যমনস্ক হয়ে কি এমন দোষ হয়েছে ? তোদের একটু বেশিই হয়, সেই কথা মনে পড়ে গেল।···তুই একটু বোস নীচে চেয়ারটা নামিয়ে। মুখ ধুয়ে এসে সব বলছি।"

'সব'—অর্থাৎ কলোনীর কথা তোলবার সুযোগ সমস্তদিনে পাওয়া গেল না। দু'জনে অনেকদিন পরে বাড়িতে একত্র হয়েছে, ওঁদের একজন-না-একজন কেউ কাছাকাছি রয়েছেনই। সুচিত্রা স্কুলের সময়টুকু বাদ দিয়ে ঘরেই রইল, একান্তে পাওয়া গেল না নিজেদের। আলোচনা বেশির ভাগ বাড়ি-বাগান-খেতখামার নিয়েই হোল। কাল রাত্রে বেড়িয়ে এসে কথাটা বলা অবধি মনটা খুব ভালো আছে দাক্ষ্যায়ণীর, উনিই একসময় প্রসঙ্গটা তুললেন। বললেন—"একটা সুখবর বাবা ধীরু, ছেলের সুমতি হয়েছে, আবার বাড়ির ওপর মায়া হয়েছে, ফিরে আসছেন। তুমি কাছে কাছে থাকো। দেখো বাবা, মত যেন আবার না বদলায়। খেয়ালী বন্ধু তোমার—কত মত হোল, কত বদলাল ! না এসে পড়লে বলা তো যায় না।"

বিয়ের কথাটা কি ভেবে দুই বোনের কেউ পাড়লেন না।

সেটা আহার করবার সময় বীরেশ নিজেই উত্থাপন করল। বলল—"জানিস ধরু, বাড়ি ফিরে আসা ছাড়া দুই বোনে আর একটা কথা আদায় ক'রে নিয়েছেন আমার কাছ থেকে বিয়েও করতে হবে বাড়ি এসে···"

"ওমা, ছ্যাখো !"—দু'বোনেই শিউরে উঠলেন। গৌরীদেবী বললেন—"তুই নিজেই বললি না কাল বেড়িয়ে এসে ?"

দাক্ষ্যায়ণী একটু শঙ্কিত কণ্ঠে বললেন—"ঐ নাও বাবা, যা বলছিলাম—মত বদলাবার লক্ষণ নয় এসব ?"

বীরেশ একটা মাছের মুড়া ভাঙতে ভাঙতে লঘু হাস্যের সঙ্গে বলল—"মা সমস্ত রাত ঘুরে বেড়াবেন—ছেলে কোথায় গেছে, কী হয়েছে, খুঁজে পাচ্ছেন না…"

কথাটা গলায় আটকে যেতে আবার সামলে নিয়ে বলল—"আচ্ছা, আদায় করে নেওয়া আর কাকে বলে, তুই-ই বলনা।"

নেপথ্যে কলোনীর প্রচ্ছন্ন ইতিহাস রয়েছে, যার জন্য বাড়ি ফিরে আসার কথায় তখন চকিতে চোখ তুলে চেয়েছিল ধরণী; এবার কয়েক সেকেণ্ড বেশি করেই চেয়ে রইল ওর দিকে। তবে, মাথা হেঁট করে মাছের মুড়া নিয়ে অত্যন্ত মনোযোগী থাকতে দেখে মুখে কিছু বলল না। এরপর একটু যেন যতিভঙ্গ হয়ে গিয়ে নিঃশব্দতাই এসে পড়ল। সেটাও কাটিয়ে দিল বীরেশই। বলল—"চুপ করে গেলে কেন?" পরক্ষণেই একটু হেসে বলল—"যেটা ঠাট্টা ক'রে বলছি না সেটা ঠাট্টা বলেই ধরে নেবে, আর যেটা বলছি ঠাট্টা ক'রেই সেটাতে গম্ভীর হয়ে যাবে। বলবার আর ধরণ কি আছে বলবে তো?…নারে ধরু, বিয়েটা সত্যিই করতে হবে এবার। ইয়ে—আমিও তেমনি দু'জনের কাছে একটা কথা আদায় করে নিয়েছি—তেমন হয়তো নিজেই ঠিক করব। তুই এসেছিস, ভালোই হোল, একটা পরামর্শ করা যাবে।"

জল খেয়ে নিয়ে বলল—"ওটা আবার তোমাদের ঠাট্টা নয় তো? তা বলে দাও সময় থাকতে বাপু।"

ঘুমিয়ে ওঠার পর বিকালের ছায়া ভালো ক'রে কাজলদীঘির ঘাটে নেমে এলে, দু'জনে মিলে পাশাপাশি বসল।

নিজের শাস্ত্রে পণ্ডিত হলেই পরামর্শদাতা হিসাবে বিচক্ষণ হতে হবে, এমন কোথাও লেখাজোখা নেই। কথাটা ধরণীর সম্বন্ধে আরো বিশেষ ক'রে খাটে। ও ইতিহাসের ছাত্র, পরে অধ্যাপক, এখন আবার ডক্টরেটের জন্যে থিসিস নিয়ে আরও মসগুল হয়ে রয়েছে। ইতিহাস আর দর্শনশাস্ত্রের মতো মনকে একনিষ্ঠ ক'রে রাখবার মতো আর অন্য কিছু নেই। ইতিহাস আবার অনাদি শাস্ত্র, অনন্তও।

তার মধ্যে খুঁজে পেতে দেখলে সব ঘটনারই সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং পরামর্শ প্রার্থীর সব রকম প্রশ্নেরই মনের মতো উত্তরও মেলে। "এটার পরিণাম কি ভালো হবে?"

..."কি করে হতে পারে?"..."এটা করা কি অন্যায় হবে?"... "কেন অন্যায় হবে বুঝছি না তো। ক'রেই দেখোনা।"—এ ধরণের প্রতি কথারই মনের মতো উত্তরে আত্মবিশ্বাসে তৃপ্তি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পরিণাম বিষয়ে সন্দেহের নিরসন হয় না।

বিপাশা-ঘটিত ব্যাপারটা ধরণী জানে, একমাত্র ওকেই বলেছে বীরেশ। তবে, পরামর্শ হিসাবে নয়, অভিন্নহৃদয় বন্ধু হিসাবে: বোধহয় হয়ে গেলে পূর্বে না-বলার অপরাধের কথাও ভেবে। তারপর কিন্তু যখন মনে দ্বিধা উপস্থিত হোল, স'রে আসারই সংকল্প, ধরণীকে আর তার মধ্যে টানেনি। অপ্রয়োজন বোধেই। হয়, টের পাবেই; না হয়, তাও টের পাবেই।

একটু সঙ্কোচ আসে না-বলার। কিন্তু সুবিধা এই যে, পড়াশুনায় এত ডুবে থাকে, যে, প্রেম, ভালবাসা, কি নারীমোহ—এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পায়না ধরণী। বীরেশ এটা দেখেছে চিত্রার ব্যাপারে। বিয়ের আগে অতদিন একসঙ্গে কাটাল, কিন্তু চিত্রা ওর মনে কোন দাগ কাটতে পারেনি: বন্ধুর বোন, সুতরাং তারও বোন, এই নীতি-বাক্যটাই কাজ করে এসেছে। আবার, যখন বিবাহের আয়োজন হোল, বেশ নির্বিবাদেই উঠে গিয়ে বিবাহ সেরে আবার পড়ার টেবিলে এসে বসল।

সেদিন বিপাশাকে যা বলতে, নিরস্ত করতে, নিষ্প্রয়োজন জ্ঞানেই বলেনি বীরেশ, আজ বলল। প্রত্যাশা মতো ধরণীর তখনকার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আরম্ভ করল—"তুই তখন যে জিজ্ঞাসা করলি—তা হোল না।"

একটু চোখ তুলে ভেবে নিয়ে বলল—"পরশু হোলনা বলাই ঠিক হবে বোধ হয়।"

"তার মানে?" প্রশ্ন করল ধরণী।

আবার চোখ তুলে একটু চুপ করে রইল বীরেশ। পরে বলল—"অনেক ব্যাপার এসে পড়েছে এর মধ্যে ; বিপাশা থেকে নিয়ে বাড়ি-মা-মাসিমা পর্যন্ত। বেশ ভালো ক'রে সব শুনে একটা পরামর্শ দে তো। আমার গুলিয়ে যাচ্ছে।"

সেদিন বিপাশার সঙ্গে যা কথা হোল, সেভাবে, তাব নাটকীয় অংশটা যথাসম্ভব বাদ দিয়ে মোটামুটি সব বলে গেল।

শুনে গিয়ে ধরণী একটু চুপ করে রইল, তারপর বলল—"এসব কথা আগে না ভেবে এগিয়ে ভুল করেছিস দেখছি।"

"তা তো করেছিই। এ সব ব্যাপারে…"

থেমে যেতে ধরণী প্রশ্ন করল—"থেমে গেলি যে?"

বীরেশ একটু হাসল। বিনা আয়াসে চিত্রাকে পাওয়ার কথাটা প্রায় বেরিয়েই গিয়েছিল মুখ দিয়ে, ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"এসব ব্যাপারে ভুলটাই নিয়ম ধরু। এখন কথা হচ্ছে, কি ক'রে সামলানো যায়।"

"বিপাশাকে তো ভেবে দেখবার কথা বলেছিস। যথেষ্ট সময়ও পাবে। দেখ কি বলে, তারপর…"

"বলবার দুটি-মাত্র কথা আছে—হ্যাঁ, কিম্বা না : অর্থাৎ নিরস্ত হওয়া আমার কথায়, কিম্বা না হতে যাওয়া। যদি হয় নিরস্ত তাহলে কোন সমস্যা থাকে না। যদি না হয়, তাহলে যে বিপুল সমস্যা—মা, মাসিমা, বাড়ি, সমাজ—ভেবে দ্যাখনা। আর হ্যাঁ—শেষে এও বলেছি ; যদি মত না বদলায় তাহলে যা বলে তাই হবে।"

"তাও বলে দিয়েছিস!"—একটু বিস্মিতভাবেই প্রশ্ন কবল ধরণী, মন্তব্যও করল—"বড় কাঁচা কাজ করেছিস।"

হতাশা আর বিরক্তিতে বীরেশের মনে হোল নিজের বুড়ো আঙ্গুল কামড়ায়। তবে, জেনেশুনেই ডেকে বসেছে, কয়েক সেকেণ্ড থেমে সহজ কণ্ঠেই বলল—"বুঝেছি, বলতে চাস, এটুকু না বললে, অর্থাৎ যেটাকে বলা যায় কমিট (commit) করে ফেলা—সেটা না করলে কথা ভেঙে দেওয়া সহজ হোত।"

একটু ভাবল। তারপর একটু হাসিও ফুটল ওর ঠোঁটে। বলল—"হয়েছে!···তুই বলতে চাস—এ রকম কত বিয়ের কথা যাচ্ছে ভেঙে—এর চেয়েও পাকা কথা দেওয়া সত্বেও। কিন্তু সে বাপমায়ের ঠিক করা সম্বন্ধ, তার মধ্যে ছেলেও নেই, মেয়েও নেই। কিন্তু এ যা হয়েছে—দোষ ঢাকব কেন?—আমিই যা করে বসেছি—সে একটা নিরীহ মেয়ে—আমার মোহের বলি হয়ে—এ মোহের পেছনে রূপলিপ্সা নেই, লালসা নেই, এটা দাবি করবারই বা কি অধিকার আমার আছে?—আমার এ শুদ্ধ ভালোবাসা—একথা বলতে সাহস হয়না ধীরু: কিন্তু ভেবে দেখ, সে তো সর্বস্ব পণ ক'রে বেরিয়ে এসেছে—বেরিয়েই এসেছে ধীরু—আর তার ফিরে যাওয়ার পথ রাখিনি···"

আর এগুতে পারল না। কোঁচাটা তুলে চোখ দুটো মুছে নিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইল। ধরণীও চুপ করে রইল। একটু অপ্রস্তুতও হয়ে পড়েছে। ঘাটের ওপর বকুল গাছ, টুপটাপ করে এখানে ওখানে ফুল ঝরে পড়ছে; পায়ের কাছ থেকে দুটো তুলে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে কয়েকবার নাকে ঠেকাল।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটল এবার। তারপর এক সময় প্রশ্ন করল—"তাহলে কি করবি?"

বীরেশ উত্তর করল—"কি করা যায় বলনা; সেইজন্যেই তো ডেকে নিয়ে এলাম তোকে!"

"সত্যি এই জাতিভেদের ব্যাপারটা কী যে ক্ষতি করেছে আমাদের—কী যে একটা অভিশাপ—কিন্তু, সেই আদিযুগে হয়তো কোন সার্থকতা ছিল এর—ইতিহাসের দিক থেকে দেখতে গেলে—তারপর এই হাজার বছরে পরাধীনতাও—যার গোড়ার কথা ছিল এই জাতিভেদ···"

বীরেশকেই যে শোনাচ্ছে এমন নয়। একটা সবাক চিন্তাই, অন্যমনস্ক হয়ে। হুঁস হতে আবার চুপ করে গেল। তারপর, আরও

দুটো ফুল তুলে নিয়ে লুফতে লুফতে বলল—"এমনই যখন অবস্থা, তুই করেই ফেল বিয়ে বীরু। অবশ্য, নিরস্ত করবার আর একবার চেষ্টা ক'রে।"

"তারপর?—আর সব কথা ছেড়ে দিলেও—মা?"

"ভুগতে হবে। বিপাশা যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে, তখন আর উপায় কি?"

যে উদ্দেশ্যেই বলে থাকুক, বীরেশ আত্মতিরস্কারে নিজের ওপরই তুলে নিল কথাটা। একটা দীর্ঘশ্বাস নামিয়ে দিয়ে বলল—"এতক্ষণে একটা কথা বলেছিস—সত্যিই তো, যে-মায়ের এমন ছেলে, ভোগা-ছাড়া তাঁর আর উপায় কি আছে? কিন্তু···"

"আমি তা ভেবে বলিনি বীরু, বিশ্বাস কর। জাতিভেদ প্রথা—এই অভিশাপটাকে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা—আজকের এই ধরণের অসবর্ণ বিবাহও যার মধ্যে আসে—এ-পরীক্ষা দেশে অনেকবারই হয়ে গেছে। বুদ্ধদেব করেছেন, তাঁর সর্বব্যাপী প্রচেষ্টায়, বাংলায় চৈতন্যদেব করেছেন, আজও উত্তর-ভারতে দয়ানন্দের আদর্শে তাঁরা কাজটা করে যাচ্ছেন—বাংলায় চৈতন্যদেবের পর রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজে এই চেষ্টাই।···এইবার একটা কথা বল আমায়, এই চেষ্টায় যারা শহীদ হোল—তোর কথায় 'বলি' হোল বলা যাক···"

"শহীদ-বলি-মার্টার, সে তো তাদের মা-বাপ, আত্মীয়স্বজন···"

"তার সঙ্গে নিজেরাও বৈকি বীরু। ভেবে দেখনা, তোকে কতখানি স্যাক্রিফাইস্ (sacrifice) করতে হচ্ছে—বিপাশার স্যাক্রিফাইস্ তো মেপেই ওঠা যায় না।···

আমার নিজের ভালোবাসার দৌড় ঐ চিত্রা পর্যন্ত, অর্থাৎ বিবাহের পর যে ভালোবাসার প্রলেপ দিয়ে লোকে সংসারধর্ম করে থাকে, কাজেই তোদের মতন ভালোবাসায় আমার প্রবেশ নেই এটা মানতেই হবে। তবে, তার জন্যে যখন এতখানি মূল্য দিতে হচ্ছে, তখন তোরাও শহীদ নয়, একথা মানব কেন?···এবার, যা

বলতে চাইছিলাম। যখনই এ রকম প্রচেষ্টা হয়েছে, সাফার (suffer) করতেই হয়েছে—মা, বাপ, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন কেউ বাদ যায় নি। মায়ের উপায় নেই—আমি এই অর্থেই বলেছি বীরু।”

চুপ করল।

পরে আবার শুরু করল—“যুদ্ধ-বিগ্রহ-মন্বন্তরের সঙ্গে এ ধরণের কত ট্র্যাজেডী যে লেখা আছে ইতিহাসের পাতায় তার ইয়ত্তা আছে! এ তো একটা শুভ-উদ্যোগের ট্র্যাজেডী। সয়েও যাচ্ছে—সদ্য সদ্য হোক, এক পুরুষে হোক বা দু'তিন পুরুষে হোক। মায়েরা অবুঝ নন্, যুগের ধারা দেখছেন।...আর, হ্যাঁ!...”

হঠাৎ মনে পড়ে যেতে বলল—“আর তুই তেমন কোনও নীচু জাতের মেয়ের আনছিস না ঘরে...বামনের মেয়ে...ওদের সেন্টি-মেণ্টের (sentiment) কথা ভেবে বলছি...”

ঘাড় হেঁট ক'রে শুনে যাচ্ছিল বীরেশ। ধরণী যে এতখানি বলবে, এত আবেগভরে, ভাবতে পারেনি। ওর শেষ কথায় একটু চকিত হয়ে উঠেই বলল—“সে তো ওঁদের নজরে আরও মহাপাপই ধরণী।”

ধরণী কি উত্তর দিতে যাবে, সুচিত্রা একরকম ছুটতে ছুটতে এসেই দূর থেকেই বলল—“বেশ, তোমরা নিশ্চিন্দি হয়ে গল্প করো, বড় মাসি জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় শুয়ে...”

“কি হোল?”

দু'জনেই মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন ক'রে হনহন ক'রে বাড়ির দিকে এগুল।

সাত

খবরটা ঘটা করেই চারিয়েছে সুচিত্রা। উঠানে চাকর দামোদর আর জন তিনেক মুনিষ দাঁড়িয়ে আছে শুকনো মুখে। ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে বামন ঠাকরুণ আর মুখুজ্জেমশাই। দাক্ষ্যায়ণী একটা চাদর মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে আছেন, মাথার কাছে গৌরীদেবী ব'সে,

বললেন—"কাঁপুনি দিয়েই এল জ্বরটা। এখন একটু ঘুমুচ্ছেন, কি, হয়তো ঝিমিয়েই আছেন।"

"কতক্ষণ হোল?"

"এই তো। খানিক আগে উঠে তোদের কথা জিজ্ঞেস করলেন। তোর কথাই উঠল, কাল থেকে মনটা একটু ভালো আছে—গল্প করতে করতে বললেন—'শরীরটা কেমন যেন আনচান করছে।' ধরে নিয়ে আসতে আসতেই কাঁপুনিটা এল, শুইয়ে দিয়ে সুচুকে বললাম তোদের ডেকে আনতে। ভয়ের কিছু নেই।"

"কেন?" শেষের মন্তব্যটুকু একটু কানে ঠেকতে প্রশ্ন করল বীরেশ।

বললেন—"এই বয়সের বাতিক জ্বর···হয়ে পড়ে কখন কখন।"

"আমায় তো জানানো হয়নি।"

"মানা করেন। বলেন—সেখানে একটা কাজ নিয়ে রয়েছে, দরকার কি ব্যস্ত ক'রে তাদের সবাইকে? বয়সের বাতিক জ্বর—হচ্ছে আবার চলেও যাচ্ছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে···জানানো হয়নি।"

বলতে বলতে কপালে হাত দিতে দাক্ষ্যায়ণী ঘাড় ঘুরিয়ে একটু চেয়ে থেকে প্রশ্ন করলেন—"বীরু?"

"হ্যাঁ মা। কেমন আছ?"

"ভালোই। বোস।"

গৌরীদেবীর পাশে বসে পড়ল বীরেশ। ধরণীকে বলল—"তুই সাইকেল করে যা, ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন।"

একটু পরে ডাক্তার এসে ঐ কথাই বললেন। বাড়ির ডাক্তার, আসেন মাঝে মাঝে। একটু ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে বললেন—বাতিক জ্বরই বয়সের, তবে এবার বুকে-পিঠে একটু সর্দির ভাব আছে। জিজ্ঞাসাবাদ করতে বীরেশ সেদিন রাত্রে উঠানে ব'সে গল্প করার কথা বলল—অবশ্য অন্যভাবে। জানালেন, তাতেই এটুকু হয়েছে। ভয়ের

কিছু নেই, তবে বয়স হয়েছে, এদিকে একটু দুর্বলও হয়ে পড়েছেন, সময়টাও এখন খারাপ, সাবধান হওয়া ভালো।

ওদিকে কলোনী সম্বন্ধে কিছু গল্পসল্প ক'রে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়ে চলে গেলেন।

পরদিনই চলে যাওয়ার কথা বীরেশের, আটকে পড়ল। কি ভেবে ধরণীকে কালই বিপাশার আসার কথাটা বলেনি, হয়তো গল্প চলছিল, পরে বলবে ব'লে ছেড়ে গিয়েছিল, আর বলল না। পরের দিনও ওকে আটকে রাখল, ওর বাড়িতে খবর পাঠিয়ে, আর, নিষ্প্রয়োজনেই চিত্রাকে আসতে বারণ করে। মলয়ও ঐখানেই রইল। তৃতীয় দিনে দাক্ষায়ণী ভালোভাবেই উঠে বসতে ধরণী বিকালে চলে গেল। এদিকে কিছুটা গোলমালেই কাটার জন্য বিপাশার কথা আর ওঠেনি। যাওয়ার সময় ধরণীই প্রশ্ন করল - "তা, বিপাশাকে কবে আসতে বলেছিস?"

ওর সঙ্গে খানিকটা এগিয়ে এসেছিল বীরেশ, বলল-"কালই একরকম ঠিক ছিল। ফিরে যাবেখন, তারপর আমি গিয়ে খবর দিলেই হবে। তুই পাঁচদিনের ছুটি নিয়েছিলি না? আরও দুটো দিনের না হয় দরখাস্ত পাঠিয়ে দে। চিত্রা থাকলে তো এসব কথা হবে না।"

নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে কথাগুলো ব'লে গেল, যেন এ নিয়ে আর মাথা ঘামাবার কি আছে?

তারপর ধরণী ওর সাইকেলে চেপে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপাশাকে নিয়ে কলোনীর চিন্তাটাই ওকে একেবারে অভিভূত ক'রে ফেলল।

একটা চিত্র কল্পনায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিপাশা এসে দরজায় কড়া নাড়ছে। শুকনো মুখ—যেমন দেখে এসেছিল—যতক্ষণ না চাকরটা, বা, পাচকঠাকুর দোর খুলে দিচ্ছে, ঘাড় ঘুরিয়ে চারিদিকে কুণ্ঠিত দৃষ্টি হানছে থেকে থেকে—গলির মুখে একটা বাড়ি—দু'ধারে পোড়ো

জমির পর মাঝে একটা। একটা শেষের দিকে নূতন উঠছে। ভাড়াটে আসার কথা শুনে এসেছে বীরেশ।...সুন্দরী যুবতী, বাড়িতে দু'জন যুবক—কৌতূহল কি আরম্ভ হয়নি ?...চাকর এসে দোর খুলে দিল। পা বাড়াতে যাবে, শুনল, বীরেশ বাড়ি নেই, হঠাৎ পরশু বাড়ি চলে গেছে। ওরা কেউই আসেনি।

সেদিনকার চেয়েও মুখটা ছাই হয়ে গেছে বিপাশার। কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

কি ভাবছে বিপাশা ?—মিথ্যুক ? জালিয়াৎ ? কাপুরুষ যে সে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে তার।...এরপর কি করবে ?

হুঁস হোল রাস্তায় একভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে মজা আদিগঙ্গার বাঁধ বেঁধে দূরে দূরে পুকুর করা আছে, নাম 'বোসের গঙ্গা', 'ঘোষের গঙ্গা', এর গঙ্গা, তার গঙ্গা—যার যেমন মালিক। একটার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল বীরেশ, গিয়ে বাঁধানো ঘাটে বসল নির্জন রাস্তা, ঘাটও এ সময়ে নির্জনই থাকে।

চিন্তার কূলকিনারা পাচ্ছে না।...ফিরে গিয়ে কি করবে বিপাশা ? কি বলে বেরিয়ে এসেছে আজ ? আজও কি একমাত্র ওর বৌদিদিই জানেন ? জানাজানি হয়ে গিয়ে থাকলে...তাই হয়ে যাক—হয়ে গিয়ে একটা জায়গায় ঘটনা এসে দাঁড়াক, যে ভাবেই হোক—এ যেন আর সহ্য হয় না...

এক সময় একটা কথা মনে পড়ে গিয়ে চিন্তাটা হঠাৎ নবম পর্যায়ে নেমে এল। কেন চলে এল অমন হন্তদন্ত হয়ে, একেবারেই কিছু বলে আসেনি। উৎকলী পাচকঠাকুর জগবন্ধু একটু কল্পনাপ্রবণ, একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে বলতেই, যাতে করে তেমনি কোন একটা দুর্ঘট ঘটায় যে চলে আসতে হয়েছে তাকে, এই ধারণাই দাঁড়িয়ে থাকে বিপাশার, দোষটা কেটে যাবে বীরেশের দিকে।

এই থেকে ওকে ছেড়ে মায়ের কাছে চলে এল মনটা। আসার সময় বসেই ছিলেন, ধরণী প্রণাম করতে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ,

করে একটু এলিয়ে শুয়ে পড়লেন। কবে ওঁরই মুখে শোনা একটি কথা মনে পড়ে গিয়ে মনটা টনটন করে উঠল। এই রকমই বিদায় দেওয়ার সময়। বললেন—"বয়স হয়েছে বাবা, এখন চোখের আড়াল হলেই মনে হয় আর বুঝি দেখা হবে না," মা আর বিপাশা। দু'জনকেই রাখা, যাবে না। ধরণী বলল, সয়ে যায়। তা যায় বৈকি। ইতিহাসের পাতায় লেখা, আগে সয়ে গেছে। বর্তমানেও কি যাচ্ছে না? দেখছে তো। তারা দু'জনেই তো প্রথম নয়। সয়ে যে যাচ্ছে, সেও ট্র্যাজেডী। আবার সেখানে সইছে না…?

মনে মনে শিউরে উঠল বীরেশ। উঠেও পড়ল। না, এ হতে দিতে পারবে না। এর মধ্যে দোষ অপরাধ যা কিছু তাদেরই, বিপাশারও বৈকি। একেবারে ছেলেমানুষ তো নয়। ধরণী বলল, ভুগতে হবে। মাকে ভুলতে হবে কেন? মা হওয়ার অপরাধের জন্যে?

সে-রাত্রেও ভালো ঘুম হোল না।

আরও তিনটে দিন যে থেকে যেতে হোল, এইভাবেই কাটল। মনটা দোল খাচ্ছে; একবার বিপাশা, একবার মা। মা যেমন যেমন সেরে উঠছেন, সেই অনুপাতে মনটা বিপাশার দিকে গিয়ে পড়ছে। নিজের অসহায়তায়—ভেতর-বাহির-ঘাট-বাগান ক'রে কাটাল বীরেশ। ধরণীকে খবর দিয়ে যাচ্ছে! তাদের সঙ্গেই যাওয়া ঠিক করেছিল একরকম। ধরণী জানিয়েও দিল, একটা কাজে একটু আটকা পড়ে যাওয়ায় আর একটা দিন বাড়িয়ে ছুটির দরখাস্ত দিয়েছে।

মার পথ্য করার দু'দিন হয়ে গেছে। মুখুজ্জে মশাইকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে দু'দিন অন্তর চিঠি দিতে বলে, ডাক্তারকেও মাঝে মাঝে দেখে যেতে বলে বেরিয়ে পড়ল বীরেশ।

আসার সময় নিজেদের ছই-ওলা বলদ গাড়ি। মাঝামাঝি এসে একটা বড় গঞ্জে ট্যাক্সি পাওয়া যায়। কিম্বা পথেই কোথাও যাত্রী-নামিয়ে ফেরৎ খালি ট্যাক্সি। এই রকমই একটা পেয়ে গেল মাইল

আষ্টেক এগুতেই। সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরিয়েছিল। কলোনীর বাসায় গিয়ে যখন নামল, সন্ধ্যার ছায়া একটু একটু ক'রে নেমে এসেছে। চাকর উমাচরণ দোর খুলে দিতে প্রশ্ন করল—"এর মধ্যে কেউ এসেছিল?"

দেখা করতে আসে কেউ কেউ কাজে-অকাজে। উমাচরণ ছু'জনের নাম করতে, বাধা দিয়ে বলল—"তোদের বাইরের দিদিমণি?"

"ও, হ্যাঁ!···তিনিও এসেছিল···ভরন্ত সন্ধ্যেয়। একটা চিঠি দিয়ে গেল—কারুর হাতে দিতে মানা করে। আমি···"

"নিয়ে আয় ওপরে।"—বলে হনহন ক'রে, ওপরে উঠে যেতে যেতে বলল—"ঠাকুর কোথায়, তাকে শীগগির চা-জলখাবার ক'রতে ব'লে দে।"

চাবি দিয়ে যায়নি, ইজিচেয়ারটা পাতাই ছিল বারান্দার শেষে, বসে পড়ল। চিঠিটা নিয়ে আসতে, কম্পিত হস্তে খামটা ছিঁড়ে পড়ল। ৭৪৷৹ দেওয়া খাম, লেখা আছে—

বীরুদা, বৌদিদি জানিয়ে দিয়েছেন। বলছেন অবশ্য দেননি। এও বলছেন, যা ঘটল এর সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। বহরমপুরে আমার এক মাসতুতো ভাই থাকেন। তাঁর মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্নে আমি আর দাদা যাচ্ছি। তিনি বহরমপুর কলেজের প্রফেসার। বেশি লেখার সময় নেই, এরপর বুঝে নিতে পরেবেন। কাল দেখা করার কথা ছিল, আজকের গাড়িতেই চলে যাচ্ছি।

আপাতত মেনে নিলাম অদৃষ্টকে। হাসি মুখেই কিছু আপত্তি না ক'রে। আমোদ করেই বলেছি—কতদিন থেকে যে তাঁদের দেখবার ইচ্ছে ছিল! বাপমায়ের লক্ষ্মী মেয়ে!

এবার থেকে লক্ষ্মী মেয়েই হয়ে যাব ভাবছি। একটা কারণ—এগুব যে, এগিয়ে কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব? ওদিকেও তো লক্ষ্মী ছেলে। আজ এইখানেই শেষ করছি। ঠিকানাটা দিয়ে রাখলাম, তবে আমার চিঠি না পেলে চিঠি দেবেন না।

শেষের এ পঙক্তিটা হিজিবিজি করে কাটা। তাড়াতাড়িই, তবে পড়া যায়। ঠিকানা দেওয়াও নেই নীচে। এরপর লেখা আছে—

ঠিকানা আর দিলাম না। কি জানি, লক্ষ্মী ছেলে আবার দুষ্টু হয়ে উঠে কি অঘটন ঘটাবেন!

বিপাশা।

চিঠিটা হাতে ক'রে গুম হয়ে বসে রইল বীরেশ।

আট

প্রত্যাখ্যানে আকর্ষণই আরও বাড়ায়। প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই নিয়ম, তবে ভালোবাসার ক্ষেত্রে আরও বেশি ক'রেই। প্রত্যাখ্যান যেখানে আত্মসম্মানে ঘা দেয় সেখানে মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করে। ভালোবাসায় অনেককিছুর সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে আত্মসম্মানও খুইয়ে বসে লোকে। বীরেশ অঙ্গনা থেকে যে মনোভাব নিয়ে বেরিয়েছিল তাতে, মনের খুব গভীরেই একটা কথা ছিল, দু'দিক রক্ষা করা, ধরণীর "সয়ে যায়" কথাটার ওপর নির্ভর করে। চিঠিটা পড়ার পর হঠাৎ এমন একটা শূন্যতা এসে পড়ল, সেটা বিপাশা ছাড়া আর কিছু দিয়েই পূর্ণ করা যায় না। বিপাশা যে তার জীবনে এতখানি, এ-উপলব্ধিটা এর আগে কখনও হয়নি। অসহায় বোধ হচ্ছে। একটা আতঙ্কও ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে মনটাকে, এবার থেকে বিপাশা ছাড়া তাকে থাকতে হবে!...

ঠাকুর লুচি, হালুয়া আর আলুভাজা নিয়ে এল দু'টো প্লেটে ক'রে, চাকরটার হাতে চা। বাইরের দিকে মুখ করে বসে ছিল বীরেশ, ঘুরে দেখে বলল—"খাবার নিয়ে যা এখন। খালি চা।"

চায়ের টেবিলটাও বাইরেই পড়ে আছে যাওয়ার দিন থেকে। চা রেখে দিয়ে ওরা দু'জনে নেমে গেল।

চায়ের চুমুকের সঙ্গে চিন্তাটা একটা স্পষ্ট রূপ নিল। ওভাবে হা-হুতাশ নয়, বিপাশাকে পেতে হবে। পৌরুষের জোরেই ; বিপাশা একটা আশঙ্কা ক'রেই ঠিকানা দেয়নি ; কিন্তু বহরমপুর এমন জায়গা নয় যেখানে একটা মেয়ের ঠিকানা বের করা—শক্ত হলেও—অসম্ভব হবে।···কলেজের প্রফেসার—বিপাশার মাসতুতো ভাই, সুতরাং ব্রাহ্মণই—মেয়ের বিবাহ, সুতরাং অন্তত মাঝামাঝি বয়সের মানুষ।

এরপর বিবাহের ব্যাপারটা রয়েছে। নিশ্চয় কলেজের সব প্রফেসারেরই কন্যার একসঙ্গে বিবাহ নয়···

প্রণয়ীর বিচারশক্তি একদিকে যেমন মূঢ়, অন্যদিকে তেমনি কুশলী। একজন পাকা ডিটেকটিভের মতোই অসম্ভবের দিকটা কমাতে কমাতে সম্ভাবনাটা প্রায় কেন্দ্রীভূত ক'রে নিয়ে এল বীরেশ।

এতে আর কিছু না হোক, মনটা অন্তত সাময়িকভাবে খানিকটা সুস্থির হয়ে এল। তার একটা সুবিধা এই হোল যে তাড়াতাড়ি কিছু না ক'রে চারিদিক ভালো ক'রে বিচার ক'রে অগ্রসর হওয়ার মোটামুটি একটা ছক তৈরি ক'রে নিতে পারবে।

দিন কতক এখন একেবারে চুপচাপ ক'রে বসে থাকবে, কেননা সদ্য সদ্য এখানে ওখানে দু'জায়গাতেই সবাই সতর্ক-সজাগ থাকবে। বিপাশা লিখেছে—অদৃষ্টকে মেনে নিয়েছে। 'আপাতত' কথাটা জুড়ে দিয়েছে কি ভেবে ঠিক বোঝা যায় না। একটু কি ফেরার পথ রেখে দিল ? ওর উদ্দেশ্য যাই থাক, বীরেশও এমন বাইরের আচরণ দেখাবে, সেও যেন মেনে নিয়েছে অদৃষ্টকে। মাস দুয়েক এখন ওদিকে পা বাড়াবে না। ব'সে ব'সে যতটা সম্ভব খবর নেওয়া।

আশার পথ ধরেই এগুতে চাইছে মনটা।

বিপাশা ঠিকানা লিখতেই যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ির মধ্যে লেখা চিঠিতে মনস্থির করতে না পেরে কেটে দিয়েছে ; সেখানকার পরিস্থিতি একেবারে প্রতিকুল না হলে যা ভেবে দিতেই যাচ্ছিল ঠিকানা সেই মনোভাবটা আবার ফিরে আসতে পারে। তার জন্যে

একটু ধৈর্য ধরে থাকাই ভালো।···বিপাশার ভালোবাসা এতই ভঙ্গুর হবে? তার নিজের চেয়েও যে বেশি। দেখল তো এতদিন।

ওদিক থেকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মনটা এই আশায় অঙ্গনায় ঘুরে গেল। মার কাছে।

ধরণী যেমন বলল—সম্ভব নয় মার স'য়ে যাওয়া?···একটিমাত্র সন্তান—যদি ভুল করেই পা বাড়িয়ে থাকে, বুঝবেন না তার দিকটা? করবেন না ক্ষমা? নিজের স্বভাবেই মা সংসারে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারেননি বলেই মায়ের স্নেহকাতর, কোমল মূর্তিটা ক্ষয়-দুর্বল হ'য়ে ভেসে উঠছে চোখের সামনে।···সমস্ত জীবনে মার আর অন্যরূপ দেখলই বা কবে? এর সঙ্গে আর একটা কথা আছে। আশার কথাই কিছুটা। মাসিমা শহরের মেয়ে, সেকালের হিসাবে শিক্ষিতা। বিবাহের আগে মেয়েদের স্কুলে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন; মনটা লিবারেল।

মেনে নেবেন না মা যুগটাকে? পাশের গ্রামেই তো এরকম একটা ঘটনা···

চিন্তাটা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই যেন তড়িৎগতিতে নিজেদের গ্রামের কথা মনে পড়ে গেল।—

ধরণী গতকাল যে কথাগুলা বলল, বেশ জোরের সঙ্গে বললেও বিশেষ নূতন কিছু বলেনি, কেননা ঐ ধরণের যুক্তি দেখিয়েই বীরেশও বিপাশার সঙ্গে আলোচনা করে। তবে, বৌদ্ধ আর বৈষ্ণব ধর্মে জাতিভেদ উচ্ছেদের কথায় এসে ব্রাহ্মধর্মের উল্লেখ ক'রে একটা মস্ত বড় উপকার করেছে। জাত-পাঁত পরিহারের এইটেই আধুনিকতম প্রচেষ্টা। বিপাশার সঙ্গে কথাবার্তায় এটা যে কি করে ছেড়ে যায়, আশ্চর্য বোধ হচ্ছে! অতি সন্নিকট ব'লেই কি—আলোর নীচেই অন্ধকারের মতো? ভুলে থাকাটা আরও আশ্চর্য বোধ হচ্ছে যে এই অঙ্গনাতেই ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি রয়েছেন এবং এক সময়—যতই সূক্ষ্মভাবে হোক, তাঁর প্রভাব তাদের কয়েক-

জনের ওপর এসে পড়েছিল। 'তাদের'—অর্থে ওদের স্কুলের ওপরের দিকের ছাত্রসমাজে।

প্রাপ্তির বিস্ময়ের সঙ্গে শ্রদ্ধাভরে মাথাটা আপনিই একটু নুয়ে গেল বীরেশের।

ওরা যখন সে-সময়ের সেকেণ্ড ক্লাসের মাঝামাঝি, পরের বছর ম্যাট্রিকুলেশন দেবে, অপরেশ লাহিড়ী ওদের হেডমাস্টার হয়ে এলেন। কিছু স্থূলাঙ্গ, গৌরকান্তি পুরুষ, মুখভরা কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফ, টানা-টানা চোখে প্রশান্ত দৃষ্টি। বেশ মনে পড়ছে—যেদিন স্কুলে এলেন—সে যেন আসা নয়, একটা আবির্ভাব। সমস্ত দিনই স্কুলে একটা চাপা সম্ভ্রম, তারপর অঙ্গনা হাই স্কুলের সেইটেই যেন স্থায়ী বাতাবরণ হয়ে রইল।

অপরেশ লাহিড়ী ছিলেন ব্রাহ্ম। দক্ষিণে চাংড়িপোতায় ছিল ব্রাহ্ম আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর বাড়ি। অপরেশ লাহিড়ী ঐ অঞ্চলের কোন গ্রাম থেকে আসেন। ঐ সময়ের অনেক শিক্ষিত লোকের ওপর ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব পড়ে; ধর্মান্তরিত না করেও। স্কুলের সেক্রেটারি অতীনবাবু ছিলেন এই ধরণের লোক। তিনিই অপরেশ লাহিড়ীকে নিয়ে আসেন।

মনে পড়ে যেতে বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত ওঁকে ঘিরে, ওঁর আসার কাহিনী, ওঁর ব্যক্তিত্ব ঘিরে মনটা পড়ে রইল বীরেশের। উনি কখনও নিজের ধর্ম আর সমাজের কথা কিছু বলতেন না। তাঁর সেই মৌনই ছিল প্রধান আকর্ষণ। হঠাৎ বহুদিন পরে তাঁর কথা মনে পড়ে গিয়ে বিপাশা আর মা থেকে স'রে গিয়ে তাঁরই ধ্যানের তৃপ্তির মধ্যে ডুবে রইল মন। তারপর আবার ফিরে এল বর্তমানে।

স্কুলে থাকতে বাড়ি যেতনা ওঁর—গার্জেনদের ভয়ে কোন ছাত্রই নয়। তবে বেরিয়ে আসার পর বার কয়েক গেছে। গুরু-শিষ্যের অন্য রূপ তখন। ওঁর একটা বৈশিষ্ট্য—প্রচারকের রূপ একেবারেই থাকেনা, তবে নিরুত্তাপ আলোচনায় আনন্দ পান। ব্রাহ্মসমাজের অনেক পুরনো কথা শোনা যায় ওঁর কাছে।

মনে হোল, ওঁর কাছে গেলে ওর এই সমস্যার ওপর খানিকটা আলো বোধ হয় এসে পড়তে পারে। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে নিজের সমস্যা আদৌ তোলা যায় না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্তমানে এই অসবর্ণ বিবাহের কথাটা তোলা ; এই যে একটা নূতন ঢেউ এসেছে। বহুদিন চাপা থেকে আবার একটা বিক্ষোভ—এবার তো ধর্মান্তরিত হয়ে নয়—নিজের ধর্মেই থেকে—সেই সনাতন ধর্ম—তাকেই গ্রন্থিমুক্ত ক'রে—তার মধ্যেই সম্প্রসারণ ঘটিয়ে···

সবই বাকি। এখনও কল্পনার মধ্যেই, তবু অনেক সমস্যাই যেন হাল্কা হয়ে গেছে—বাকি যেটুকু সেটুকুও হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে আলোচনায় মিটে যাবে। একটু শঙ্কা জেগে রইল, তিনি এখন কোথায় ? এদিকে নিজের হাঙ্গামে বহুদিন যেতে পারেনি। বিশেষ করে, বিপাশা আসার পর, কে জানে কেন, যেন পা-ও উঠত না যেতে—শুনেছিল শীঘ্র অবসর নিচ্ছেন কাজ থেকে।

আশঙ্কা যেমন আশাকে নষ্ট করে, আশা প্রবল হলে আশঙ্কাকেও আমল দিতে চায় না। বীরেশ ঠিক করল—যেখানেই থাকুন, ওঁকে বের করে নেওয়া শক্ত হবেনা। দূরে গিয়ে দেখা করায় বরং গুরু-শিষ্যের অন্তরঙ্গতার ভাবটা আরও ভালো করেই ফুটে উঠবে।

এই ক'দিনের মধ্যে আজকের মতো স্বস্তি কোনদিন অনুভব করেনি। হেডমাস্টারের কথায় মনটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল—একবার, না হয় গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসবে—কিম্বা কাল জগবন্ধুকে মুখুজ্জে মশায়ের কাছে চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে খোঁজ নেবে তাঁর সম্বন্ধে জানাতে ? ধরণীর আসাতে তিন চার দিন দেরি এখনও, কি কাজ আছে বলেছিল, বেড়ে যেতেও পারে।

শেষ পর্যন্ত মনটাকে শান্ত করে নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করাই স্থির করল, আসতে-না-আসতেই আবার হঠাৎ যাওয়া—মার সেই আতঙ্কপূর্ণ দৃষ্টি···

জগবন্ধুকে আর একবার চা ক'রে খাবারটা গরম করে নিয়ে

আসতে বলল। তৈরি হ'লে খাওয়া সেরে একটু ফাঁকায় ঘুরে আসার জন্যে বেরিয়ে পড়ল।

পরদিন রবিবার ছিল, সেটা ছুটির মধ্যে কাটিয়ে ধরণী চিত্রাকে নিয়ে ভোরে বেরিয়ে কলেজ-করার সময়েই এসে পড়ল। বলল, হাতের কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ও দু'দিন আগেই অঙ্গনাতে চ'লে আসে, যাওয়ার সময় সেইদিনই চিত্রা-মলয়কে নিয়ে বাড়ি চ'লে গিয়েছিল বলে। বাড়ির খবর ভালো। ও যে অঙ্গনাতেই ফিরে যাবে, আর বিয়েও করবে ব'লে আশ্বাস দিয়ে এসেছে, তার ফলে দু'জনকেই, বিশেষ করে দাক্ষ্যায়ণীকে বেশ প্রফুল্ল দেখল এবার। এরকম অনেকদিনই দেখেনি।

কলেজ যাওয়ার জন্যে তাড়াহুড়া ক'রে নেয়ে খেয়ে নেওয়ার মধ্যে যেটুকু কথা হোল।

বিকালে কলেজ থেকে ফিরে আসার পর চা-জলখাবারের টেবিলের সামনে ব'সে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার গল্প জুড়ে দিল। বাড়ির কথা নিয়েই। এবার চিত্রাও রয়েছে।

মুখুজ্জেমশাই একটু উঠে পড়ে লেগেছেন। মুনিষ খাটছে দেখে এল। দাক্ষ্যায়ণী অতটা পারেন না। তবে, যখন এল গৌরীদেবীকে দেখল নিজে দাঁড়িয়ে শিউলীকে দিয়ে পাশের বাগানে নারকেল গাছগুলা ঝাড়াচ্ছেন। মোটের ওপর, এদিকে কয়েকবার গিয়ে বাড়িতে যেমন একটা নিঝুম ভাব দেখত, সেটা যেন অনেকখানি গেছে এবার। অবশ্য ওরা দু'জনে আসার জন্যেও, বলতে পারা যায়···

চিত্রা যেন সুযোগ খুঁজছিল, এসে বলল—"আসল কথা কিন্তু দাদার বিয়ে করতে রাজি হওয়া।"

একটু মুখ টিপে হেসে ঘাড়টা ঘুরিয়ে নিল।

সুযোগ খুঁজছিল বীরেশও, জিভের সবচেয়ে আগে তো ঐ কথাই রয়েছে। তবে, সেইজন্যেই একটা কুণ্ঠাও।

"কিছু বলছিলেন নাকি মা তোকে?—নিরুৎসুকভাবেই প্রশ্নটা ক'রে ধরণীর দিকে চেয়ে বলল—"কথাটা দিয়ে ফেলে যেন ভাবনায় পড়া গেছে।"

চিত্রা বলল—"মা বলবেন কেন, তবে বুঝতেই তো পারা যায়।…"

আর, হোলই বৈকি কথা। কি নিয়ে যে উঠল, বিয়ের কথাটা। মা বললেন—"যখন হয়েছে সুমতি, একটি ভালো মেয়ে দেখে, তাড়াতাড়ি এবার দু'হাত এক ক'রে দাও। তাইতে বড়মাসি বললেন—'না বাপু, রাজি যে হয়েছেন ছেলে, এই আমার ভাগ্যি—আমার পছন্দ মনে ধরবে কিনা, নিজে দেখেশুনেই করুকগে, আপত্তি করব না আমরা। আজকাল বাপ-মায়ের কথা শুনছেই বা কে?' একটি সৎবংশের মেয়ে হলেই হোল।…"

বার দুয়েক বীরেশ-ধরণীর দৃষ্টি-বিনিময় হ'য়ে গেল।

চিত্রা বাঁ হাতের একটা আঙুলে আঁচল জড়াতে জড়াতে কখনও চোখ নামিয়ে কখনও চোখ তুলে ব'লে যাচ্ছিল, একবার ঠোঁটে একটু হাসি নিয়ে সেকেণ্ড দু'তিন থেমে গিয়ে নতদৃষ্টি থেকেই বলল—"আমার মনে হোল, এই তালে বিপুর নামটা ঢুকিয়ে দিই।"

—সঙ্গে সঙ্গেই চোখ তুলে হেসে ফেলে, একটু চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতেই বলল—"কেন, দোষটা কি হয়েছে? আজকাল এরকম তো কত হচ্ছে।"

বীরেশ হঠাৎ একেবারে এতখানিতে হকচকিয়ে গেছে, ধরণী একবার অপাঙ্গে তার দিকে চেয়ে নিয়ে লঘুভাবেই প্রশ্ন করল—"তা, বললিনে কেন?"

চিত্রা সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠে বলল—"রক্ষে করো। বড় মাসিকে? সঙ্গে সঙ্গে হার্টফেল ক'রে যেতেন। সে বরং মাকে বলা যায়; তবু কিছুটা…মডার্ণও, বা, যা বলো। বড়মাসি—বাবাঃ!"

যুক্ত কর কপালে তুলে বলল—"বাড়ি ঢোকাই বন্ধ হবে আমার।"

প্রসঙ্গটা একটু ধরে রাখবারই ইচ্ছা, বাইরে বাইরে কৌতুকের ভাবটা বজায় রেখে হাসতে হাসতেই বলল ধরণী—"বেশ তো, না হয় তাঁকেই বলতে। অমন সুন্দর মেয়ে, তোর বন্ধু, বংশ, পরিবার, শিক্ষা—চারিদিক দিয়েই এত· ·কি যে বলে, তোমাদের নভেলের ভাষায়, এত 'বাঞ্ছনীয়' বিপাশা···"

মনের একটা গোপন ইচ্ছা হয়তো। সেটা এভাবে এতখানি প্রকাশ ক'রে ফেলে ভেতরে ভেতরে অস্বস্তিই বোধ করছিল চিত্রা। "আঃ, তুমি চুপ করতো!"— ব'লে ওকে থামিয়ে বলল—"বিপাশা, বিপু ক'রে পাগল হয়ে গেল নাকি লোকটা!···ভাগ্যিস আমায় আগে থাকতে ওঁরা ওর গলায় লট্‌কে দিয়েছিলেন!"

বীরেশকে সাক্ষী মেনে বলা। ধরণীও তার দিকে চেয়েই হাসতে হাসতে বলল—"তা তো বটেই। নৈলে যা আধুনিক দৃষ্টির মেয়ে ওঁদের, নিজে হতেই কার গলায় যে লটকে পড়ত!"

বেশ একটু হাসি পড়ে গেল।

প্রসঙ্গটা মনের অনুকূল হলেও একটু অস্বস্তিই বোধ করছিল বীরেশ। "থাক, থাক, হয়েছে।"—হাসতে হাসতে যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এই ভাবে, আর একটা প্রশ্ন যে জিভের ডগায় জেগেছিল, সেটা এনে ফেলল। গম্ভীর হয়ে গিয়েই বলল—"অনেক দিন হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা করা হয়নি রে ধীরু। এবারও হোল না। ভাবছি, এবার যখন যাব·· আবার শুনেছি, তিনি নাকি রিটায়ারও ক'রে গেছেন।"

ধরণী জানাল—অপরেশ লাহিড়ী প্রায় মাস ছয়-সাত হোল রিটায়ার করে, ওঁর বন্ধু, স্কুলের সেক্রেটারী অতীনবাবুর চাপাচাপিতে অঙ্গনাতেই বাড়ি ক'রে রয়েছেন। ঠিক বাড়ি করা নয়, রায়চৌধুরীরা তাদের বাগানবাড়িটা বেচে দিচ্ছিল, সেটা কিনে নিয়েছেন। এবার একদিন গিয়েছিল ধরণী। খুব খুশী। বীরেশের কথাও জিজ্ঞেস করলেন, সে এখন কোথায়, কি করছে। বললেন এলে যেন নিশ্চয় দেখা করে।

সব বলে বলল—"বেশ মনে করিয়ে দিয়েছিস। যাস নিশ্চয়, একটা মানুষের মতো মানুষ অঙ্গনায় বাড়ি করলেন। অতীনবাবু খুব ভালো কাজ করলেন একটা।"

নয়

হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যনা, বিশেষ কোন প্রয়োজনের অভাবেই। ধরণীকে স্পষ্ট ক'রে বললনা বীরেশ। বুঝে নেয় তো নিক, ক্ষতি নেই। দরকার হলে পরে বললেও চলবে। বরং এই এসে আবার তাড়াহুড়ো ক'রে যাওয়াটা একটু বিসদৃশ লাগে ব'লে দিন কয়েক দেরিই করল। তিনজনে মিলে যে আলোচনা হোল তাতে মনটাকে ভেতরের অভীপ্সার খুব কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে একটা কুণ্ঠাই এনে দিয়েছে।

ভালোবাসার একটা নিবিড় একান্ত প্রদেশ আছে যেখানে সুখেই হোক, বা বেদনাতেই হোক, কেউ সঙ্গী ডেকে নিতে চায় না। বিপাশার চিঠির যে চরম আঘাত, তারও কথা ধরণীকে বলেনি বীরেশ।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে কলোনীতে আড্ডাগাড়া—প্রেস, কাগজ বের করলে, গোড়ায় গোড়ায় তা নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে কিছু ঘোরাঘুরি করেছিল। যদিও, যেমন ওর স্বভাব, খুব তদগত হ'য়ে নয়। মাঝপথে বাবা মারা যেতে, আরও নানা কারণে ঢিলেমি এসে পড়ে; শেষে বিপাশা এসে সেই সমস্ত মনটাকে অধিকার ক'রে বসল। এবার অঙ্গনায় গিয়ে যে একটা বড় পরিবর্তন এল ওর জীবনে—মাকে কথা দিয়ে আসা অঙ্গনায় ফিরে আসবে, বিবাহ করবে, তার মধ্যেও বিপাশা থেকে গিয়ে এমন একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছে যে, কিছুতেই আর মন বসাতে পারছে না। তবু, ক'দিন এদিক-ওদিক-ক'রে কাটাল। তারপর, বাড়ি-বাগানের কতদূর কি হ'ল একবার দেখে আসতে দিন ছয়েক পরে চলে গেল।

ট্যাক্সি পেতে দেরি হয়েছিল, গ্রামে পৌঁছতে প্রায় দশটা হয়ে গেল। স্কুলে যেতে সদর-রাস্তার খানিকটা পড়ে, সুচিত্রা আর তার সঙ্গিনী গঙ্গাকে আসতে দেখে তুলে নিল বীরেশ। এমন আশ্চর্য ঘটনা সুচিত্রার জীবনে কখনও ঘটেছে কিনা মনে পড়ে না। চুপ করেই বসে থেকে অল্প কথায় বীরেশের প্রশ্নের উত্তর দিল, তারপর পৌঁছেই একটি নাটকীয় সীন্! ট্যাক্সি থেকে নেমেই ঘুরে হাত তুলে বলল—"তোমরা এখন আসবে না!"

কেউ কিছু বোঝবার আগে ছুটে গিয়ে উঠানে ঢুকতে না ঢুকতেই চেঁচিয়ে উঠল—"মা, বড়মাসি, কে এসেছে বলতো?"

ওরা আসতে আসতে এঁরা দু'জনে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন, বীরেশ পায়ের ধূলা নিয়ে হেসে বলল—"সুচুর পাগলামি যাবেনা মাসিমা। হাত তুলে বারণই ক'রে দিল আসতে।...আগে খবর দিতে হবে যে।"

সুচিত্রা দাক্ষ্যায়ণীর কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ-উৎফুল্লতায় একটু জড়সড় হয়েই। উনি স্নেহভরে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—"মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। চিরকাল ভালো খবরই দিয়ে যাক এমনি ক'রে।—তা তুই এত শীগগির এলি যে?"

গৌরী বললেন—"আসুক বাপু, আর খুঁজে কাজ নেই। বাড়ি আসা তো ছেড়েই গেছে ছেলের।...ভেতরে আয়, দাঁড়িয়ে আছিস।"

"আসতে হোল যে!"...মলয়ও কোথায় ছিল, এসে গৌরীর কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে, তাকে কোলে তুলে নিয়ে ভেতরে আসতে আসতে শুরু করল বীরেশ। বলল—"ধীরু গিয়ে বললে, মাসিমা আহার-নিদ্রা ভুলে নারকেল পাড়াতে লেগে গেছেন। ভাবলাম—মুখ ফসকে ব'লে ফেলেছিলাম, তাই শুনে বিয়ের নাড়ু পাকাতে শুরু ক'রে দেননি তো? দেখেই আসি।"

—হেসে ফেলল।

গৌরী বললেন—"হোক সুমতি। নারকেল গাছ আমি ফরসা ক'রে দেবনা ?"

সেবারের বাড়ি আসা, আর এবারের! মনে হয় যেন, যা হয়ে গেছে ধুয়ে মুছে যাক ; সব ছেড়ে ছুড়ে এই স্নিগ্ধতার মধ্যে এসে বসি। একটু চঞ্চলতা মনে নিয়েই বেরিয়েছিল বীরেশ, এসেই দেখা করতে বেরিয়ে যাবে হেডমাস্টারের সঙ্গে ; সেদিকটায় আর গেলই না শেষ পর্যন্ত। মাছ ধরানো, গল্পস্বল্প, সুচিত্রাদের খেলাঘর—এইসব নিয়ে সকাল-দুপুর কাটিয়ে, বিকালে ওদের নিয়ে খানিকটা বাগান আর দিঘির ঘাটে ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যার একটু আগে গিয়ে পুকুর ঘাটে বসল। একাই। কিছু দূরে দু'চারজন প্রতিবেশী বন্ধু আছে, এলে যায়, বা, খবর পাঠিয়ে দেয়, তারা আসে, আজ আর জানাল না। দু' একটি ক'রে বকুল ফুল ঝরে পড়ছে, কুড়িয়ে নিল ; কাজল-দিঘির এক কোণে, এই দিকেই এক ঝাঁক রক্ত কহ্লার ফুটে আছে, ভাঙা মেঘের মধ্যে দিয়ে অস্তগামী সূর্যের কিরণ প'ড়ে একটা অপার্থিব মোহ বিস্তার করেছে সমস্ত পরিবেশটুকুর ওপর। বড় ভালো লাগছে। চুপ করে সানের বেঞ্চের ওপর পিঠ রেখে বসে রইল বীরেশ। আজ রাস্তায় সুচুদের তুলে নেওয়া থেকে এখন পর্যন্ত যে নিবিড় তৃপ্তিটুকু সঞ্চয় হোল, সন্ধ্যার এই নিথর শান্ত ছবি তার ওপর একটা অদ্ভুত সুষমা এনে দিয়েছে। কোন শিল্পীর যেন শেষ তুলির টান। চুপ করে বসে রইল।

সূর্য ডুবে গেল। ধীরে ধীরে সমস্ত চিত্রটির ওপর ছায়া নেমে আসার সঙ্গে সমস্ত দিনের সেই তৃপ্তি, সেই প্রফুল্লতার ওপরেও কখন, কোন পথে একটা হালকা যবনিকা নেমে এল।

এই সমস্তটুকুর সঙ্গে, যা হয়ে গেল তার সামঞ্জস্য ঘটানো যায় না? অঙ্গনার সঙ্গে কলোনীর ; বিপাশার সঙ্গে মা-মাসি-সুচিত্রা-মলয়, আরও সকলকে নিয়ে ওদেরই সংসারের ? অন্ধকার ঘন হওয়ার সঙ্গে কাজল-দিঘির ধারে ঝিল্লির একটানা রব জেগে ওঠার সঙ্গে মনটা

আইঢাই করে উঠল বীরেশের। তার জীবনে বিপাশা নেই—এই বিরাট শূন্যতা থেকে মনটা কোন মতেই সরিয়ে আনতে পারছে না।

এক সময়, বাইরের অন্ধকারের সঙ্গে মনের অন্ধকার যখন এক হয়ে গেছে, একটা সর্বহারার দুঃস্বপ্ন থেকেই জেগে উঠলো বীরেশ। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। মনে পড়ল, বাইরে-ভেতরে সামঞ্জস্য ঘটানোর জন্যেই তো এবার আসা তার অঙ্গনায়।

পরদিন সকালে একে একে জন তিনেক দেখা করতে আসায় হয়ে উঠল না, বিকালের দিকে রোদ পড়ে আসতে বেরিয়ে পড়ল বীরেশ।

'বাগানবাড়ি' বলতে সাধারণত যা বোঝায়—বড়লোকদের প্রমোদভবন—রায়চৌধুরীদের বাগানবাড়ি সে ধরণের কিছু নয়। পশুপতি রায়চৌধুরী ছিলেন একটু নিভৃতচারী লোক, অনেকের ধারণা সেকালের অনেক শিক্ষিত লোকের মতো তাঁর ওপর ব্রাহ্মধর্মের কিছু প্রভাব পড়েছিল। নিভৃত চিন্তা ও পঠনাদির জন্য গ্রামের একটু বাইরে, বসতবাড়ি থেকে পোয়াটাকের মধ্যে বাড়িটি করান। পাশাপাশি দুটি ঘর, চারিদিকে ফল-ফুলের বাগান। সামনে একটি পুষ্করিণী, একটি বাঁধানো ঘাট। মাঝে মাঝে গিয়ে থাকতেন। অপরেশ লাহিড়ী কিনে নিয়ে ঘর বাড়িয়ে, সামনে টালির বারান্দা দিয়ে রদবদল ক'রে নিয়েছেন। পরিবারটি বড়। তবে, চাকরি আর শিক্ষা উপলক্ষে প্রায় সবাই বাইরে। বাড়িতে এখন স্বামী-স্ত্রী ওঁরা দুজনে, একটি মেয়ে, স্কুলে ম্যাট্রিক পড়ছে, একটি এগারো-বারো বছরের নাতি। সেও স্কুলেই নীচের দিকেই পড়ে। পরিচিতই সবাই এ বাড়ির। ও যখন পৌঁছালো, দু'জনে স্কুল ফেরৎ রাস্তার ফটক খুলে বাড়ি ঢুকছে, বীরেশ ওদের সঙ্গে উঠল গিয়ে বারান্দায়। অপরেশ ভেতরের দিকে ছিলেন, ওরা গিয়ে খবর দিতে বেরিয়ে এলেন। খুবই উৎফুল্ল। "তুমি! এসো, এসো"—ব'লে দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন। বীরেশ গিয়ে প্রণাম ক'রে উঠতে বললেন—"ধরণীকে ব'লে দিয়েছিলাম এলে দেখা করো। বেশ ভালো হোল।

আজ আমার ডান চোখটা নাচছিলও—ভাবছিলামই, নিশ্চয় কিছু একটা ভালো না হয়ে যায় না। এসো, বোস।"

বারান্দার মাঝখানে একটা টেবিল রেখে গুটি চার চেয়ার পাতা। উনি একটায় বসলে বীরেশ সামনেরটায় বসে সলজ্জ হাসির সঙ্গে বলল, কতকটা কথা শুরু করার জন্যেই—"স্যার, আপনিও আমাদের কুসংস্কারগুলো নেবেন ?"

"সে কি ! এতই ইমপারভিয়াস (Impervious), এতই নিরেট যে আট ন' বছর একসঙ্গে কাটিয়ে···আর, তা যদি বললে তো মিথ্যা কুসংস্কারই বা কোথায় ? এই তো তুমি এসে গেলে। না মেনে উপায় আছে ? তাহলে তোমার এসে পড়ার সত্যটাও তো না মানতে হয়।"

দাড়িসুদ্ধ হাত বুকের ওপর টেনে দিয়ে হেসে উঠলেন। প্রসন্নতায় টানাটানা চোখ দুটি আয়ত হয়ে উঠেছে।

স্ত্রী এসে উপস্থিত হলেন। শ্যামবর্ণা, একটু স্থূল শরীর। কপালে সিঁদূরের টিপ, পরনে চওড়া লালপেড়ে শাড়ি, পায়ে একজোড়া হালকা চটি, সামনে কাটা, তার মধ্যে দিয়ে আঙুলের আলতা দেখা যাচ্ছে। পায়ের অপর অংশে আলতা নেই। বীরেশ উঠে প্রণাম করতে 'দীর্ঘজীবী হও' বলে আশীবাদ করে একটা চেয়ারে ব'সে বললেন—"তুমি এবার অনেক দিন পরে এলে বাবা। সেই কথা ওঁকে বলছিলাম—বীরুর অত টান ছিল তোমার ওপর, আস্তে আস্তে যেন ক'মে আসছে।"

"না মা, ও কথা বলবেন না।"—বীরেশ উত্তর করল—"চিত্রাটাকে কলেজে দিলাম, ধরণী একলা পড়ে যাবে, তাই থাকা। ও আই-এটা পাস করলেই ছাড়িয়ে নিয়ে···"

"কেন, আর পড়াবে না ?"

একটু যেন আপত্তির টোনে প্রশ্ন করলেন উনি।

"···আর···আমাদের ঘরে ··"

একটু টেনে টেনে বলছিল বীরেশ, অপরেশ বললেন—"বাঃ, আমি এমন ক'রে তোমাদের "কু"-টা পর্যন্ত নিচ্ছি, আর তুমি আমাদের "সু"টুকু পর্যন্ত নেবেনা ?···শুনবে গো ?—আজ ডানচোখ নাচছিল, একটা ভালো কিছু হবে, বীরেশ এসেও গেল। অথচ বলে—ওদের একটা কুসংস্কার নিয়েছি আমি !"

"না বাপু, ফলে, তোমরা স্বীকার করো চাই, না করো। এই সেদিন···"

"তা আমায় শুদ্ধু টানছ কেন ? আমি তো মানছিই ; তুমিই তো···"

—আবার সেইভাবে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন—"ওকে বলো। যার মানবার কথা, অথচ প্রশ্ন তুলেছে।"

গল্প চলল এইভাবে। অপরেশ লাহিড়ীর দুটি রূপ ব'লে একটা কথা ছিল, স্কুলে একরকম ; গম্ভীর, অল্পভাষী ; বাড়িতে এসে একটু রহস্যপ্রিয় আর হাস্যপ্রবণ। এবার এসে অনেকখানি পরিবর্তন দেখছে বীরেশ। হাসির দিকটা অনেক বেড়েছে, অল্পভাষী আদৌ নয়, আরম্ভ করলে হাসি-রহস্যের সঙ্গে অনেকখানি টেনে নিয়ে যান। এর সঙ্গে কেশ-দাড়ির শুভ্রতা আরও বেড়ে গিয়ে, রিটায়ার করার পর খানিকটা স্থূলতরও হয়ে যেন আর এক মানুষ হয়ে উঠেছেন। বড় ভালো লাগছে।

অনেকক্ষণ ধরে গল্প হোল, এই ভাবেরই মুক্ত আবহাওয়ার মধ্যে। যেন ভিতরের আনন্দটুকু ধরে রাখতে না পেরে বীরেশ বলল—"আপনি এখানে থেকে গেলেন, বাড়ি কিনেছেন, ধরণীর কাছে শুনে কি আনন্দ যে হোল স্যার !"

"তুমি এই বলছ, আর ওদিকে ভাবো, স্কুল ছিল, একরকম ছিল, বেম্মদত্যিটা আবার ঘাড়ে চেপে বসতে চায় যে !"—হেসে উঠলেন। বললেন—"তা আমি কি করব ? অতীন-রোজা যে বেলগাছে বেঁধে রাখলে, এখন যেতে চাইলেও ছাড়েনা।"

হাসি চলেছে। গৃহিণী মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন ; হাসি নিয়েই ; বীরেশ

সলজ্জ মুখ নত ক'রে নিয়েছে, উনি হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে পড়েই বললেন—"না হে, অবিচার করা হচ্ছে, অঙ্গনা আমায় ভালোভাবেই নিয়েছে, আপন ক্ল'বেই বলা যায়। বরং যখন হেডমাস্টার,—ছেলে মানুষ করা নিয়ে সম্বন্ধ, তখন কতকটা এলুফনেসের (aloofness) ভাব ছিল, নিজেও মাঝে মাঝে ফীল (feel) করতাম। কিন্তু এখন, যখন একেবারেই কোন কাজে আসছিনা…"

"কী বলছেন স্যার? আপনার থাকটাই যে কতবড় একটা ভাগ্যি!"—মুখ তুলে মন্তব্য করল বীরেশ।

"সত্যি না হলেও কথাটা শুনতে বড় মিষ্টি বীরেশ।"—মৃদু হাসির সঙ্গে উত্তর করলেন উনি; বললেন—"যা বলছিলাম—অঙ্গনা আমাদের বেশ ভালোভাবেই টেনে নিয়েছে। নেমন্তন্নর কথাই ধরা যাক্, সবচেয়ে বড় সামাজিক ব্যাপার। আগেও পেয়ে এসেছি। কিন্তু সে যেন নিতান্ত ফরম্যাল (formal)—গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার; সে তো নিতান্ত 'কেউ-কেটা' নয়, সেই হিসাবে। তাও সব কাজে; সর্বত্র নয়। ফীল করতাম, অনেক জায়গায় এ্যাভয়ড্ই (avoid) করতাম। বাড়ি করার পর এখন বলতে গেলে কোন কাজই বাদ যায় না। বড় ভালো লাগল বীরেশ, এই কয়েকদিন আগে একটা ব্যাপারে।…একটা কুণ্ঠা নিজের দিকে স্বীকার করতেই হয়—নেমন্তন্ন হলে আমি নিজেই যাই। একলাই, হদ্দ মেয়ে আর নাতিটিকে নিয়ে গেলাম। উনি এক অতীনের বাড়ি ছাড়া কোথাও যাননা। সেদিন সনাতন বোসের মেয়ের বিয়েতে আমাদের সঙ্গে ওঁকে না দেখে উনি এমন দুঃখ করতে লাগলেন যে উপায় না দেখে অসুস্থতার মিথ্যাই রচনা করতে হোল…তুমি হয়তো বলবে, সামাজিক মিথ্যা, অবস্থাগতিকে…"

একটা বেয়ারা গোছের লোক, পরিচ্ছন্ন কাপড় চোপড়, ট্রেতে ক'রে টোস্ট বিস্কুট আর চায়ের সরঞ্জাম এনে টেবিলে রেখে গেল। গৃহিণী প্রস্তুত করতে উঠলে উনি বললেন—"বাঃ, বীরেশ এতদিন পরে এল…"

"তার ব্যবস্থা ব'লে এসেছি"—গৃহিণী হেঁট মুখে চা প্রস্তুত করতে করতে বললেন। বীরেশের পানে চেয়ে বললেন—"তুমি আজ এখানেই খেয়ে যাবে বাবা। আমাদের নূতন বাড়িতে প্রথম এলে।"

"আমি তো বলে আসিনি মা।"—নিতান্ত একটু করতে হয় বলেই আপত্তি করল বীরেশ। উনি বললেন—"সে আমি বলে পাঠাচ্ছি।"

চায়ের সঙ্গে খানিকটা গল্প হোল। শেষ হ'লে বললেন—"তোমরা ততক্ষণ গল্পসল্প করো, আমি একটু ওদিকটা দেখিগে। লোকটাকে নোতুন রাখা হয়েছে···"

"আমার তো রান্নাঘরের প্রলোভন দেখাবার উপায় নেই, চলো বীরেশ, বাগান করছি, তোমায় দেখাই গে"—হেসে বলার সঙ্গে সঙ্গে অপরেশও উঠে পড়লেন। বারান্দা থেকে নেমে দু'জনে বাগানের দিকে চললেন।

বাড়ির সামনে আর দু'পাশে ফুলের বাগান; গোলাপ, মল্লিকা, জুঁই, চামেলী, আরও অনেক রকম দেশী ফুল। একটা লোক মরশুমী ফুলের জায়গা তৈরি করছে, কয়েকটা বেড়ে চারাও বসানো হয়েছে। বাড়ির পেছন দিকটায় তরিতরকারির বাগান। রাস্তা করে, মাঝে মাঝে ঘাস-জমি ছেড়ে বেশ ভালো ক'রে বাগানটা করা হয়েছে। পরিচয় দিতে দিতে এ-দিকটা সেরে, পুকুরের দিকটায় নিয়ে এলেন বীরেশকে। পুকুরের ধারে ধারে ফলের বাগান। মাঝখান দিয়ে চারিদিকে একটা রাস্তা চলে গেছে। সেইটে ধরে ওঁরা ওপারে চলে গেলেন। পরিচয় দিতে দিতে, কোন্‌টা কোথাকার নামকরা লিচু, কোথাকার আম, কোথাকার পেয়ারা, গোলাপজাম।

বড় ভালো লাগছে। আসাটা যে এত ভালো হবে, এত সফল, ভাবতেও পারেনি। শুধু একটু অস্বস্তি, যার জন্যে আসা, সেটা এসবের মধ্যে কিভাবে তুলবে তার জো খুঁজে পাচ্ছে না। অপ্রাসঙ্গিক ভাবে তোলা চলবে না, নিজেকেও একেবারেই আড়ালে রাখতে হবে। ···না হয় আজ ছেড়েই দেবে অন্য দিনের জন্যে?

এটুকুও বেশ আপনিই এসে গেল শেষ পর্যন্ত।

ওপারে, এদিকের ঘাটের সামনাসামনি একটা সিমেণ্টের চৌকো চাতাল, আট-দশ জন বসতে পারে, এইরকম। ঘুরে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন উনি। বললেন—"এবার এসো একটু বসা যাক্, অনেকখানি ঘোরা হোল আজ।"

উঠে মুখোমুখি হ'য়ে বসলেন দু'জনে। হেসে বললেন—"রিটায়ার ক'রে আমায় আরামের ব্যারাম ধরেছে—আই হ্যাভ পুট অন্ ওয়েট (I have put on weight)···ভাবি···"

পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বললেন—"যাক, ভেবে ফল নেই।··· তুমি এসেছ, বড় ভালো হয়েছে, অনেক কথা বলবার আছে তোমায়। একটা কথা আরম্ভই হয়েছিল, বাধা পড়ে গেল।"

"কি কথা স্যার?"—একটু উৎসুকই হ'য়ে উঠল বীরেশ।

"ঐ যে, যুগটার অদ্ভুত পরিবর্তন; যার জন্যে আমাদের আপন করে নিতে অঙ্গনার এতটুকু দেরি হোল না। তুমি শরৎবাবুর সেই উপন্যাসটা পড়েছ তো, 'পরিণীতা' বলে?—কিরকম সমস্যা? কিরকম মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া!"

ভেতরে বুকটা ধড়াস-ধড়াস করছে বীরেশের, প্রসঙ্গটা চালু রাখবার জন্যেই বিশেষ ক'রে বলল—"যুগ কিন্তু বদলে গেছে। তবে অঙ্গনার ক্ষেত্রে এটুকু আপনি বলেই স্যার। সাজিয়ে বলছি মনে করবেন না—চরিত্র পূজা এটা।"

"মোটেই নয় বীরেশ। রাগ কোর না, রাগ করার কথা নয়; আমিও যুক্তি হিসাবেই বলছি। একটা সময় ছিল যখন বড় চরিত্রবান পুরুষেরা জনসাধারণের কাছে—অবশ্য হিন্দু জনসাধারণের কাছে প্রচুর অবজ্ঞাই পেয়ে গেছেন, অপমানিত হয়ে গেছেন বললে ভুল হয় না···"

বীরেশ মাথাটা নীচু করে নিল।

"লজ্জিত হওয়ার দরকার নেই তোমার"—উনি ব'লে চললেন—"সব ব্যাপারেই পাইওনিয়ারদের (Pioneer) জীবন এইরকম;

এটাও স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে। পাইওনিয়াররা দমকা হাওয়া, দমকা হাওয়ায় অনেক ধূলি-আবর্জনা উড়িয়ে দিয়ে, শুকনো পাতা, ঘুণধরা ডাল উড়িয়ে ভেঙে ব'য়ে যায়—তাতে সবুজ পাতা কচিডালও কিছু কিছু যায় অবশ্য, উপায় নেই, তবে নবীনের পথ পরিষ্কার হয়। অথচ, দমকা হাওয়াটাকে কেউ বরদাস্ত করতে পারেনা। তারা এটা মানতে চায় না যে, এটাও হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই, বায়ুমণ্ডলের শ্বাসরুদ্ধ করা গুমটই শেষ পর্যন্ত ডেকে আনে এই ঝঞ্ঝাটাকে।···যাক্, মাস্টারি মেটাফোর (metaphor) হয়ে যাচ্ছে।"

—হেসে কথাটুকু ব'লে আবার গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে আরম্ভ করলেন "কিন্তু এ-আতঙ্ক, এ বিরুদ্ধতা কোনটাই থাকেনা, সুতরাং এ অবজ্ঞা, এই দূরে ঠেলে রাখার ভাবও নয়। সব স'য়ে যায়। কেননা দমকা হাওয়ায় কল্যাণই এনে দেয় শেষ পর্যন্ত। ব্রাহ্ম-বনাম হিন্দু সমাজ নিয়েও তাই হয়েছে। অবশ্য, এই রাখিবন্ধনে যুগের একটা বড় ভূমিকা রয়েছেই।"

বীরেশ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইতে বললেন—"যুগ—যেটা আজ আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দুটো বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে—তাকে কলিই বল, বা কনিষ্কই বল—অনেক কিছু ধ্বংস ক'রে একটা বিরাট নবসৃষ্টির জন্যে প্রস্তুত ক'রে দিচ্ছে জগৎ সংসার। Time আর space-এর দূরত্ব নেই, সুতরাং মনের দূরত্ব, মানুষে-মানুষে সম্বন্ধের দূরত্ব আজ যাওয়ার পথে—বর্ণ নিয়ে, ধর্ম নিয়ে, পরিচ্ছদ নিয়ে, আচার-ব্যবহার নিয়ে। তুমি বুঝবে, সুতরাং বাগ্‌বিস্তার না ক'রে আমি গুটিয়ে এনে নিজেদের কথাই বলি।···আচ্ছা বলতো, পরমহংসদেব যে সর্বকর্ম সমন্বয়ের কথা বললেন, তা কি মূলে এই জিনিসই নয়? আর বলোতো, আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন হলেও—অর্থাৎ ডিটেলে (Detail) একটু এদিক ওদিক—রাজা রামমোহনের মূল বক্তব্যের সঙ্গে তার প্রভেদটা কোথায়?"

দৃষ্টি আকাশের দিকে তুলে দিলেন। বীরেশ বলল—"তবু তো স্যার, ভেদাভেদ নিয়ে পড়েই রয়েছি আমরা।"

উনি যে ভাবের ঘোরে পড়ে গেছেন তারই স্পর্শ লেগে একটু আবেগ, অনুতাপের স্বরে কথাটা বলল বীরেশ। তবে, বোধহয় ভালো করে কানে যায়নি, একটু একভাবে চেয়ে থেকে দৃষ্টি নামিয়ে বললেন—"কি যেন ভেদাভেদের কথা বললে তুমি?"

হঠাৎ স্বীয় উদ্দেশ্যের এত কাছাকছি এসে পড়েছে যে, বীরেশের মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়েই পড়েছিল হিন্দু সমাজে বিবাহে ভেদাভেদের কথাটা; কুণ্ঠাবশেই ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"বলছিলাম, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে এখনও যে বিবাহে এত অন্তরায়, তারই বিষয় বলছিলাম স্যার।"

কথাটা কিন্তু মনের মতো হয়ে এসেই পড়ল। উনি একটু হাসলেন, বললেন—"আবার একটা মাস্টারি উপমাই এসে পড়ল বীরেশ, অভ্যাসের দোষই বলতে পার। গোড়ায় প্রথমভাগেরই আসর, সাদামাটা স্বর আর ব্যঞ্জন বর্ণের গাঁটছড়া; তারপর—অনেক পরেই, বঙ্কিম শরতের উপন্যাস। প্রথমে নিজেদের মধ্যে দেয়াল ভেঙে এক হওয়া, তারপর, তোমার ইণ্টারন্যাশনাল (international), আন্তর্জাতিক সমাজ গঠন করে পৃথিবীটাকে অভিন্ন—এক পরিবার ক'রে ফেলা।···মনে হয়—স্বপ্ন, আকাশকুসুম, ইউটোপিয়া (utopia) ···কিন্তু সত্য হয়ে উঠতেই বা কতক্ষণ?—অনন্ত কালের মধ্যে এমনি কয়েকটা যুগের ঢেউ···"

আরও অন্তর্লীন হয়ে সূর্যাস্তের দিকে চেয়ে রইলেন। ক্লাসেও কখনও কখনও উঁচু ভাবের কিছু পড়াতে গিয়ে দূর-নিকটের সম্ভব-অসম্ভবের সন্ধির কথা বলতে গিয়ে এই রকম হয়ে যেতেন। ক্লাসটা স্তব্ধ হয়ে গিয়ে প্রতীক্ষা করত বিশেষ একটা কিছু শোনবার জন্যে।

এবার অনেকক্ষণই একভাবে থেকে দৃষ্টি নামিয়ে ওর মুখের পানে চেয়ে বললেন—"বীরেশ, অতি সামান্য আমি, তবু তিনি আমায় দিয়ে এই মহাসমন্বয়ে একটু কাজ করিয়ে নিয়েছেন—সেও সামান্যই—একটা বিরাট অট্টালিকার বনেদে একটা ইঁট গেঁথে দেওয়া, তবু···"

বীরেশ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

"আমি ব্রাহ্ম এই সোজা পথে নয়, ধর্মের আকর্ষণে নয়, যাতে ছিলাম তাই বা এমন খারাপ কি? আমি ব্রাহ্মধর্মে প্রবেশ করি উল্টো পথে। তুমি কি মনে করবে জানিনা, একমাত্র অতীন সে কথা জানে। সংক্ষেপে বলি আজ তোমায়।

আমি যখন বি.এ. পড়ছি, ফোর্থ ইয়ার ক্লাসে, একটি মেয়ে এসে আমাদের কলেজে আই.এ. ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হোল। সে যুগে মেয়ে, যারা পড়তে চায়, বেথুনে যায়, নয়তো ছেড়েই দেয় পড়া। ছেলেদের কলেজে মেয়ে, বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল। তারপর জানা গেল ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে। কৌতূহল খানিকটা নিবৃত্ত হোল; ব্রাহ্ম, ওরা 'ধিঙ্গি' হয়ই খানিকটা।

মেয়েটি 'ধিঙ্গি' কিন্তু মোটেই নয়। ক্লাসের একধারে আলাদা সীট। সেইখানে স্থিরভাবে ব'সে থাকত। ক্লাস হ'য়ে গেলে বাড়ি চলে যেত। কাছেই একটা গলিতে বাড়ি। পরিবারটি ব্রাহ্ম হলেও গরীব। আমার ওপর প্রভাবটা পড়ল অন্যরকম। আকাশে-বাতাসে ব্রাহ্মধর্মের তখন জোর আলোড়ন, কিন্তু ওতে মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগলেও আমায় বিশেষ স্পর্শ করেনি। আলোড়নটা দেখে যেতাম মাত্র; সেও একটা নূতনত্ব, কতকটা তামাসা হিসেবে।

রোমান্স নয় মোটেই বীরেশ, রোমান্স জাগাবার ক্ষমতা তোমার গুরুপত্নীর এমন যে বিশেষ কিছু ছিলনা সেটা বুঝে নেওয়া যায়। তবু, যেটুকু ছিল সেটা এল এডমিরেশনের (admiration) মধ্যে দিয়ে—তাঁর প্রতিই প্রথমটা, তাই থেকে ধর্মটার ওপরও। সেখানেও সমাজের এই মুক্তি, এই স্যাঙ্কশন (sanction) না থাকলে তো এই মেয়েটির সব আশা-আকাঙ্খা মনের মধ্যেই বিলীন হয়ে যেত। তোমার গুরুপত্নী আর সব দিকেই সাধারণ হ'লেও বেশ তীক্ষ্ণধীই ছিলেন। আমাদের সমাজ-বিধানে এরকম কত ট্যালেণ্ট (talent) যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—এই অনুতাপই আমায় ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট করল। তারপর

ইন্টারেস্টেড (interested) হয়ে ভেতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে যে অনেকগুলি ভালো এ্যাসপেক্টের (aspect) সন্ধান পেলাম, সে কথা থাক এখানে।

অতীন কলেজে গোড়া থেকে আমার ক্লাসমেট, খুব অন্তরঙ্গ। সেই ঘটকালি ক'রে রমলার বাবা-মার সঙ্গে যোগাযোগটা ঘটাল। তাঁদের সর্ত, ব্রাহ্ম হ'য়ে যেতে হবে। সে তো জানাই। দীক্ষা, তারপর বিবাহ হয়ে গেল।"

রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল বীরেশ, ধক্‌ধক্ ক'রছে বুকটা। প্রশ্ন করল—"আপনাদের দিকে, স্যার ?"

"ছেলেবেলাতেই বাবা-মাকে হারাই, মানুষ হই কাকা-কাকিমার হাতে। তাঁরা ঢের বোঝাতেন, অন্যকে দিয়েও নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেন। শেষে—সম্মতি তো নয়ই, ছেড়ে দিলেন। ত্যাগ করলেনই বলতে পার ; 'সেই কে না ত্যজে সর্পদষ্ট অঙ্গুলি আপন'।"

হেসে চুপ করলেন। স্মৃতিচারণের ভাব।

একটু পরে বললেন--"এইখানে আমার একটা নূতন অভিজ্ঞতা হোল, যার ইংগিত একটু আগে দিলাম। সময়ের-আতঙ্কে তখন একটা কথা প্রবাদের মতো চালু হয়ে গিয়েছিল—'প্লেগের মতোই বেম্মদত্যি ধরছে আর সাবড়াচ্ছে।' সবাই সন্ত্রস্ত, বেড়া তুলছে 'বেম্মদত্যিকে' বাইরে ঠেলে রাখবার জন্যে। বাবা তাঁর উইলে লিখে যান—ছেলে কেটে বেরিয়ে গেলে ত্যজ্যপুত্র হবে। মনের পাপ মনের কাছে লুকুনো থাকেনা। কাকা অনেক চেষ্টা করলেও, আরও যে করলেন না শেষ অবধি এতে মনে হয়েছিল, উইলই এর জন্যে দায়ী। কেননা, একমাত্র জীবিত সন্তান, আমার কিছু হ'লে আমার সম্পত্তির অংশ কাকাতেই বর্তাবে এইরকমই সর্ত ছিল উইলে।

বিবাহের পর দুটো বছর আমার নিদারুণ অর্থ-সংকটে কাটে। কিছুদিন শ্বশুরবাড়িতে কাটিয়ে মাস্টারির চাকরি নিয়ে বাইরে বাইরে কাটাতে হয়। ব্রাহ্ম বলেই এর মধ্যে তিনটে স্কুল ঘুরে। পাড়াগাঁয়ের

ব্রাহ্মবিদ্বেষ কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাও খানিকটা প্রকট—কোনখা সাতটা মাস কাটাতে পারিনি। শেষে আবার কলকাতা শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসতে হোল।

কাকার সঙ্গে বিবাহের পর আর কোন সম্বন্ধ রাখিনি। বাই যাবার পর পত্রাচারও নয়। ফিরে আসার পর একদিন রা বাড়িতেই ব'সে আছি, বাইরে কড়ানাড়ার শব্দ হোল। শ্বশুরমশা কোথায় গেছেন, আমার সম্বন্ধী রথীশ আমার কাছে বসে পড়ছিল দেখে এসে বলল—'একজন ভদ্রলোক আপনাকে ডাকছেন।'

সেসব দিনের মিটমিটে গ্যাস-জ্বালা অন্ধকার-প্রায় গলি। বেরিয়ে দেখি কাকা দাঁড়িয়ে আছেন। প্রণাম নেবেন কিনা একটু ধোঁকায় প'ড়ে ক'রেই দিলাম প্রণাম। 'থাক্ থাক্' ব'লে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন—"এইটে রাখ। আর, আসবি খোকা; রাত্তিরেই আসিস বরং।"

কোঁচার খুঁটটা তুলে চোখ দুটো মুছে নিয়ে চ'লে গেলেন।

ভেতরে এবার নিজের ঘরে গিয়ে দেখলাম—নিজের দিক থেকে একটা দানপত্র ক'রে আমার সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন আমায়।"

গলাটা ধরে এসেছে, ঢোঁক গিলে সামলে নিয়ে একটু নীরব থেকেই বললেন—"তোমায় যে-কথাটা বলছিলাম বীরেশ। থাকেনা, কথাটা শুনতে আন্-অর্থডক্স (unorthodox) হলেও, মানুষের মনটা ধর্মের চেয়েও উঁচু—আকারগত যে ধর্ম, অর্থাৎ যেটা তারই সৃষ্ট। সেই একদিন ছিল—কাকা যেন এতদিনে এক সমাজের দৃষ্টি বাঁচিয়ে আর এক সমাজের দরজায় এলেন—চোরের মত—আর, সেদিন, নিমন্ত্রিত হ'য়ে তোমার গুরুপত্নী কেন গেলেন না তাই নিয়ে খেদ করলেন। সনাতন···অনুযোগের শেষ নেই। খাঁটিটাই থাকে; যা ভেজাল, যা মেকি তা ঝরে যায়।"

দু'জনেই চুপ করে রইলেন। কাহিনীটা অনুকূল হলেও তার সমস্যাটা সম্পূর্ণ মেটেনা বলে বীরেশ প্রশ্নের ভাষা গুছিয়ে নিচ্ছে,

ইন্টাই আবার আরম্ভ করলেন—"এ তো গেল সমাজে-সমাজে অস্নেহের কথা, তাইতেই আমি বীরত্বের আস্ফালন করছি (একটু থামলই)—পাইওনিয়ার বলে গর্ব করছি, আজকের এদের তাহলে কি ব? এরা তো ধর্মের মধ্যে থেকেই জাতিভেদের সংস্কারটাকে স্চেয়ে দিতে চাইছে। এদের যে স্ট্যাণ্ড (stand) আরও বোল্ড তঁbold)। এরা বলছে, প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে আমরা একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি ; কোথাও প্রণয়, কোথাও, যেমন আমার ক্ষেত্রে, অন্য কিছু—তাতে, পুরুষানুক্রমের আমার যা শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি, 'অর্থাৎ সম্পত্তি, আমার সেই ধর্ম তা থেকে আমায় বঞ্চিত করে কে ?

তোমার কি রকম লাগছে আমার কথাগুলা জানিনা, তবে চিন্তা করে দেখো।"

গল্পের মধ্যে সন্ধ্যা উৎরে গিয়ে নূতন কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ খানিকটা উঠে এসেছে। "চলো যাই এবার।"—ব'লে ওকে সঙ্গে ক' বাড়িমুখো হলেন।

দশ

ওদিকে কলোনী, এদিকে মা—ক'দিন থেকে মনটা একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছিল, তার মাঝে আজকের দিনটা যেন কোন্ দ্যুলোক থেকে নেমে এল ; বীরেশের জন্যেই। এরকম স্নিগ্ধতা, এই রকম অবিকল তৃপ্তি আর কবে পেয়েছে জীবনে, মনে পড়ে না। আনন্দকে, উল্লাসকে আমরা স্বার্থের নিরিখে যাচাই করি, কি চেয়েছিলাম, তার কতটা পেয়েছি। আজকের এ আনন্দ যেন তাতে ধরা দিচ্ছে না। ও যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল তা তো হোল, স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন উপমা—দৃষ্টান্তে ; কিন্তু এর মধ্যে এমনই কিছু হয়েছে, যার সামনে সে-স্বার্থ, সে-উদ্দেশ্য নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে। খুঁজছে। হাতড়াচ্ছে, কিন্তু গল্পগুজব,

খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে মনকে একটা কিছুতে সুস্থির ক'রে পারছে না।

রমলা দেবী সকাল-সকালই ব্যবস্থা ক'বে রেখেছিলেন। যখন শেষ হোল, রাত্রি তখন খানিকটা এগিয়ে গেছে। স্বামীস্ত্রীতে খানিকটা সঙ্গে গিয়ে ফিরে এলেন।

গ্রাম নিষুপ্ত। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়া চাঁদ থেকে ম্লান জ্যোৎস্না এসেছে। গতি মন্থর ক'রে বড় রাস্তা দিয়ে সকাল থেকে এই ও আগে পর্যন্ত সমস্ত দিনটির ওপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে আনতে আনতে সময় বীরেশের মনে হোল, এত সার্থক হয়েও দিনটা পূর্ণভাবে সা হয়নি এখনও। সেটা ক'রে তোলার ভার এখন ওরই ওপর। বুঝ আজকের যা আনন্দ তা মাস্টারমশাইকে এত নিবিড়ভাবে পাওয়া জন্যেই। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ নিবিড়ভাবে পাওয়া যায়নি, সেটা এবা তারই হাতে।

মনটা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছে।···একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে।··· কিন্তু বিপদ আছে তাতে। আরও অধিক মাত্রায়—; সমাজিক, পরিবারিক—তু'রকমই। বিশেষ ক'রে মাকে নিয়েই। এমন কি সেটা আরম্ভ হ'য়ে গেছে কিনা, তাই বা কে জানে? তবু ঝুঁকিটা নেবেই বীরেশ।

নিজেকে সংকল্পে কঠিন ক'রে নিল; তবে, একটু লঘু চাপল্যের হাসিই অধরে নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করতে করতে বলল—"মা আজ তোমার ছেলে জাত খুইয়ে এল!"

উঠানের মাঝখানে চৌকিতে ছোট একটি দলই ব'সে ছিল, সবাই একসঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল। গৌরী বললেন—"তোর তো তোর মাস্টারমশায়ের বাড়ি নেমন্তন্ন ছিল আজ।"

"ব্রাহ্ম তো?" উত্তর করল বীরেশ। চৌকির ধারে গিয়ে বসল।

"তাই বল্।"—স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন দাক্ষ্যায়ণী—"আমি ভাবছি কোন্ অজাত-বেজাতের বাড়ি খেয়ে এল বুঝি। তোর

ইন্‌মশাই তো বলেও পাঠিয়েছিলেন।···বাবা; বুকটা ধড়াস অঠেছিল।"

থাকিতে ব'সে আছেন পাশের বাড়ির গৃহিণী আর পাচিকা দিদি। পাশেই একটা বেতের চেয়ারে বীরেশের প্রতিবেশী মীর চেয়ারের পিঠে মাথা উল্টে ব'সে ছিল, একটু হেসে বলল—রের সব নিয়েই মস্‌করা!"

"নাবে, আগেভাগে ব'লে দেওয়াই ভালো। শেষভাগে একদিকে ল, অন্য দিকে হাঁড়িকুড়ি, সব কচুবনে দাখিল হবে তো?" ারের মস্‌করায় একটু গাম্ভীর্যই মিশিয়ে ছিল।

"হ্যাগো, জেঠাইমা?"—সমীর হেসে দাক্ষ্যায়ণীকে প্রশ্ন করল।

পাশের বাড়ির গৃহিণী বললেন—"বালাই, ষাট। আজকাল তাদের মুখে কিছু আটকায় না বাপু। ব্রাহ্মর বাড়িতে খেয়ে এসেছিস াস্তবড় নাকি অপরাধ হয়েছে!···"

"কেন, এর আগে খেয়ে আসেনি? জাত গেছে তাতে? বলুক না। কতবার তো···। হ্যাঁ, ছিল একটা সময়, না ছিল কেমন ক'রে বলি?" দাক্ষ্যায়ণী বললেন ওঁর কথার পিঠে—"ছেলেবেলায় দেখেছি তো, খোলকত্তাল নিয়ে ব্রাহ্মদের দল গ্রামে ঢুকল—সে এক সামাল-সামাল রব ঘরে ঘরে···"

"আমিও শুনেছি। তখন ওদের বোলবোলাও কি! বাবা-কাকাদের মুখে শোনা আমার। ওদিকে আবার শিবনাথ শাস্ত্রীর বাড়ি···"

—সমীর বলছে।

আলোচনাটা বেশ জমে উঠেছে, তবে তার মধ্যে বীরেশ নেই। যেন কানই নেই ওদিকে।

এক সময় বলল—"মাসিমা যে বললে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি আগেও কতবার খেয়ে এসেছি, কিন্তু সেসব তো ছিল জলখাবার, আজকালকার প্লেট। পাত পেতে সামাজিক নেমন্তন্ন—সে সাহস তো

উনিও করেননি কখনও—আমরাও খাইনি। আজ এ তো সিদ্ধ, অন্ন —পোলাও—জাত মারবার পক্ষে…"

"চুপ কর্ বাপু। জ্বালাসনে। হোটেলে গিয়ে সব অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে আসছে, তাতে জাত যায়না, যত জাত যায়…"

"তাহলে বলি যা ক'রে এলাম—ঝোঁকের মাথাতে…"

"আবার কি ক'রে এলি তুই! না বাপু, খুলে বলবে, তা নয়…"

'আমিও ওঁদের যে নেমন্তন্নই ক'রে এলাম।"

একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেল আলোচনাটা। সবার দৃষ্টি বাইরের দিকে, নয় তো নীচের দিকে।

সত্যই বলেনি বীরেশ; একটা টোপ ফেলে দেখাই, তবে বলবার সংকল্পটা আরও দৃঢ় হ'য়ে গেছে। একটু নিজেও চুপ ক'রে থেকে, সমীরের দিকে চেয়ে বলল—"কি রে সমু— তাহলে কাল গিয়ে মানা করেই আসব?"

"সেটা কি ঠিক হয়? তা…মাসিমা কি বলেন?"—সমীর গৌরীর দিকে চাইল।

"না বাপু,"—উনি উত্তর করলেন—"যখন ব'লে ফেলেছ একবার —অমন পদস্থ ব্যক্তি একজন…"

"কিন্তু একজনকে তো বলিনি আমি—তাঁর স্ত্রী, আর…"

"তাহলে আমি বলি"—পাশের বাড়ির গৃহিণী বাধা দিয়ে বললেন —"ব্রাহ্মণ তিনি—শাস্ত্রে বলছে নালার জল গঙ্গায় এসে পড়লে তো তা গঙ্গাই হয়ে গেল।…আর কি সুন্দর মানুষ সব। সেদিন কোথায় যে দেখাটা হোল…"

কি মনে হতে পাচিকার দিকে চেয়ে একটু হেসেই প্রশ্ন করল বীরেশ, বলল—"বামনপিসি কি বলো? হেঁসেল তো তোমারই হাতে —রাঁধা-বাড়া, দেওয়া-থোওয়া…"

"আমার বামনের হেঁসেল বাবা!"—একটু তেজের সঙ্গে উত্তর করলেন উনি—"হেন জাত হয়নি আজও যে হেঁসেলের জাত মারে!"

নীরব সমর্থনই পেলেন, পাশের বাড়ির গৃহিণী একটু মুখ টিপে হাসলেন। ফাঁকা তেজের বড়াইয়ের জন্যেই বোধ হয়।

সমীর মুঠোয় একটা হাসি চাপবার চেষ্টা ক'রে মাথাটা চেয়ারের পিঠে উল্টে দিল।

রাত একটু বেশিই হয়ে গেছে। মজলিসটা ভেঙে গেল।

বীরেশ সমীরকে একটু এগিয়ে দিতে গিয়ে রাস্তায় প্রশ্ন করল—"তুই অমন ক'রে হেসে উঠলি যে,—যেন বামনপিসির কথাতেই?"

"বুঝলি না?"—সমীর আবার হেসেই উত্তর করল—"সেই সনাতন ব্রাহ্মণ, অপরেশ লাহিড়ীও তাইতে বেঁচে গেলেন, বামনপিসির হেঁসেলও। কার সাধ্যি ভাঙে এ দুর্গ? তবু, দেখ, মাঝে মাঝে এইরকম ঠুকঠাক ক'রে হাতুড়ির ঘা মেরে।"

বুধবার। পরদিনই গিয়ে সবাইকে রবিবার নিমন্ত্রণ ক'রে এল বীরেশ। লোক পাঠিয়ে ধরণী আর চিত্রাকে আনিয়ে নিল। গ্রামের মধ্যে অতীনবাবুর বাড়ি, নিজের কয়েকজন বন্ধু, আরও সন্তর্পণে বেছে বেছে কয়েকজনকে বলল।

কলকাতা থেকে পেশাদার রসুইকে আনিয়ে বেশ ভালো ক'রেই ব্যবস্থা করল। গ্রামের সমাজ-অঙ্গে একটু শিহরণ উঠলই—

"এতই যদি উদার, এতই যদি দরাজ মন, তা মেয়েটাকে নে না···"

"তা ও নেবেই। এত যাওয়া আসা, এত মাখামাখি—ভেতরে কিছু সম্বন্ধ না থাকলে হয় না—"

"অঙ্গনার আর বেশি দিন নয়।"

এরপর ভালো ক'রে দানা বাঁধবার আগে আস্তে আস্তে মিলিয়েও গেল আলোচনাটা।

হেডমাস্টারকে—কিম্বা তাঁকে অবলম্বন ক'রে, প্রীতিভোজ দেওয়াটা পাকাপোক্ত হ'য়ে গেল, তাঁকে নিয়ে বীরেশের এতটা অগ্রসর হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল না। জাতপাঁত নিয়ে এতগুলা ধর্মে যে পরীক্ষা হয়ে

গেল, তার মধ্যে আধুনিকতম ব্রাহ্মধর্ম। সে-ধর্মে কি বলে, অপরেশ লাহিড়ীর মতো একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মের কী মনোভাব। কি অভিজ্ঞতা, এইটুকু নির্ণয় করবার জন্যেই তার ছুটে আসা কলোনী থেকে।

গোড়ায় অবশ্য বিপাশাই। তার জন্যই মা-মাসিমার মন বোঝা, নিজেকে আর বিপাশাকে নেপথ্যে রেখে অপরেশ লাহিড়ীর সমর্থন খোঁজা। অনুকুলই বলতে হয়, বাকি যেটুকু থাকে তা ঐ 'সয়ে যাওয়া' কথাটুকুতে পুষিয়ে নেবে।

বহরমপুরে গিয়ে বিপাশার সন্ধান নেওয়ার কথা ভেবে এদিকটা যাচাই করতে এসেছিল বীরেশ। এখন কতকটা যেন নিশ্চিন্ত হ'য়েই সময় নিল। ঠিক করল, বাড়িতে ফিরে আসছে ব'লে যে মা-মাসিদের মনে আশা জাগিয়েছে, আগে সেটা পাকা ক'রে নেবে, সেটাকে বিশ্বাসে পরিণত ক'রে।

বাড়িঘর সারাল, আধুনিক ঢঙে কিছু রদবদল, বাগান ঠিক করে নেওয়া, হেডমাস্টারের নির্দেশে কাজলদিঘিটা সংস্কার ক'রে তার চারিদিকে বাগান ক'রে হুগলি, বারুইপুর থেকে ভালো ভালো গাছ আনিয়ে পোঁতা। দু-একটা জমিজমা বেহাত হয়ে যাচ্ছিল, সেগুলাকেও উদ্ধার করল---গোটা কয়েক মোকদ্দমা ঝুলেই রইল কোর্টে।

জীবনের ধারাটাই সম্পূর্ণ বদলে গেল বীরেশের।

কলোনী গিয়ে অঙ্গনাই আবার বড় হ'য়ে উঠতে লাগল ওর জীবনে। থাকে এখানেই, সপ্তাহে দু'বার একবার ক'রে যায় কলোনীতে। ফিরে এল হয়তো সেইদিনই, কিম্বা একটা দিন থেকে গেল। বিপাশা যে বহরমপুরে চলে গেছে এটা কারুর অজানা নেই। গোড়ার দিকে একদিন চিত্রাই খবর দিল বীরেশকে। কলেজে নাম নেই দেখে একদিন ওদের বাড়ি যায়। মা ছিলেন না, ওর বৌদিদি বলল—সে বহরমপুরে কোন্ এক আত্মীয়ের বাড়িতে গেছে, সেখানেই

পড়াশুনা করবে। বিপাশা নেই, বীরেশও একরকম ছেড়ে দিয়েছে, কলোনীতে আর একেবারেই মন টঁ্যাকে না চিত্রার।

ধরণীও ছিল। সে বীরেশের কাছেই মোটামুটি শুনেছে। দু'জনে একটু দৃষ্টি-বিনিময় হোল। বহরমপুরের মোহর-দেওয়া কোন চিঠি এলে রেখে দেওয়ার কথা বলা আছে ধরণীকে ; যেন রি-ডাইরেক্ট ক'রে না দেয়। খানিকটা তার জন্যেও মাঝে মাঝে আসা বীরেশের।

আসেনা কোন চিঠি।

অঙ্গনাতেই শেকড় নামছে বীরেশের। বড় মিষ্টি লাগছে। জীবনের ভোলটাও যেন ফিরে যাচ্ছে দিন দিন। কেন্দ্রস্থলে রইলেন মাস্টারমশাই, তাঁর সমস্ত পরিবারটি বলাই ঠিক। প্রীতিভোজের পর থেকেই যাওয়া-আসা বেড়ে গেছে। বড়দের মধ্যে ততটা না হোক, সুচিত্রা আর মলয়কে নিয়ে বীরেশ প্রায়ই আসে। নিজে তো সন্ধ্যার সময় একরকম রোজই। কোন কোন দিন বিকালের দিকে গিয়ে সময় পেলে তাঁদের মেয়ে আর নাতিটিকেও নিয়ে আসে, খাইয়ে দাইয়ে আবার দিয়ে আসে, এদের দুজনকেও সঙ্গে নিয়ে। মেয়েটির নাম অবন্তিকা, নাতিটির প্রণব। সেকালের হিসাবে একটু নূতনই।

একদিন রমলা দেবী সুদ্ধ সবাইকে নিয়ে অপরেশ লাহিড়ী দেখা করতে এলেন। দাক্ষ্যায়ণী একটু অসুস্থ হয়ে পড়েন, সেই সূত্রে। তেমন কিছু নয়, মাথা-ধরা ঠাণ্ডা-লাগা জাতীয়ই ; তবে প্রীতিভোজে খেতে আসার পর আর তো আসা হয়নি, খবর নেওয়ার একটা অছিলা পেয়েই আলাপ-সালাপ ক'রে গেলেন। এরপর একদিন দাক্ষ্যায়ণী সবাইকে নিয়ে হ'য়ে এলেন লাহিড়ী-বাড়ি থেকে। নিজেই কথাটা তুলে ; যাওয়া-আসা বাড়ছে, ও স্থির হয়ে বসায় ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে গ্রামের সঙ্গে আবার, একটা আধুনিক স্টাইলের বৈঠকখানা তৈরী করা নিয়ে ব্যস্ত ছিল বীরেশ, যাওয়ার কথাটা তুলতেই দাক্ষ্যায়ণী বললেন —"অত আতিথ্য দেখিয়ে এলেন ওঁরা, উচিত হয়না একবার যাওয়া ?"

"তুমিও যাবে তো ?"—

প্রশ্নটার ভেতরে যে আর একটা প্রশ্ন রয়েছে তাতে একটু অপ্রতিভই হয়ে থাকবেন দাক্ষ্যায়ণী, বললেন—"ওমা! যেতে হবে না ?…একটু মাথা ধরেছে, কি না-ধরেছে…, বাড়িসুদ্ধ এসে হাজির। ক'টা লোক জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল বল্‌না আমায় ? আর, কী মানুষ সব বাপু ? ছোট নাতিটি থেকে নিয়ে গিন্নী পর্যন্ত—কী কথাবার্তার বাঁধুনি ! কী মিষ্টি স্বভাব !…"

—প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠলেন।

—"কবে একটু কি ভুল করে ফেলেছে—সেই কথা ভেবে এমন সব মানুষদের বাইরে ঠেলে রাখা ! কা'কে কি বলব ?"—ব'লে শেষ করলেন।

"ভুলটুকুর জন্যেই তো এরকমটি হ'তে পেরেছেন মা।"—একটু হেসে বলল বীরেশ।

"সেইজন্যেই তো দুঃখু বাবা। নৈলে আমি ঐ মেয়েকে ছাড়ি ? রূপ আমাদের এদিকেও আছে—কিন্তু কী কথাবার্তা! কী নরম স্বভাব !…আমাদের মধ্যে রূপ রইল একগুণ তো তার সঙ্গে চারগুণ ঠমক !"

কোথা থেকে কোথায় একেবারে ! হাসিই ফুটে বেরুচ্ছিল বীরেশের, সুচিত্রা একটু হন্তদন্ত হয়েই এসে উপস্থিত হোল।

"তুমি এখানে দাদা ? আর আমি তোমায় সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি ! বৈঠকখানা শেষ হ'লে আমি ওটাকে আমাদের পুতুলের বিয়ের বাসরঘর ক'রে গৃহপ্রবেশ করব।…হ্যাঁ দাদা, অবুদিদিদের সবাইকে নেমন্তন্ন ক'রে…হ্যাঁ দাদা—লক্ষ্মীটি !…"

"তুই আগে অবুদিদির মতন হ'দিকিন। মা বলছিলেন তাহলে তোর পুতুলের মেয়েও ভালো ক'রে বিয়ে দেবেন তোর।"

দাক্ষ্যায়ণীর দিকে চেয়ে বলল—"বেশ তো মা, একদিন চলোনা, —যেদিন বলবে।"

গ্রামের মধ্যে লাহিড়ী পরিবার আরও ছড়িয়ে পড়েছে। অপরেশের বড় জামাই এলাহাবাদে প্রফেসার। একটা ছুটিতে গ্রামে এলে, নূতন ভাবের অভ্যর্থনা পেল।

প্রীতিভোজের দিনটা অঙ্গনার ইতিহাসে লাল কালিতে চিহ্নিত হয়ে রইল। সেই থেকেই তো শুরু ভাঙাগড়া।

সাতটা মাস কেটে গেল।

এটা যেন এই সাতটা মাসের প্রতিদিনের অনুভূত ব্যাপার, প্রত্যক্ষ। এর অন্তরালে খুব নিঃসাড়ে অন্যদিকেও একটা পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। তার সংবাদ মাঝে মাঝে পায় বীরেশ মনের গভীরে দৃষ্টিপাত করলে, বা এমনি হঠাৎ কোন অসতর্ক মুহূর্তে। বিস্মিতই হয়।

মা-বাড়ি-লাহিড়ী পরিবার নিয়ে অঙ্গনা যতই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছে, বিপাশা যেন স'রে যাচ্ছে তার জীবন থেকে। খুব দূরাগত একটা সুরের রেশ সাতটা স্বরগ্রামের মাধুর্য-বেদনা নিয়ে ভেসে আসে, আনমনা ক'রে দেয়, আবার অঙ্গনার ডাকে মিলিয়ে যেতেও দেরি হয় না।

অদর্শনে স্মৃতি-শৈথিল্য, কি, অসম্ভবকে মেনে নেওয়া···ঠিক বুঝতে পারছে না। বিস্মিত হয়, তবে, আর সেরকম ব্যাকুল হয়ে পড়ে না।

কলোনীতে যাওয়াও কমে এসেছে। যাওয়ার একটা উদ্দেশ্য ছিল বিপাশার চিঠি। সেদিকে নিরাশ হ'তে হ'তে সপ্তাহে দুদিন থেকে মাসে দিন চার দাঁড়িয়েছিল। এদিকে বাড়ি নিয়ে একটা কাজ থাকায়, তার সঙ্গে দাক্ষ্যায়ণীর শরীরটা অসুস্থ হয়ে পড়ায়, দিন কুড়ি আর যাওয়াই হয়নি। উনি ভালো হ'য়ে উঠলে গৌরীদেবী একবার দেখে আসতে বলায় একদিন সকালে গিয়ে দু'টো দিন থেকে সন্ধ্যায় ফিরে এল। পরের দিন বিকালে ভৃত্য উমাচরণ ধরণীর একটা চিঠি নিয়ে এল। বীরেশ চলে আসার কিছু পরেই একটি ভদ্রলোক, বছর

বিশ-বত্রিশ বয়স, সস্ত্রীক ওর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। বললেন, বিশেষ কাজ আছে, অন্যের সঙ্গে হবে না। ধরণী সামনের শুক্রবার, অর্থাৎ তুটো দিন বাদ দিয়ে বিকেলে আসতে বলেছে। বীরেশ যেন একদিন আগেই এসে যায়।

বীরেশ পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়ল। কাজটা অন্যের দ্বারা হওয়ার মতো নয়, সুতরাং খানিকটা গোপনীয়ই নিশ্চয়; পরদিন শুক্রবার কলেজ থেকে এসে ধরণী চিত্রাকে নিয়ে তার এক প্রফেসার-বন্ধুর বাড়ি চলে গেল। নির্দিষ্ট সময়ে ওরা তু'জনে একটা ট্যাক্সি ক'রে এসে উপস্থিত হোল। বীরেশ সিঁড়ির মাথায় অপেক্ষা করছিল, নিয়ে গিয়ে ভেতরে বসাল। ভদ্রলোক সুপুরুষ, শৌখীন, পরনে প্যান্টালুন আর দামী কাপড়ের বুশসার্ট। এটাই তখন নূতন উঠেছে। বাঁ হাতে একটা গোল্ডফ্লেক সিগারেটের টিন। এটাও তখন একটা সর্বাধুনিক স্টাইল। চেয়ারে বসে ওটা সামনের টেবিলে রেখে দিল।

মেয়েটির বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। সুন্দরীই, পরণে হালকা বেগুনী রঙের ভয়েলের শাড়ি, ম্যাচকরা ব্লাউস, পায়ে অল্প হীল-তোলা জুতা, বাঁ হাতে একটা কালো ভ্যানিটি ব্যাগ। তার মধ্যে থেকে একটা রুমাল বের ক'রে, মুখে কপালে অল্প অল্প 'ড্যাব্' (Dab) করে ঘাম মুছে নিয়ে আবার ব্যাগটার মধ্যে পুরে সেটা টেবিলে রেখে দিল। এগুলা সাধারণ, দৃষ্টি তু'সেকেণ্ডেই বুলিয়ে আনা যায়; একটা জিনিসে দৃষ্টি তু'সেকেণ্ড আটকেই গেল, সম্ভ্রম বোধেই সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিতে হোল বীরেশকে। মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা, খুব অগ্রসর নয়, চোখে পড়েই না, তবে মেমসাহেবী ঢঙে সামনের খানিকটা নীচে পর্যন্ত একটা এ্যাপ্রনে (Apron) ঢাকা ব'লেই একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এটা তখনকার খুব একটা চলতি স্টাইল না হলেও, বিশেষ ক'রে শিক্ষিতা, যারা চাকরিতে নেমেছে, তাদের মধ্যে কিছু কিছু চলেছে; কিম্বা চাকরি না করলেও যাদের পার্টি, ফাংশন্ এটেণ্ড্ করতে হয়। এক ধরনের লজ্জা জাগিয়ে লজ্জা ঢাকা। কিম্বা, লজ্জা নিয়ে

হাত-পা গুটিয়ে তো বাড়িতে ব'সে থাকা চলে না। একটা নীরব স্পর্ধাই।

কথা একেবারেই নেই। একবার সিঁড়ির মাথায় নমস্কার বিনিময়ের সঙ্গে "ভালো আছেন তো?"

ব্যাগে রুমাল রেখে দেওয়া শেষ হ'লে ভদ্রলোকের চোখের সূক্ষ্ম ইসারায় ব্লাউসে হাত ঢুকিয়ে বুকের কাছ থেকে একটা খাম বের করল, বীরেশের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল—"একটা চিঠি আছে আপনার।"

একটু কম্পিত হস্তেই খামটা ছিঁড়ে ফেলল বীরেশ। একটা খাতা থেকে ছেঁড়া কাগজে লেখা আছে—

বীরুদা,

তুমি যতীনদা আর প্রভাদিদির সঙ্গে শিগ্‌গির একবার চলে এস। সাক্ষাতেই সব কথা হবে। কোনরকম সন্দেহ বা ভয়ের কারণ নেই।

বিপাশা।

বার দুই-তিন চিঠিটা পড়ে গেল বীরেশ, তারপর মুখ তুলে ভদ্রলোকের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল। সে ইতিমধ্যে টিন থেকে একটা সিগারেট বের ক'রে ধরিয়েছে। সঙ্গিনীকে বলল—"তুমিই বলোনা।"

মেয়েটি ঘামে-ভেজা একটা চুলের গুচ্ছ মাথায় তুলে দিয়ে বলল—"আমাদেরই নাম প্রভা, আর ঐ যা লেখা রয়েছে, পুরো নাম জে.এন. রায়। বিপাশার কাছে আমরা সব কথা শুনেছি। 'আমরা' না ব'লে 'আমি' বলাই ঠিক হবে; তারপর আমার কাছে উনি শুনেছেন। আমাদের সম্বন্ধটা নিশ্চয় বলে দিতে হবে না?"—একটু হাসল।

একটু হাসবার চেষ্টা ক'রেই অপাঙ্গে একবার ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে নিল বীরেশ, তারপর গম্ভীর হ'য়ে মেয়েটিকেই প্রশ্ন করল—"কিন্তু ···মাফ করবেন আমায়, সহজ কৌতূহলেই জিজ্ঞেস করছি—কি সূত্রে বিপাশা বলল আপনাকে সব কথা।"

"সেটা আপনি তার মুখেই শুনবেন। আপাতত আপনার সন্দেহ দূর ক'রবার জন্যে আপনাকে এই একটা জিনিস দেখাচ্ছি।"

ব্যাগটা বের করে এক টুকরা রাঙা-কাগজে-মোড়া একটা আংটি ওর হাতে দিল। বিপাশাকে দেওয়া বীরেশের আংটি। বীরেশ দেখে ফিরিয়ে দিয়ে বলল—"ঠিক আছে; তারপর?"

"আপনি গিয়ে আমাদের বাসায় উঠবেন। পরিচয় থাকবে, আপনি আমার ভগ্নীপতি। মুর্শিদাবাদের নবাববাড়ি, আর সব পুরনো জিনিস দেখতে এসেছেন, দিন দুয়েক থেকে চলে যাবেন। বিপাশা আমার কাছে পড়ে বাড়িতে এসে। এরপর···আরও ভেঙে বলতে হবে?"

বীরেশকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে বলল—"আমি ওখানে একটা গার্লস্ স্কুলের টীচার। গ্র্যাজুয়েট টীচারই, ট্রেণ্ড।···এদিকে সমস্তই ঠিকঠাক করা আছে। আপনি পেঁছিবার পরদিনই কাজ হ'য়ে যাবে, বিপাশাকে নিয়ে চলে আসবেন আপনি।"

বীরেশ একটু মাথাটা হেঁট ক'রে শুনছিল; নিরুত্তর দেখে আবার প্রশ্ন হোল—"আরও কিছু জিজ্ঞেস করার আছে?···হ্যাঁ···এঁর পরিচয়, ইনি কলকাতার একটা কমারশ্যাল হাউসের ব্যাঞ্চ ম্যানেজার ওখানে।"

গা'টা ঘিন্ ঘিন্ করছে ব'লেই উত্তর জোগাচ্ছেনা বীরেশের।··· বিপাশা একদিন কলোনীতে তাদের বাসায় এল; সুন্দরী, সপ্রতিভ, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, জয় করে নিল বীরেশকে। স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক যা হোল, বা, হতে যাচ্ছিল—সমাজ বিধানের বিরোধী—তা বীরেশের দিকেই, বিপাশা সেখানে নির্দোষ, নিরীহ, অসহায়া। তাকে এই রকম একটা কূট চক্রান্তের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, একেবারেই যেন সায় দিতে চাইছে না বীরেশের মন।

অথচ একটা চান্স; একটা লোভ, বিপাশাই তো চিঠি দিয়েছে, তার ওপর আংটিটাও।

দেরি হ'য়ে যাচ্ছে।

মনটাকে কোনরকমে একটু গুছিয়ে নিয়ে বলল—"একটু সময় দিন, ভেবে দেখতে হবে একটু…"

"নিজের সঙ্গে তার কথাটাও ভাববেন।"

—শ্লেষটুকু যেন ঠিকরে বেরুল মেয়েটির চোখ থেকে, অধরটা একটু কামড়ে ছেড়ে দিল।

বীরেশ একটু রেঙে উঠে লজ্জিত ভাবে বলল—"না, না। আমি সে ভেবে বলিনি, মাফ করবেন। ধরণী আমা'য় সঙ্গে সঙ্গে চ'লে আসা ভিন্ন আর কিছু লিখেনি—নিশ্চয় জানতও না—যার জন্যে আমি বাড়িতে কিছু ব'লে আসতে পারিনি…মার শরীরটাও বেশ ভালো দেখে আসিনি। এই সব কারণে ঠিক আপনার সঙ্গে যেতে পারছি না। একবার বাড়ি হ'য়ে আসতে হবে। আপনারা কোথায় উঠেছেন ?"

একেবারে চুপচাপ থেকে এক নিঃশ্বাসে এত কথা, দু'জনে একবার দৃষ্টি-বিনিময় করে নিল : ভাবটা যেন "এইবার পথে এসো।" ভদ্রলোকের সিগারেট ফুরিয়ে এসেছিল, ঠুকে ঠুকে আর একটা ধরাল। প্রভা ব্যাগ খুলে নোটবুক থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে ঠিকানা আর ভদ্রলোকের নাম লিখে বীরেশের হাতে দিল। কলকাতার একটা দেশী ভালো হোটেল। বলল—"কিন্তু আমরা তো বেশিদিন এখানে থাকব না। কলকাতায় কিছু কাজ আছে। কাল, পরশু, তার পরদিন লালগোলা প্যাসেঞ্জারে চ'লে যাব। এর আগে পারেন আসতে, ভালোই, নৈলে…"

ব্যাগটা খুলতে যাচ্ছিল, জগবন্ধু ট্রেতে ক'রে চা, কেক্, বিস্কুট এনে উপস্থিত হতে ঘুরে দেখে বলল—"আবার এসব কেন ?"

"কিছুই তো নয়। চায়ের সময়ও হয়েছে।"—বীরেশ বলল।

জগবন্ধু সাজিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল, যতীন বলল—"একটা এ্যাশট্রে ভাই। যদি থাকে। মেঝেটা নোংরা করছি।"

মেয়েটির দিকে চেয়ে বলল—"নাও। তোমার পীস্ মিশন্ সাক্‌সেস্‌ফুল। ভয় হচ্ছিল, দাদা বুঝি বানচাল করে দিলেন।"

নিজে একটা কেক্ আলতোভাবে তুলে নিল।

মেয়েটি বীরেশের দিকে চেয়ে বলল—"সত্যি; আপনাকে··· আপনাকে···কি বলি ?"

"আমায় যা নিত্যই ব'লে থাকে—নির্মম, নির্দয়, নিষ্ঠুর···"

প্রচলিত স্টাইলে দুলে দুলে হাসতে লাগল।

চা সেবনের মধ্যে তুষার কঠিন ভাবটা গলে গিয়ে আলাপ-আলোচনা বেশ সহজ হ'য়ে এল। বহরমপুর-মুর্শিদাবাদের পুরাতত্ত্ব নিয়েই কথা হোল বেশিভাগ। আরও দু একটা এদিক-ওদিক কথা। চলতি প্রসঙ্গটা যেন ইচ্ছে ক'রেই তিনজনের কেউ আর তুলল না। চা-পর্ব শেষ হ'য়ে গেলে মেয়েটি আবার ব্যাগ খুলে নোটবুকের একটি পাতায় সেখানকার ঠিকানা লিখে পাতাটা ছিঁড়ে বীরেশের হাতে দিয়ে বলল—"এইটে রাখুন। ওঁর আফিসের ঠিকানা। গাড়িওয়ালাকে বললে নির্ভুল পৌঁছে দেবে। যদি কবে আসছেন ঠিক করে ব'লে দিতেন আমরাই স্টেশনে আসতাম।"

"বললাম তো অসুবিধার কথা আপনাকে···"

"কিন্তু, আসছেন তো নিশ্চয় ? বিপাশাকে ব'লতে হবে গিয়ে আবার···"—উঠতে উঠতে বলল।

"নৈলে, আর করবে কি ?" উঠে পড়ে হাসতে হাসতে বলল যতীন রায়—

"আমার মতন মিথ্যুক, অবিশ্বাসী বলা ছাড়া।"

বীরেশও উঠে সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল—"আপনাকে দেখছি অনেকগুলি বিশেষণে—ভূষিত করেছেন উনি।"

উচ্চকিত হাসির মধ্যে নেমে গিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে এল।

কথাবার্তাই গোপনীয়, সাক্ষাৎকারটা নয়, চিত্রাও জানে, আগে দেখেছেও ওদের। ওরা দু'জনে ফিরে এলে বীরেশ বলল, মেয়েটি তার এক বন্ধুর বোন, স্বামী চাকরি-সূত্রে মুর্শিদাবাদে বদলি হয়েছে, হাজারদুয়ারী আর পুরনো জায়গা দেখবার জন্যে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল। ঠিক হয়েছে, বাড়ি থেকে ফিরে এসে দিন চার পাঁচের মধ্যে একবার যাবে বীরেশ।

"এই কথা? তা, এতে এমন লুকুবার কি ছিল?···ভাবটা সেই রকম কতটা লয় গা?"

টিপন্নীটুকু ক'রে ধরণীকে শেষে জিজ্ঞেস করল চিত্রা। ধরণী বলল —"মনে হোল বৈকি যেন একটু ছমছমে ভাব।"

এদিকটা ভাবা ছিল না কিছু। "থাকতে পারে কিছু···আজকাল-কার যা পলিটিকাল আবহাওয়া···" ব'লে আরম্ভ করেছিল বীরেশ, চিত্রা কথার পিঠে বলে উঠল—"তা দাদা, মুর্শিদাবাদ যাচ্ছ, কাছেই তো বহরমপুর, বিপাশা থাকে সেখানে। একবার খোঁজ নিয়ে দেখা কোরনা···"

"দেখব রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে 'বিপাশা! বিপাশা!'—ব'লে হেঁকে যদি সাড়া পাই।···তুই ছেলেমানুষই রয়ে গেলি চিত্রা···"

"কেন? ব'লতো ঠিকানাটা এনে দিই···"

বেশ উৎসাহের সঙ্গে ব'লতে গিয়ে থেমে গেল। মগ্ন কণ্ঠেই বলল —"না, থাক, তেমন যেন আর আটা নেই ওদের কারুর—ডেকে বসানো—দুটো কথা জিজ্ঞেস করা···বিপুই নেই তো···থাক্।"

বীরেশ-ধরণীতে একটু দৃষ্টি-বিনিময় হোল।

চিত্রার পরীক্ষার পড়া। সন্ধ্যার পর ও বসে গেলে বীরেশ ধরণীকে বলল—"অনেক দিন একরকম কলোনী ছাড়া, চল্, কয়েকজনের সঙ্গে একটু দেখা ক'রে আসি।"

কলোনীর মাঝামাঝি এদের বাসা থেকে পো'টাক দূরে পার্কের জন্য খানিকটা জমি পড়ে আছে। কিছু হয়নি এখনও; ছেলেরা ফুটবল খেলে, ধারে ধারে খানকতক লোহার বেঞ্চ পাতা আছে। গিয়ে একটাতে বসল তু'জনে। সব কথা বলল বীরেশ ধীরে ধীরে। বাড়ি, লাহিড়ীবাড়ি নিয়ে এই সাতমাসে অঙ্গনার পরিবর্তন, ওর মনের ওপর তার প্রভাব—এর ফলে অদর্শনে, অসম্ভাব্যতায় বিপাশার আকর্ষণ কিছুটা শিথিল হ'য়ে আসা—সব কথাই ওকে অকপটে বলল। তারপর হঠাৎ ঘটনার এই দিক-পরিবর্তন।

বলল—"আমার মাথায় কিছু অসছে না ধরু। মনে আছে, সেবারে এক অর্থে বলেছিলি "স'য়ে যায়।"—অথাৎ এই অসবর্ণ বিবাহ। তোকে ব'লতে বাধা নেই, তেমনি ক'রেই অদর্শনে আর তুস্তর বাধা ব'লে এটাও যেন স'য়েই আসছিল আমার, ভাবছিলাম, কাজ নেই তাহলে, মার পছন্দমতো একটা বিয়ে ক'রে অঙ্গনাতেই গুছিয়ে বসি। এখন দেখছি, আমি ভুলে এলেও সে এই সাত-আট মাস ধ'রে…"

হঠাৎ উদ্গত অশ্রুটা অনেক কষ্টে রোধ ক'রে দৃষ্টি আকাশলগ্ন ক'রে ব'সে রইল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ গেল। পরে ধরণীই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—"তোকে বোধহয় প্রথম পরীক্ষাটাই ক'রতে হবে বীরু, সেদিনও বোধহয় এই কথা বলি আমি। তবু একটা যখন চান্স্ পেয়েছিস, একবার নিরস্ত করার চেষ্টাই ক'রে দেখ। বড় মাসিমারও তো বয়স হয়েছে। তোকে নিজে পছন্দ ক'রে বিয়ে করার স্বাধীনতা দিলেও একেবারে এতটা সহ্য করতে পারবেন কিনা বলা তোযায় না।"

পথে আসতে আসতে বীরেশ একবার বলল—"কোন্ দিকে যাবে ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না ধরণী। আমার মনে হয় অন্তত চিত্রাকে একেবারে অন্ধকারে ফেলে না রেখে একটু ইংগিত দিয়ে রাখাই ভালো।"

রাত্রে খাওয়ার সময় একথা-সেকথার মধ্যে বলল—"তোকে তখন বললাম বটে চিত্রা, তবে, আমার এক একবার মনে হ'চ্ছে ওদিকে যখন যাচ্ছিই বিপাশার একটু খোঁজ নিলে হোত। অত আসা-যাওয়া করত মেয়েটা। ভালো লাগত···"

"তাহ'লে ঠিকানাটা নিয়েই আসি দাদা?"—হাত থামিয়ে উৎসাহভরে ব্যস্ত হয়ে উঠল চিত্রা।

"না, না।"—একটু ধমক দেওয়া গোছের ক'রেই বারণ করল বীরেশ—"যেখানে আদর নেই, সেখানে কোনো মতে যাবিনি, খবরদার। আত্মসম্মানটা এত অল্পে খোওয়াবার জিনিস নয়। কলেজে পড়ছে, ওদের দিয়েই ঠিকানা বের করা কিছু শক্ত হবেনা।"

"যেমন বলছিলে, তাহলে তো আর কোন রকম যোগ রাখাই অনুচিত ওখানকার সঙ্গে। বিপাশা নেই, কী দরকার তোমার?"—সমর্থন করল ধরণী।

পরদিন সকালেবেলাই বীরেশ অঙ্গনায় চ'লে গেল।

আবার সেই প্রাণান্তকর দোটানা—সেই দুই রূপে, জননী আর প্রেয়সী—মা-দাক্ষ্যায়ণী, আর বিপাশা···ছেড়েই দেবে বিপাশাকে। কথা দিয়ে এসেছে?···বিপাশার কথাতেই তো তার কাটান রয়েছে—সেই যে বলল সেদিন—সে জিনিসটা সমস্তটুকুই মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত, এক কণা মিথ্যায় তাতে এমন কি দোষ হবে?

মাকে হারানো চলবে না। এই সাতটা মাস যেন আরও মার কোলের কাছে গিয়ে পড়েছে। কিম্বা—যেমন এই বয়সটায় হয়—মা-ই যেন শিশুকন্যাটির মতো তার কাছে ঘেঁষে এসেছেন। কী যে অসহায়, নিরুপায় দেখায় তাঁকে আজকাল! দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে চারটে দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল, যেন বুঝতেই পারল না বীরেশ।

কোন কাজেই আর মন বসাতে পারে না। মৌন, অন্যমনস্ক। মা-মাসিমা আর বন্ধু-বান্ধবদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়—কলোনী থেকে

আসার পরই কেন তার এই ভাবান্তর ? হেসে এড়িয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করে। তারপর একদিন সন্ধ্যায় বকুলতলার নীচে ঘাটে ব'সে নিজেও আবিষ্কার করল, এই দ্বিধাদ্বন্দের মধ্যে ক'দিনে অঙ্গনা তার কাছে বর্ণহীন হ'য়ে এসেছে, দূরে চলে যাচ্ছে। অঙ্গনাকে নিবিড়ভাবে পাওয়ার মধ্যে মা ছিলেন; অন্যদিকে বিপাশা প্রায় একটা ধূসর স্মৃতিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অঙ্গনাকে আরও নিবিড়তর ভাবে পেতে হবে।

চারদিনের মধ্যে এই প্রথম মনটা একটা কাজে তৎপর হ'য়ে উঠল। অঙ্গনা মানেই মাস্টারমশাই, এই রকমই দাঁড়িয়েছিল এদিকে। অথচ, সেদিন কলোনী থেকে এসেই বিকালে গিয়ে একটু 'ধর্মের ডাক' দিয়ে আসা ছাড়া আজ পর্যন্ত ভালো ক'রে আলাপ করে আসা হয়নি। সেদিন আবার রমলাদেবী মেয়ে-নাত্নিকে নিয়ে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলেন।

একটা দুরপনেয় অপরাধ স্খালন ক'রে নেওয়ার মতো ক'রে ত্রস্তভাবেই উঠে পড়ল বীরেশ। পথে যেতে যেতে একটা পরিকল্পনাও দাঁড় করিয়ে ফেলল।

সবাই ছিলেন। অতীনবাবু তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বিকেলবেলা থেকে গল্পস্বল্প করছিলেন, উঠতেই যাচ্ছিলেন, বীরেশ যেতে আরও খানিকটা ব'সে আলাপ-আলোচনা ক'রে চলে গেলেন। অপরেশ রমলাদেবীর সঙ্গে ওঁদের গেট পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে ফিরে আসতেই বীরেশ অপরাধীর মতোই বলে উঠল—"সেদিন এসে একটু বসতে না পেরে···"

"তাতে কি হয়েছে ?···তোমার মা আছেন কেমন ?"

"আছেন···" শব্দটার ওপর জোর দিয়ে প্রশ্নটা এমন কানে বাজল যে বুকটা ধক ক'রে উঠল বীরেশের। মুখের দিকে একটু চেয়ে বলল—"কেন স্যার ?···ইয়ে···ভালোই তো।"

"না। সেই কথা জিজ্ঞেস করছিলাম।···সেদিন তাড়াতাড়ি চলে গেলে···" অন্য কথা এসে পড়ল।

বীরেশের মনে হোল উনি যেন ইচ্ছা করেই ঘুরিয়ে দিলেন প্রসঙ্গটা। তাইতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে, আবার প্রশ্ন করা ঠিক হবে কিনা ভাবছে, এমন সময় একটা ব্যাপারে এ ভাবটাও চাপা প'ড়ে আবার হৃদস্পন্দনটা হঠাৎ বেড়ে গেল। এবার পুলকে। একটা হারানো জিনিস অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে গেছে।

গল্পস্বল্পের মধ্যে অবন্তী একটা কাগজের ছোট মোড়ক হাতে ক'রে নিয়ে এসে বলল—"এটা আজকের ডাকে এসেছিল বাবা, ভুলে গিয়েছিলাম।"

পোস্টআফিসের মোহর দেওয়া একটা বুকপোস্ট। অপরেশ হাতে নিয়ে বীরেশের পানে চেয়ে বললেন—যেমন একটু হাসি লেগেই থাকে সেইভাবে—"দ্যাখোনা। রিটায়ার ক'রে কোথায় 'হরিনাম' নিয়ে থাকবে লোকে, না···"

"জিনিসটা কি স্যার ?"—প্রশ্ন করল বীরেশ।

"একটা গ্যালি-প্রুফ। একটা নতুন কাগজ বেরিয়েছে, ধরেছে, লেখা দিতে হবে।"

মোড়কের কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে, প্রথম পাতাটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে বললেন—"আর, কী ভুলটা যে করতে পারে ! এক একটা শব্দ এমনভাবে উল্‌টে দিয়েছে—প্রিণ্টার্স ডেভিল (printers devil)—সে যে কী জিনিস !···"

একটু চকিত হ'য়ে উঠেই ছেড়ে দিয়ে বললেন—"হ্যাঁ, এই যে—তোমাকে বলবই মনে করেছিলাম—তুমিও তো একসময় লিখতে—একটা ম্যাগাজিনও বের করেছিলে নিজের—তাই না ?"

ওঁর হাতে গ্যালি প্রুফটা দেখে, তার ওপর নিজের লেখার কথা শুনে একটা চিন্তাস্রোত নেমে গিয়েছিল বীরেশের মনে, লজ্জিতভাবে ওঁর মুখের ওপর দৃষ্টি তুলে বলল—"সে একটা লোকসানের যোগ এসেছিল স্যার—বাবারই বলি, তিনি তখন বেঁচে। আর লেখার কথাটা তুলে শুধু লজ্জাই দিচ্ছেন—সে কেবল···"

"না, না, বীরেশ, আমার মনে হচ্ছে কিছু পড়েও থাকব। নতুন হাত, তবু প্রমিস (promise) ছিল ব'লেই মনে পড়ছে আমার। তুমি শুরু করো, আমি—না হয় একটু দেখে শুনেই ছাপাবার ব্যবস্থা করব···"

"আমি অন্য কথা ভাবছিলাম স্যার···" কুণ্ঠিতভাবে বাধা দিয়ে বলল বীরেশ।

"কি? বলো।"

"তাতে একটা সুবিধে এই যে, আপনি যদি আগাগোড়াই কাটাকুটি ক'রে ছাপতে দেন তো কারুর বলবার কিছু থাকবে না।" একটু হেসে আবার সহজ হ'য়ে গিয়েই বলল—"আমি বলছিলাম—যদি আমার সেই কাগজটাই আবার শুরু করি তো কেমন হয়? এবার আপনি থাকবেন এডিটার—যুগ বদলাচ্ছে, গ্রামাঞ্চল জেগে উঠছে···আপনি চুপ ক'রে রয়েছেন মা···"

"কথাটা তো মন্দ নয়। ওঁর ঐসব দিকে ঝোঁক, ব'সেও আছেন। তবে, আবার লোকসান দেবে?"—রমলাদেবী বললেন।

"জেনেশুনে লোকসান দেওয়া, আর লোকসান ঘাড়ে এসে পড়া দুটো আলাদা কথা মা। লোকসান যে কতদিকে নিত্যি হচ্ছে। উনিও বসে আছেন বলছেন, আমারও হাতে কোন কাজ নেই। আর একটা কথা ক'দিন থেকে বলব-বলব করছিলাম—অঙ্গনায় আমার কিছু একটা করতে ইচ্ছে করছে; একটা জেগে ওঠার ভাব দেখছি। চলেই আসা ঠিক করেছি, কিন্তু কী নিয়ে থাকব? না, আপনিও একটু জোর দিন আমার হ'য়ে···"

অপরেশ একটু শূন্যদৃষ্টিতে চুপ ক'রেই আছেন দেখে আবেগভরে বলেই যাচ্ছিল, উনি ঘুরে বললেন—"না, লোকসান যে দিতেই হবে এমন কথা কী আছে? একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে, সাবধানে এগুলেই চলবে। আমি একটা কথা ভাবছিলাম—এবার দু'জনে থাকব, লোকসান যদি যায় প্রথমটা···এবার দু'জনে থাকব···"

"না স্যার, আমি লোকসানকে যমের মতন ভয় করি।" উৎসুক

ভাবে মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে শুনতে শুনতে এমন শিউরে উঠে বলল যে তু'জনেই হেসে উঠলেন। বীরেশ সেইভাবেই বলে চলল—"বুঝেছি—আপনিও টাকা ঢালতে চান—ছাত্রকে সাহায্য করা হিসেবে—না, সে আমি কোনমতেই হ'তে দোব না—অন্ততঃ প্রথমটা নয়—পরে যদি দেখি লাভ হচ্ছে···"

"তখন তো আমি নিজেই বলব—বেশ তু'পয়সা পাচ্ছ হে—তাহলে আমায় কিছু বখরা না দিলে···"

হো-হো ক'রে হেসে ঘাড়টা উলটে দিলেন। রমলাদেবীও উপস্থিত হাসিটা ঘাড় নীচু ক'রে চাপবার চেষ্টা করছেন, উনি সামলে নিয়ে বললেন—"বেশ, সে পরের কথা পরে হবে। তুমি আজ যাও। রাত হয়ে গেছে। কাল সকাল সকাল এসো। আমি ইতিমধ্যে ভাবি। কথাটা ভালোই তুলেছ···যদিও, বেশ ভালোভাবেই যে, এমন কথা বলতে পারিনা।"

হাসতে হাসতে ওর সঙ্গে উঠে পড়লেন।

তৃতীয় দিনের কথা।

আগের দিন সকাল-সকালই গিয়েছিল বীরেশ। গিয়ে দেখল অতীনবাবু বসে আছেন। অপরেশ তাঁকেও টেনে নিয়েছেন এবং তু'জনে মিলে একটা স্কীম গ'ড়ে নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছেন। টাকার দিকটায় অপরেশকে বাইরে রাখা তাঁরও মত; বীরেশের হয়তো শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমের দিক থেকে, তিনি বলেন, রিটায়ার করেছেন, এ দায়িত্ব না নেন সেই ভালো। এডিটার হিসাবে উনি কিছু নেবেন না বলেছেন, সেই হিসাবেই একটা টাকা ধ'রে নিয়ে ওঁর নামে জমা হবে।

মাঝে-মধ্যখানে বীরেশের ছোটখাট তু'একটা প্রস্তাব ঢুকিয়ে দিয়ে পরিকল্পনাটা একরকম শেষ ক'রে ফেলাই হোল।

মাস চারেক পরে একটা শুভ দিন দেখে যাতে কাগজটা বের করা যায়, ইতিমধ্যে তার চেষ্টা চলতে লাগল।

জীবনে কোন্ জিনিসটার প্রভাব কিভাবে পড়ে বলা যায়না। পত্রিকা প্রকাশের দিক থেকে নিশ্চিত এবং নিশ্চিন্ত হ'য়ে যেতে ওর মনটা আর সব ছেড়ে একেবারে বিপাশার দিকে গিয়ে পড়ল। প্রথমটা হঠাৎ এবং অহেতুকভাবেই। তারপর যতই সময় এগিয়ে চলল, সব কাজেই অন্যমনা ক'রে দিতে লাগল। মনে হতে লাগল, এত সুন্দর একটা পরিকল্পনার মধ্যে কোথায় মস্ত বড় একটা শূন্যতা থেকে গেছে; এমন একটা আনন্দের দিনে বিপাশা পাশে থাকলে ভালো হোত। শূন্যতাটা যে তারই অভাবে এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠতে বাকি রইল না।

যেটা এই সেদিন পর্যন্ত একটা মুক্তির রূপ নিয়ে উঠেছিল—বিপাশাকে ভুলবার একটা সাধন হিসাবেই অঙ্গনাকে জড়িয়ে ধরা—সেটা একটা আশঙ্কাতেই যেন পরিণত হতে চলেছে: এই যে আরও নিবিড়ভাবে অঙ্গনাকে পেতে চলেছে, এতে বিপাশা একেবারেই লুপ্ত হয়ে যাবে না তো! সে আবার কি এক পরিণতি!

তাই যদি হয় তো একবার শেষ দেখা দেখেই আসুক তাকে। নিজের অদৃষ্টলিপির কথা ব'লে ক্ষমা চেয়ে নিক তার।

সমস্ত দিনই কিছুতে আর মন বসাতে পারলনা। যেন যান্ত্রিকভাবে কেটে যাচ্ছে।...সুচিত্রা ওকে পেয়ে আজকাল প্রায়ই ঘটা ক'রে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। একটা মেয়ের ক'বার বিয়ে দেবে, রসিকতা ক'রে একটু জানবার চেষ্টা করল, জমল না। বিকালের দিকে খানিকটা এদিক-ওদিক করে, কাজলদিঘির বাগানটা ঘুরে, সন্ধ্যার একটু আগে ঘাটে গিয়ে বসল।

সন্ধ্যার সময় ফুলের গন্ধ বাড়ে, ছড়িয়ে পড়ে; ওদেরও বোধহয় ওটা কাউকে বন্দনার সময়। নূতন বাগান ক'রতে ঘাট থেকে খানিকটা দূরে হু'ধারে দুটো বড় বড় চাঁপা ফুলের গাছ পুঁতেছিল। ক'মাসে বেড়ে গিয়ে দু'পাঁচটা ক'রে ফুল দিতে আরম্ভ,

করেছে। চাঁপার গন্ধটা ভালোবাসে বীরেশ। এমনি ভালোবাসত, তারপর বিপাশা একদিন ওটার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে দিল, ইচ্ছা ক'রেই হোক বা অনিচ্ছাকৃত আকস্মিকভাবেই। অনেক আগেকার কথা।—

একদিন কি একটা কারণে সকাল-সকাল কলেজের ছুটি হ'য়ে যাওয়ায় বিপাশা বাড়ি না গিয়ে চিত্রার সঙ্গে কলোনীর বাসাতেই চলে এল, যেমন ইদানীং সুযোগ পেলেই করত। চিত্রা বলল— "তুই বোস বিপু, আমি নীচে থেকে মুখ হাত ধুয়ে আসি। তুই যাবি ?"

"তুই হ'য়ে আয় আগে।"—বিপাশা উত্তর করল।

সাবান তোয়ালে নিয়ে নেমে গেল চিত্রা।

ও নেমে যেতে বীরেশ বার দুই নিঃশ্বাস টেনে বলল—

"চাঁপা ফুলের গন্ধ পাচ্ছি যেন···তোমরা আসার সঙ্গেই।"

বিপাশা বারান্দার রেলিঙের ওদিক থেকে মুখটা একটু বাড়িয়ে, ব্লাউজের ভেতর হাত দিয়ে দুটো ফুল বের করে বলল—"নেবেন ?" উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বলল— "ক্ষণা ক্লাসে এনেছিল, ওদের গাছ আছে, চিত্রাকেও দুটো দিয়েছে।"

"বড্ড ভালো লাগে আমার, সব ফুলের চেয়েও বলতে পারি।"

একটু দ্বিধা হয়েছিলই বীরেশের, তারপর সেও নীচের থেকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে বলল—"সরে এসো।···আচ্ছা থাক্।"

নিজেই দাঁড়িয়ে প'ড়ে একটা ফুল ওর এলো খোঁপার ওপর গুঁজে দিল।

এ-স্মৃতির আর একটু আছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়ির ধাপে চিত্রার পায়ের শব্দ উঠল। উঠে এসে একটু হকচকিয়ে গিয়েই প্রথম কথা—"উঠে গেছে তো ফুলটা খোঁপায় এর মধ্যে !"

পরক্ষণেই, দাদা যেন আবার উল্টো না ভেবে ব'সে, এইভাবে তারই দিকে চেয়ে—"কী শখ বাবা মেয়ের !···যা এবার।"—বলে সাবান তোয়ালে রেখে ভেতরে চলে গেল।

চিত্রা কি টের পেয়েছিল? অন্তত, তার সেই প্রথম জেনে-ফেলার খুব কাছাকাছি এসে পড়া।...এবার তো তাকে জানানই ঠিক করা হয়েছে।

চাঁপার গন্ধের সঙ্গে আর এক কি ফুলের গন্ধ মিশে গেছে। আরও যেন মন্থর হ'য়ে উঠেছে বাতাসটা। এতগুলি স্মৃতির তন্তু দিয়ে যে জড়িয়ে ফেলেছে তাকে সরিয়ে ফেলা যায় কি করে?...অঙ্গনার ব্যাপারটাই হঠাৎ এসে খেয়ালের মাথায় বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গেল নাকি? সে তার সাহিত্য পত্রিকা নিয়ে যদি দু'জনের মাঝখানে একটা অন্তরায়ই হ'য়ে দাঁড়ায়!

এই চিন্তাটা নিয়ে অগ্রসর হ'তে হ'তে মনটা এক জায়গায় এসে যেন স্তব্ধ, নিশ্চল হয়ে গেল।...এই তো হয়ে গেছে।—এই তো পেয়ে গেছে সব কথার শেষ কথাটি। অন্তরায় না হয়ে তো বন্ধনই হয়ে থাকতে পারে দু'জনকে এক ক'রে, দু'জনের হাতে মালাবন্ধন।...ও যাবে এবার। বলবে—এসো আমরা দু'জনের অদৃষ্টলিপিকে মেনে নিয়ে তাকে ব্যর্থ করে দিই। পরাভূত করে দিই। বিবাহ নয়, প্রয়োজনই বা কি এমন তার? তুমি যেমন আছ তেমনি থাকো, আমিও যেমন আছি তেমনি থেকে যাব। আমাদেব বেদনা আমরা 'অঙ্গনার' পাতায় ঢেলে যাই, তুমি তোমার কবিতায়, আমি আমার গল্পে উপন্যাসে—দু'জন ছাড়া কেউ বুঝবে না—সমাজ, ধর্ম ও জাতিত্বের সৌধ থেকে একটি বালিকণা খসে পড়বে না—তারপর যা এজন্মে পাওয়া গেলনা, যদি জন্মান্তরে...

অশ্রু নেমে এসেছে। কোঁচার ফুলটা হাতে গুটিয়ে মুখে চেপে অনেকক্ষণ ব'সে রইল বীরেশ, তারপর একসময় উঠে প'ড়ে দীঘির জলে ভালো ক'রে মুখ হাত ধুয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

একটু ভাবালুতা এসে পড়েছিল, নিজের কাছেই অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে। তবে স্থির চিন্তাতেও বুঝল, তাদের দু'জনের এই

এখন পথ। এর মধ্যে খানিকটা ভাবালুতা থাকলেও—আর তা থাকবেই—ভাবালুতা বাস্তব-সম্মত, নির্দোষ; তাদের সম্পর্কটুকু শাশ্বত ক'রে রেখে। আর সবার সঙ্গেই নিঃসম্পর্কিত।

আর যাওয়া না-যাওয়ার কোন প্রশ্নই রইল না। এইবার যাবে যত তাড়াতাড়ি হয়, দেরিই হয়ে গেছে।

আরও একটু দেরি হয়েই গেল।

পরের দিন হেডমাস্টারের বাড়ি যাচ্ছিল। একটা দিন বাদ পড়ে গেছে, সে কথাও, তা ছাড়া ওঁদের কাছ থেকে ছুটিও নিয়ে আসতে হবে—দিনচারেকের; বলে আসবে আরও হয়তো দু'তিন দিন লেগে যেতে পারে।

আস্তে আস্তেই যাচ্ছিল। গতকাল ঘাটের সংকল্পের পর থেকে মনটা হালকা আছে। হেডমাস্টারমশায়ের বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে, বাড়ির চাকর দামোদর পেছনে থেকে হেঁকে বলল—"একটু দাঁড়াবেন।"

ঘুরে ছাখে, বেশ হন্তদন্ত হয়েই এগিয়ে আসছে।

দু'পা পেছিয়েই গেল বীরেশ। প্রশ্ন করল—"কিরে? অমন করে…"

"মা কিরকম করছেন!"

"মা! এই তো দেখে এলাম…"

"আজ্ঞে, ইরিরিই মধ্যে…"

"তুই ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যা। আমি এক্ষুনি মাস্টারমশাইকে নিয়ে এসে পড়ছি।" অপরেশ যেমন ছিলেন প্রায় সেইরকমই বেরিয়ে পড়লেন। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়ার দিকেই দু'জনের মন থাকায় কথা কম হোল। তার মধ্যে বীরেশ শুনল, উনি যে সেদিন প্রশ্ন করলেন—মা কেমন আছেন, তার কারণ, ক'দিন আগে বীরেশ যে কলোনীতে যায়—সকালবেলা গিয়েছিল—

তুপুর থেকেই দাক্ষ্যায়ণী অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। ও ফিরে আসতে বাড়িতে ওকে বলা হয়নি দেখে উনিও কথাটা মুখ থেকে বেরুবার আগেই সামলে নেন। এক-তু'দিনের বাতিক জ্বর মনে হ'তে উনি আর জিজ্ঞেসও করেননি। তবে, এবার যেন বড় তাড়াতাড়ি হোল, চিকিৎসাটা একটু ভালো ক'রে করানো দরকার।

দাক্ষ্যায়ণী অচৈতন্য হ'য়েই পড়ে ছিলেন। দামোদর ডাক্তার নিয়ে আগে পৌঁছে গেছে। গিয়ে জানা গেল জ্বর থার্মোমিটারে ১০৩°-র ওপর উঠে গেছে, একটু সাড় হলেই বিড়বিড় ক'রে কি বলছেন।

একবার হোল সাড় একটু। কি খোঁজার মতো ক'রে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, ঠোঁট নেড়ে, অস্পষ্টভাবে বীরুর নাম করলেন মনে হওয়াতে বীরেশ ঝুঁকে প'ড়ে বলল—"মা, এই যে আমি রয়েছি।"

চোখ তুলে চাইলেন, দৃষ্টিতে ঈষৎ চৈতন্যের আভাস। একটু পরে বাঁ হাতটা তুলতে বীরেশ নিজের ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। মুঠো ক'রে ধরলেন। একটু পরে ডান হাতটাও এগিয়ে এনে তু'হাতে ধরে একটু বুকের কাছে টেনে নিলেন।

জ্বরটা যেমন হঠাৎ এসেছিল এবারেও তেমনি হঠাৎ সেরে গেল; তৃতীয় দিনেই।

তবে, চিকিৎসার ব্যবস্থা এবার ভালোভাবেই করল বীরেশ। কলকাতা থেকে ভালো ডাক্তার এনে। তিনিও বয়সের বাতিক জ্বর ব'লেই সাব্যস্ত করলেন। এদিকের ইতিহাস পূর্বাপর শুনে বললেন, তুর্বল শরীরের ওপর কোন একটা স্থায়ী আশঙ্কা মনে চেপে ব'সে খানিকটা ক্ষতি করছে। উত্তেজনার কোন কারণ না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রেখে যেতে হবে।

এবার বেশ তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে লাগলেন দাক্ষ্যায়ণী। ওষুধের গুণে শরীরটায় বেশ ভালো রকম পরিবর্তন দেখা যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মনের স্ফূর্তি। একটা যেন নিঝুমভাব সর্বদাই সব কিছুর মধ্যে যে লেগে থাকত সেটা কেটে গিয়ে খানিকটা,

দেখাশুনা ক'রে বেড়ান আজকাল, ডেকে গল্প করেন, এমনকি নিজেও প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে গল্প ক'রে এলেন ক'দিন। মাকে এমনভাবে, বাবার মৃত্যুর পর আর দেখেনি বীরেশ। বিপাশা সম্বন্ধে বেশ ভালোভাবে মনস্থির ক'রে নিয়ে ওরও আর বিশেষ তাড়া নেই, দেখতেই চায়, মাকে কতটা তুলে নিতে পারা যায়।

দিন কুড়ি কেটে গেল। এর মধ্যে হু'বার ধরণী আর চিত্রা দাক্ষ্যায়ণীকে দেখে যাওয়ার জন্য এসে যাওয়ায় আর তাগিদ রইল না বীরেশের। তারপর একদিন দাক্ষ্যায়ণীই ওকে খাওয়াতে বসে আর সব কথার মধ্যে হঠাৎ মনে পড়ে যেতে বললেন--"হ্যাঁরে, সেবারে কি একটা বেশিরকম দরকার প'ড়ে যেতে একবার কলোনী যাবার কথা বলেছিলি না? তা, একবার হ'য়ে আয় না।"

"বেশী রকম দরকার"-এর কথাতেই বীরেশের গলায় একটু ভাত আটকে গিয়ে থাকবে, একটু ঢোঁক গিলে বলল—"সে হ'বে'খন। তুমি একটু ভালো ক'রে সেরে ওঠ আগে। কথায় কথায় যেমন বিছানা নিচ্ছ!"

"নাও! ও চায় এখন মা স্থহ্-মোলুর মতন ছুটোছুটি ক'রে বেড়াক!···বেশ আছি আমি, তুই একবার এই সময় ঘুরে আয়। রুগীর সঙ্গে রুগী হ'য়ে বদ্ধ হ'য়ে গেছিস।"

বারো

গাড়িটা বিকালের আগেই গিয়ে পৌঁছল স্টেশনে। গাড়িতেই একজনের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় বাড়ির ঠিকানা, দূরত্ব ভালো ক'রে জেনে নিয়েছিল, স্টেশনের ওয়েটিংরুমে খানিকটা কাটিয়ে, ইচ্ছা ক'রেই দেরি করে একটা ঠিকাগাড়ি ভাড়া ক'রে সন্ধ্যার সময় গিয়ে নামল বাড়ির সামনে।

পাড়াটা একটু একটেরেয়। বাড়িগুলা ছাড়া ছাড়া। তবে, ভালোই বেশির ভাগ। অবস্থাপন্ন লোকেদের পল্লী মনে হয়। যে বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সেটা ছোট, একতলা, বেশ ছিমছাম। সামনে হু'ধারে একটু বাগানের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। ভাড়া চুকিয়ে এগিয়ে যেতে দেখল প্রভা বলে সেদিনের মেয়েটি ঘর থেকে বারান্দায় সিঁড়ির মাথায় এগিয়ে এসেছে। হু'ধাপ নেমে এসে নমস্কার ক'রে বলল -"আসুন। বড় দেরি ক'রে ফেলেছেন। আমরা তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম..."

"বিপাশা...?" একটা উৎসুক প্রশ্ন মুখ থেকে প্রায় বেরিয়েই পড়েছিল।

প্রভা বলল—"না, সে ভালোই আছে...সব ঠিকই আছে। আসুন ভেতরে। উনি এখনও আসেননি। দেরিই হয় ওঁর। কাজের চাপ পড়লে বেশিই দেরি হয় কোন কোন দিন। তা আমি খবর দিয়ে পাঠাচ্ছি। আছেন কি রকম বলুন আগে।·· বসুন।"

ভালো ক'রে সাজানো বৈঠকখানা। মাঝখানে একটা গোল টেবিলের চারিদিকে চারটে কুশন চেয়ার, হুটোতে মুখোমুখি হয়ে বসল হু'জনে। খানিকটা দেরির কারণ, রেলের যাত্রা—এইসব নিয়ে গল্পের মধ্যে চাকরকে স্নানাগার ঠিক ক'রতে ব'লে দিয়েছে, সে ঠিকঠাক ক'রে এলে, বীরেশ হ্যাণ্ডব্যাগটা নিয়ে গিয়ে জামাকাপড় বদলে এসে বসল। ইতিমধ্যে চা-জলযোগের সরঞ্জাম টেবিলে সাজানো হ'য়ে গেছে, প্রভার অনুরোধে বসে গেল।

বাড়িতে আর লোক নেই। কাজের দিকে ঐ চাকরটি। সব ঠিকঠাক ক'রে কর্তৃর নির্দেশে সে সাইকেলে ক'রে ভদ্রলোককে খবর দিতে গেল। একটু পরেই এসে জানাল—সে আফিসের কাজে কোথায় সহরের বাইরে গেছে, আসতে আজ একটু দেরিই হ'তে পারে।

প্রভা একটু ম্লান হেসে বলল—"খবর দেওয়া থাকলে আটকে রাখা যেত।"

বীরেশও সেইভাবে হেসে বলল—"কোন উপায় ছিল না।"

মার অসুখের কথাটা আর বলল না। জলযোগ শেষ ক'রে, চায়ের কাপ তুলে নিয়ে বলল—"বুঝছি, আপনাদের খানিকটা অসুবিধায় ফেললাম না জানিয়ে এসে।"

"মোটেই নয়। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন।···তবে একটা অসুবিধে বোধহয় একটু হবে। আপনার দিকেই।"

মুখের দিকে চেয়ে সেইরকম একটু ম্লান হাসতে হাসতে বীরেশ প্রশ্ন করল—"কি?"

"বলছিলাম, জমি ঠিক করাই আছে, সেদিক দিয়ে ভাবনা নেই। তবে, আসছেন জানা থাকলে আর ওয়েট্ করতে হোত না।"

একটু হাসি ঠোঁটে লেগেই আছে।

"বেশি দেরি হবে?"—গলাটা সহজ রাখার চেষ্টা ক'রেই প্রশ্ন করল বীরেশ।

"এসব ক্ষেত্রে একদিন তো একমাস মনে হওয়ার কথা।"—এবার হাসিটা আর একটু স্পষ্ট এবং অর্থপূর্ণ। একটু থেমে কথাও একটু স্পষ্ট ক'রে দিল—"লাভার্সদের কথা বলছি।···কথা হচ্ছে, একটু বুঝেসুঝেই মিটিংটা ক'রতে হবে তো?"

একটু অস্বস্তির হাসি দিয়ে বীরেশ স্বীকার করে নিয়ে বলল—"তা তো বটেই।"

"আর একটা বড় কথা। আসল কথাই বলতে হয়।"

এবার মুখটা বেশ গম্ভীর হয়ে উঠল। বীরেশ প্রশ্ন করল—"কি কথা?"

"তাও ব'লে দিতে হবে? একেবারে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন কি? রেজিষ্ট্রি আফিস··তারপর···"

বীরেশ ঠোঁট দুটো জিভে ভিজিয়ে কিছু বলবার আগেই বলল—"তাহ'লে তো এত শীগগির হবেই না। অন্তত দুটো দিন আর···"

বীরেশ বলল—"হ্যাঁ, তাই। প্রস্তুত হয়ে তো আসিনি। এবার দেখা ক'রে···"

"তাহলে ঠিক আছে।"

মাথার ওপর একটা সুদৃশ্য মাতুরের টানাপাখা। বীরেশের দৃষ্টিটা আপনা হতেই সেটার দিকে গিয়ে পড়ল, বলল—"বারান্দায় গিয়ে বসলে হয় না?"

"তাই ঠিক হবে। ভেতরটা stuffy। দেখুন না, আজ আবার 'বয়'টা আসেনি। তাই বলছিলাম, জানা থাকলে অন্তত আফিসের পাংখা-পুলারটাকে আনিয়ে রাখা যেত।"

হাঁক দিল—"বেয়ারা!"

লোকটা এলে বলল—"দুটো চেয়ার বারান্দায় দিয়ে আয়। তিনটেই। উনি যদি এসে পড়েন।...আসুন।"

বীরেশকে নিয়ে বাইরে চলে গেল। তারপর ও চেয়ারগুলা পেতে দিলে বসতে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে উঠে বলল—"একটু বসুন, লোকটাকে একটু ডিরেক্‌শন দিয়ে আসি। আমাদের কমবাইন্‌ড্‌ হ্যাণ্ড, বুঝতেই পারেন।"

ঘুরেই আবার ঘাড় ফিরিয়ে বলল—"হ্যাঁ, সে কথাও জিজ্ঞেস ক'রে নেওয়া ভালো, ওদিকে আপনার কোন প্রেজুডিস্‌ নেই তো? তাহলে আমায় নিজেকেই হেঁসেলে ঢুকতে হয়।"

"না, সেরকম কিছু..."

"ভয় হয়। আবার জেনেশুনে যেমন বামনের মেয়েই বেছে নিয়েছেন!"

ঘুরে আবার ঘাড় ফিরিয়ে হেসে বলল—"মাফ করবেন।...তবে, অধিকার আছে বলবার আমার, বিপাশা আমায় 'দিদি' বলে।"

একটা নিঃশ্বাস বুকে জমা ক'রে বসে ছিল বীরেশ, ও শাড়ি ঘুরিয়ে চ'লে গেলে, আস্তে আস্তে সেটা নামিয়ে দিয়ে বুকটা হালকা করল।

বাড়িটাতে পা দেওয়া পর্যন্ত একটা অস্বস্তি কতকটা অহেতুক-ভাবেই মনটা অধিকার ক'রে নিয়েছিল, তারপর মেয়েটির কথাবার্তা। সেদিন কলোনীতেও রুচিকর বোধ হয়নি, বিশেষ ক'রে সঙ্গীকে ঠেলে

ওর পুরুষালি ভাব, ঐ যেন প্রধান। আজ যেন আরও হায়া-সঙ্কোচ হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে। তারপর এই বাইরে এসে রেজেষ্টারি-বিবাহ ক'রে —দুজনে অদৃশ্য হওয়া—সমস্ত চিত্তটুকু স্পষ্ট হ'য়ে উঠে গা যেন আরও ঘিন্ ঘিন্ ক'রে উঠল। বাইরে একটা ফুরফুরে হাওয়া আছে, তবু বার দুই রুমাল বের ক'রে কপালটা মুছে নিল বীরেশ। এক্ষুণি আসবে; বিপাশার সঙ্গে সম্পর্কের যে ইংগিত দিয়ে গেল, তার সুযোগে প্রভা আরও কি ধরণের রসিকতার সুযোগ নিতে পারে ভেবে আরও বেড়েই যাচ্ছে অস্বস্তিটা। ভদ্রলোককে যেন একটু সংযত বা নিরীহ মনে হয়েছিল, তবে নিজের ঘরে আবার তার স্বরূপটা কি, সে-আশঙ্কা থাকলেও বীরেশের মনে হ'চ্ছে সে এসে পড়লে অন্তত একটা ভরসা হয়, তা সে যে-ভাবেই হোক।

প্রভা এল। ঘরের মধ্যেই নজর পড়তে বুকটা ছাঁত ক'রে উঠল। এবার হায়া ঢাকবার জন্যে আবার সেই বেহায়াপনা, অবশ্য, বোধহয় তার দৃষ্টিতেই, গাঁয়ের মানুষ ব'লেই। এতক্ষণ শাড়িটাকে একটু ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে পরায় অতটা খেয়াল হয়নি; এবার সেই এ্যাপ্রনটা সামনে ঝুলিয়ে নিয়েছে অন্তঃসত্ত্বা মেমেদের মতো।

যেন নূতন কিছুই হয়নি এইরকম একটা ভাব দেখাবার জন্য বীরেশই একটু হেসে বলল—"তা আপনার কম্বাইন্ড্ হ্যাণ্ড্ পিক-আপ করছে কিছু? না, মেহনতই সার?"

"খুব খারাপ নয়। দেখতেই পাবেন।"— ব'লতে ব'লতেই বসতে গিয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল—"ঐ, উনিও এসে গেছেন।"

একটা ফীটন গাড়ি গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, মেয়েটির সঙ্গে বীরেশও দাঁড়িয়ে পড়ল। যতীনই। এগিয়ে এলে প্রভা বলল—"এই এসে গেছেন ইনি।'

যতীন এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে শেক-হ্যাণ্ড ক'রে বলল—"হাউ ক্রুয়েল অব্ ইউ? (How cruel of you?)···ওঁকে বলেছ সব?"

"শুনবেনই।"—উত্তর করল প্রভা।

তিনজনে চেয়ার তিনটায় বসল।

এবার বীরেশ সতর্কই ছিল, গোড়া থেকে আলাপটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিল।—"ইনি যেমন বলছেন, একটু টাইম দেওয়া সম্ভব—ব'লে তো আসিনি। তাহলে, উনি এদিকে ব্যবস্থা ক'রতে থাকুন, আমি মুর্শিদাবাদটা না হয় ঘুরে আসিনা। দেখবার জায়গা, সুযোগ তো হয় না আসবার।"

এরপর যা যা দেখবার সেইসব সম্বন্ধে প্রশ্ন-উত্তরে গল্প শুরু ক'রে দিল, আহারের পর শুতে যাওয়া পর্যন্ত।

পরদিন আহারাদির পর বেরিয়ে প'ড়ে সমস্ত দিনটা মুর্শিদাবাদে কাটিয়ে দিল। যতীন রায় অফিসের ফীটন আর সঙ্গে একজন লোক দিয়েছিল, সে সব ভালো করে দেখিয়ে শুনিয়ে দিল। সন্ধ্যার সময় এলে প্রভা হেসে বলল—"নিন্, আপনার যাত্রা ভালো, আর ওয়েট্ ক'রতে হবে না; জমি ঠিক করে রেখেছি, কাল দুপুরেই আপনার কাজ হ'য়ে যাবে।"

—ঠোঁটের কোণে একটু হাসল।

'জমি' ভালো ক'রেই তৈরি করে রেখেছে।

বিপাশা ওর কাছে সকালে পড়তে আসে। পরীক্ষার বছর, প্রভা অসুখে পড়ে গেলে, একটা চিঠি পাঠিয়ে দেয়, বিপাশা সেটা বাড়িতে দেখিয়ে দুপুরে এসে প'ড়ে যায়। রাত্রে একেবারেই মানা। 'অসুখ' ক'রে প্রভা কাল আর পরশু স্কুল থেকে দু'দিনের ছুটি নিয়ে বিপাশাকে জানিয়ে দিয়েছে। কাল সে দুপুরে আসবে।

জমি মই-দেওয়া জমির মতোই পরিষ্কার, তকতকে। যতীন রায় তার আফিসে। প্রভা ডাক্তারখানায়, লেডি ডাক্তারের কাছেই, শরীরের যা অবস্থা, একরকম হঠাৎ দরকার হ'য়ে পড়ে কন্‌সল্‌টেশন্। চাকরটাকে একটা কাজ দিয়ে গেছে; দূরে, এবং বেশ সময় লাগাবার মতো। বলা আছে, দিদিমণি এলে সে চ'লে যাবে। ততক্ষণ দেখবে 'জামাই-বাবু'র কোন রকম অসুবিধা যেন না হয়।

তেরো

কলেজের ক্লাস অনুযায়ী আগে-পিছে ক'রে আসে বিপাশা, আড়াইটার সময় এসে উপস্থিত হোল। বেয়ারা বীরেশের অনুমতি নিয়ে তার নির্দিষ্ট কাজে চলে গেল।

একটা বইয়ের মধ্যে আঙুল দিয়ে তীব্র উৎকণ্ঠা নিয়ে পাশের একটা সোফায় শুয়ে ছিল বীরেশ, বিপাশাকে চৌকাঠের ওপর দেখেই উঠে প'ড়ে ব'লে উঠল—"বিপাশা ?···বিপু ?···এ কী হয়ে গেছ !"

বিপাশা কোন রকমে একটু টলতে টলতেই টেবিলের সামনে চেয়ারটায় গিয়ে ব'সে পড়ল আলুথালু হ'য়ে। সঙ্গে সঙ্গে বই-খাতা রেখে তার ওপর মাথা চেপে হু হু ক'রে কেঁদে উঠল।

বীরেশ সোফা থেকে নেমে পাশে গিয়ে দাঁড়াল। গায়ে বড় একটা হাত দিত না, কলোনীর শেষ সাক্ষাতের পর আরও সংযত ক'রে নিয়েছে নিজেকে। একটু চুপ ক'রে দাঁড়াল, তারপর ওর পিঠে হাত দিয়ে একটু মুখের দিকে ঝুঁকে বলল—"চুপ করো, চুপ করো বিপু।"

আরও ফুলে ফুলেই কেঁদে উঠতে দেখে বলল—"চুপ করো, লক্ষ্মীটি। এই তো এসেছি। কি ক'রে আসতাম ? তোমার প্রথম চিঠিতে তো আমায় বারণই ক'রে দিয়েছিলে, ঠিকানা লিখে কেটে দিয়েছিলে···"

"শুধু সেইটেই ধরে বসে আছেন ?—আমার যে কী করে কাটল —আটটা মাস—উঃ—কী সন্দেহ—কী অপমান !—কী নির্যাতন ! আমি কী করেছি ? -সবার কাছে দুষী—শুধু একজন যে বুঝবে আমায়—সে পর্যন্ত···উঃ !—কী ক'রে যে বেঁচে আছি···উঃ !···"

ভাঙা-ভাঙা কথায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আর যেন শেষ ক'রে উঠতে পারে না। বীরেশের গলাটাও বন্ধ হয়ে এসেছে।—"চুপ করো, চুপ করো, লক্ষ্মীটি"—কোন রকমে সান্ত্বনাটুকু বের ক'রে কেঁদেই যেতে দিল।

অনেকক্ষণ পরে বই-খাতার ওপর থেকে মাথাটা তুলে ওর দিকে চাইল বিপাশা, চোখের পাপড়িগুলা ভিজে সেঁটে সেঁটে গেছে। বীরেশ প্রশ্ন করল—"কেন ডেকে পাঠিয়েছ আমায় ?"

"এই কথাই জিজ্ঞেস করতে এসেছেন—এতদিন পরে ?"—ওর ডান হাতটা টেবিলের ওপর ছিল, ছু'হাতে চেপে ধরে আবার কান্নায় ভেঙে পড়তে যাচ্ছিল, বীরেশ পিঠের হাতটা চেপে এবার আরও ঝুঁকে প'ড়ে বলল—"চুপ করো, ভুল হ'য়ে গেছে আমার। এই প্রশ্ন নিয়েই কখনও আসতে পারি ? আমার শেষ কথা তো জানো—ভেবে দেখে তুমি যা বলবে আমায়, তাই হবে। এই আট মাসের প্রতিটি দিন আমারই যে কী ক'রে কেটেছে—লুকুবনা বিপু, চিঠি পাইনা, কোন খবর নেই—পথটা এমন যে প্রতি পদেই বিপদ—আমার চেয়ে তোমার বিপদই বেশি—লুকুব না, হতাশ হ'য়ে এও ভেবেছি, তা'হলে মেনে নিই অদৃষ্টকে—জীবনভোর ভুলে যাওয়ার চেষ্টা নিয়ে কাটিয়ে দিই—একবারটি কোনরকমে দেখা ক'রে তোমাকেও বলি—এই যখন আমাদের বিধিলিপি···"

গলা ভেঙে এল। মাথা ঝুঁকিয়ে ওর হাত ছুটো নিজের কপালে চেপে ব'সে রইল। একটু পবে হাত ছুটো তপ্ত অশ্রুতে ভিজে আসতে বিপাশা মুখটা আস্তে আস্তে তুলে বলল—"উঠুন, চুপ করুন।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসল। ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল—"আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন।"

টেবিলের পাশের চেয়ারটা হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে বসল বীরেশ। বলল—"কি রকম আছ এখানে আগে তাই বলো।···সে-থাকার কথা বলছিনা, সে তো বুঝতেই পারছি। বলছি, এঁদের ব্যবস্থা কি রকম, ব্যবহার কি রকম ?···বড্ড রোগা হয়ে গেছ তুমি।"

"কৈ, মনে হয়না তো।—আপনি অনেকদিন পরে দেখছেন তাই—"

—ওর মুখের ওপর দৃষ্টি তুলে অপ্রতিভভাবে একটু হাসল; দেহের কথা উঠলেই মেয়েরা যেমন একটু হ'য়ে যায়।

"না, হয়েছ বৈকি।"—একটা হাত মুঠায় তুলে নিয়ে বলল বীরেশ।

একটু চেয়েই রইল ওর আ-নমিত মুখের দিকে।

বেশ একটু শীর্ণা হয়ে গেছে বিপাশা। রগের কাছটায় একটু ব'সে গেছে। ওর ভাসা-ভাসা চোখের চারিদিকে একটা খুব হালকা ছায়ার মতো ছিল, মেয়েরা যাকে 'স্বভাব ক'জল' বলে, সেটা একটু গাঢ় হয়ে উঠে দৃষ্টির ক্লান্তির সঙ্গে মিলে মুখচ্ছাবিটাকে বড় করুণ ক'রে তুলেছে যেন। কথাটা ব'লেই সঙ্কোচে মুখটা একটু ঘুরিয়ে নেওয়ার সুযোগে দেখে দেখে বীরেশের মনে হচ্ছে—যেন একটি তপঃক্ষীণা ব্রতচারিণী। এর আগে, যখনই ওকে দেখেছে, কোন এক সময় পাওয়ার দৃষ্টিতেই দেখেছে। আজ ওকে দেখে দেখে মনটা এই ভেবে টনটন ক'রে উঠছে যে, যদি পায়ই তো, কলুষের মধ্যে দিয়ে, হীন চক্রান্তের মধ্যে দিয়ে পেতে হবে এই অমূল্য সম্পদ?

না দেখেও দৃষ্টির স্পর্শ মন দিয়ে অনুভব করা যায়, বিপাশা এক সময় ঘুরে চাইল, একটু সলজ্জ হাসি নিয়ে প্রশ্ন করল—"কী দেখছেন অমন ক'রে?"

"দেখছি"—একটু আচম্বিতে ব'লে উত্তরটা যেন খুঁজে নিয়ে বীরেশ বলল—"দেখছি···কী হয়ে গেছ তুমি বিপু!···"

"সেই পুরনো কথা?"—এবার হেসে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

হাসি দিয়ে কান্না চাপতে গিয়ে আরও যেন আতুর, অসহায় দেখাচ্ছে, বীরেশ কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"তোমায় যে কথা জিজ্ঞেস করছিলাম—এখুনি আবার এসে পড়বে মেয়েটি।"

"তা আসবে না; সাজানো তো।···কী যে মনে হচ্ছে! কী যে ঘিন ঘিন করে গা! কিন্তু করিই বা কি?···"

একটুতেই চোখে জল বেরিয়ে আসছে; মুছে নিয়ে প্রশ্ন করল—"কোন্ দিকটা আগে বলি, এক আধদিনের কথা নয় তো।"

"তুমি আগে এর কথাই বলো।"

—করুণ দৈনন্দিন কাহিনীর যত কম বিবরণ দিতে হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বলল—"বাড়ির দিকটাকে খানিকটা আন্দাজ ক'রে নিতে পারা যায়; একটা সন্দেহ—সতর্কতার দৃষ্টি ঘিরে থাকবেই।...

"সে যে আবার কী যন্ত্রণা! কী অপমান!..."

"জানাজানি হয়ে গিয়েছিল তোমার এখানে আসার কারণটা?"

"না, জানেন শুধু দাদাই। তিনি নিজে খুব উঁচু দরের লোক। নিজের কাছেই রেখেছেন কথাটা। তবে, বৌদিদি অন্য ধরণের। আমি আপনাকে যে চিঠি লিখি তাই থেকেই বুঝেছিলেন আমি নিজে অদৃষ্টকে মেনেই নিয়েছিলাম। বৌদিদি একেবারে অন্য প্রকৃতির মানুষ। ওঁর রাগটা আরম্ভ হোল—দাদা আমাদের কাছ থেকে খবর কিছু যে নিতে চাননি, সেই থেকে। কয়েকদিন পর থেকেই টিক্‌টিক্ আরম্ভ হোল। তাই থেকে উনি আবিষ্কার করলেন আমি, আর কিছু দোষ না হোক, কলেজের মেয়ে, বেহায়া; এর নাকি অনেক প্রমাণ পেয়েছেন, বিয়ের পর অরু দিদির বর আসতে।"

হঠাৎ চুপ করে গেল বিপাশা। বীরেশ বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করতে বলল—"সেটা ক্রমে এমন অবস্থায় দাঁড়াল—একটা কিছু পেলেই আঁতে ঘা দিয়ে চিপটেন কাটা—সে আর সইতে না পেরে একদিন..."

"কি একদিন বিপু?"—সশঙ্ক প্রশ্ন ক'রে উঠল বীরেশ।

দুই হাতে মুখ ঢেকে আবার হু হু ক'রে কেঁদে উঠে ভাঙা ভাঙা স্বরে ব'লে যেতে লাগল বিপাশা—"সবার সমস্যাই মিটে যেত। কিন্তু পারলাম না—ধরা পড়ে গেলাম—আপনি বিশ্বাস করুন—বিশ্বাস করুন আপনি—আমি জীবনে একবারই বেহায়া হয়েছি—"

কোথাকার অভিমান কোথায় গিয়ে প'ড়ে, বীরেশ পিঠে হাতটা রেখে বলল—"আমি তোমায় অবিশ্বাস করব বিপু? তোমার বিশ্বাস আমি কি ক'রে রাখব, পারব কিনা রাখতে, সেই আমার অষ্টপ্রহর

চিন্তা—তুমি এত অধৈর্য হয়ো না—এত বড় আঘাতটা দিয়ে যেওনা আমায়।”

আবেগটা চেপে একটু চুপ ক'রে থেকে বলল—“চুপ করো। যাক ওখানকার কথা, অনেকটা তো বুঝলাম; তুমি এদিকের কথা বলো। মেয়েটি মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখার ব্যবস্থা ক'রে দিল বটে, কিন্তু—কি বলব?—বেশ যেন পরিচ্ছন্ন নয় ব্যাপারটা।”

“পরিচ্ছন্ন তো নয়ই—” চোখ মুছে একটু চুপ ক'রে থাকার পর আরম্ভ করল বিপাশা—“ঐ ব্যাপারটার পর বৌদিদি সামলে গেলেন, এর মধ্যে দাদাও একদিন আমায় ডেকে নিয়ে অনেক বোঝালেন…”

“আমাদের কথা নিয়ে?”—উৎসুক প্রশ্ন করল বীরেশ।

“একেবারে নয়। সাধারণভাবে একটা মেয়ের জীবন, একটা ছাত্রীর কিভাবে চলতে হবে। এমনভাবে বলে গেলেন, যেন কলোনীর ব্যাপারটা ওঁর একেবারে জানা নেই। তবে, বিচক্ষণ মানুষ, তারই মধ্যে আজকাল মেয়েদের—বিশেষ ক'রে কলেজের মেয়েদের মুক্তজীবনের ভুলভ্রান্তির কথা, বিপদের কথা ব'লে এমনভাবে তাঁর উপদেশটা দাঁড় করালেন যে—আপনার কাছে অস্বীকার করব না—আমার জীবনের গতিই বোধহয় বদলে যেত, সেদিন থেকে।”

“কি রকম?”

“তার পরদিনই আপনাকে একটা চিঠি লিখি আমি।”

“সত্যি নাকি? কৈ, পাইনি তো সে চিঠি।”—বিস্মিতভাবে বলল বীরেশ।

একটু অপ্রতিভ হাসির সঙ্গে বিপাশা বলল—“তার কারণ পোস্ট করা হয়নি। আমার প্রথম চিঠিটার কথা মনে আছে নিশ্চয় আপনার। দুঃখে-হতাশায় কি যে লিখেছিলাম আমার নিজের কিন্তু ভালোরকম মনে নেই। এ-চিঠিটা ছিল একেবারে অন্য ধরণের। এতে কলোনীতে আপনার সেদিনের সব কথা মেনে নিয়ে আমায়

ভুলে যেতে লিখি আপনাকে। রাগে নয়, অভিমানে নয়। শুধু এতেই আমাদের, বিশেষ করে আপনার কল্যাণ বলে। লিখি, আমি ভুলতে পারব না, তবে আপনার সুখের-পথে কাঁটা হয়েও থাকব না - যেমন আছি সেই রকম থেকে…"

চোখ ডবডবিয়ে আসায় আবার থেমে গেল। তারপর আঁচল দিয়ে মুছে নিয়ে কি ভেবে একটু হাসল। বলল—"তিনবার লিখে তিনবার ছিঁড়ে ফেলি। তারপর একটা লিখে কেন, কি ক'রে পোস্ট করব-করব ক'রে পোস্ট করা হচ্ছেনা, এই সময় দাদাই একটা ভুল ক'রে বসলেন—ওঁর দিক থেকে ভুল ভিন্ন আর কি বলব? একদিন বাড়ি এসে বললেন—'বিপুর পরীক্ষা এসে পড়েছে, তাছাড়া অরুর বিয়ের পর একলাও পড়ে গেছে, ওর একটি মেয়ের কাছে পড়ার ঠিক করে ফেললাম'।…আমি প্রায় মাস তিনেক প্রভাদির কাছে পড়ছি। আমাদের বাড়িটা বেশি দূরে নয়, কলেজও কাছেই। প্রথম-প্রথম আমি কলেজ থেকে বাড়ি গিয়ে জলটল খেয়ে সাড়ে চারটের সময় এখানে চ'লে আসতাম বাড়ির চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে—বোধহয় দাদার ঐটুকু সতর্কতা। মাসখানেক পরে, প্রভাদিরই দাদাকে বলায় ব্যবস্থাটা পালটে গেল। আমি কলেজ থেকে সোজা এখানেই চলে আসি। জলখাবারের এখানে ব্যবস্থা থাকে। প্রভাদি লাস্ট পিরিয়ডে নিজের লিজারের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। এখানে বেশিক্ষণ পাচ্ছি তাঁকে, বাড়িতে দাদার আদর ছিলই, বৌদিদির ভেতরে যাই থাক, বাইরের ব্যবহার সুদরে গেছে, বেশ কাটতে লাগল আমার। ভাবলাম, তাহ'লে থাকাই যাক না এইভাবে, শুধু পড়াশুনা নিয়ে, মন্দ কি? আপনাকে যে চিঠিটা লিখেছিলাম, প'ড়েই ছিল বাক্সয়, বের ক'রে একদিন পড়লাম। আরও ভালো ক'রে একটা লিখে ওটা ছিঁড়ে ফেলে ক'রেই দোব পোস্ট, এই সময় উপরোউপরি কয়েকটা ঘটনা ঘটে গিয়ে সব ওলটপালট হয়ে গেল আবার।"

বিপাশা বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেলে চুপ ক'রে রইল কিছুক্ষণ। বীরেশ প্রতীক্ষা ক'রে রইল।

এক সময় বিপাশা দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে বলল—"ওঁরা দু'জনে এখানে স্বামী-স্ত্রী ব'লে নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন। রেজেষ্ট্রী করা বিয়ে নয়, রীতিমতো শাস্ত্রসম্মত বিয়ে। বছরখানেক হোল বাইরে থেকে এসেছেন চাকরি নিয়ে, মেলামেশা সংযত, ভদ্র, কেউ সন্দেহ করবার অবসর পায়নি।

একদিন রবিবার, বেলা আন্দাজ দুটোর সময়, গোটা কতক প্রশ্ন থাকায় এসেছি। ভেতর থেকে কপাট বন্ধ; ধাক্কা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, বৈঠকখানার পেছনে ওঁদের শোবার ঘর থেকে বেশ খানিকটা জোরেই কথা কাটাকাটির শব্দ কানে এল। আমাদের মেয়েদের আড়িপাতার রোগই হোক, বা, একেবারে নতুন ধরণের কথা ব'লেই হোক, আমি আর না ধাক্কা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম দোরের ফাঁকে কানটা লাগিয়েই। সেই দিন টের পেলাম, ওঁরা একসঙ্গে থাকলেও কোনরকমই বিবাহ হয়নি। আরও টের পেলাম, প্রভাদি বিবাহটা সেরে নিতে চান, কিন্তু যতীনদা টালমাটাল করছেন, বা, করতে চাননা একেবারেই। কি কারণে সেটা ঠিক ধরা গেল না—তবে, প্রভাদি প্রমাণের ভয় দেখিয়ে শাসাচ্ছেন, দরকার পড়লে কোর্টে যাবেন।"

বিপাশা মুখটা নামিয়ে নিল, বলল—"প্রমাণটা কি আপনি বুঝতেই পেরেছেন।"

একটু পরে মুখ তুলে বলল—"আমার মনের অবস্থাটা বুঝতেই পারেন। একবার মনে হোল, চেপেই যাই, আমার দরকার কি এসবে? বেশ ভালোভাবে চলছে; চলুকই। আবার এও মনে হোল, যেমন আমি হঠাৎ টের পেয়ে গেলাম, তেমনি আর কেউ টের পেলে কথাটা জানাজানি হ'য়ে গেলে আমিও জড়িয়ে পড়তে পারি এর মধ্যে; বিশেষ ক'রে দাদার কানে গেলে তাঁর সন্দেহ হ'তেই

পারে। অন্যদিকে, তাঁকে যদি ব'লে দিই, আমার ওপর বিশ্বাসটা বরং বেড়েই যাবে। এদের সঙ্গও আর ভালো লাগছে না। পড়ার মধ্যে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ি মাঝে মাঝে, যার জন্যে, নিজেদের গলদ রয়েছে বলেই, প্রভাদি একদিন টুকলেনও—অত অন্যমনস্ক থাকি কেন আজকাল, কিছু হয়েছে কি ? অস্বীকারই ক'রে গেলাম। তারপর একদিন হঠাৎ জিজ্ঞেস ক'রে বসলেন—'আচ্ছা, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করব মনে ক'রে ভুলে ভুলে যাচ্ছি। গত রবিবারের কথা, ছপুরবেলা, একটা কথা নিয়ে চাকরটাকে বকাবকি করছি, মনে হোল, কে যেন বাইরের দোরে ধাক্কা দিলে। তুমি এসেছিলে কি ?'··· খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে চেয়ে। অনেক কষ্টে মুখের ভাব সহজ রেখে বললাম—'কৈ, না তো। তা'হলে তো খুলিয়েই নিতাম দোর।'···বললেন—'তাহলে হাওয়াই হবে। হাওয়াটা জোরও ছিল সেদিন।'

আমি আর কিছু না ভেবে দাদাকে জানিয়ে দেওয়াই ঠিক করলাম। সুযোগ খুঁজছি, এই সময় আর একটা ব্যাপার হোল।

মনটা এমনিই ঠিক থাকেনা, পরীক্ষাটা এগিয়ে আসছে, তার ওপর এই ব্যাপারগুলো হ'য়ে মন আরও চঞ্চল হয়েই থাকে, একটা বিশ্রীরকম ভুল ক'রে বসলাম আমি। আপনাকে নতুন চিঠিটা লিখে কলেজের নোটবুকের মধ্যে রেখে দিই, কলেজে লেটার বক্সে ফেলে দোব।

এটা শনিবার রাত্রির কথা। প্রভাদি কখনও কখনও আমায় রবিবার দিন যেতে বলতেন ; এ ববিবারেও বলেছিলেন। রেগুলার পড়ার মধ্যে, আর বোধ হয় মনের ওরকম অবস্থার জন্যেও, সেগুলো আর জিজ্ঞেস করা হয়নি, নোটবুকে লেখা ছিল। সেটা আর খান ছই বই নিয়ে গেলাম, বিকেলে জিজ্ঞেস ক'রে জেনে নোব। একটা কথা বলিনি, দাদা কখনও কখনও কলেজ ফেরৎ এসে পড়তেন প্রভাদিদের বাসায়। হতে পারে সতর্কতাই, গল্পগুজব ক'রে আমায়

নিয়ে চ'লে যেতেন। সেদিনও হঠাৎ এসে পড়লেন। ওঁর এক মাড়োয়ারী ছাত্রের জীপ জোগাড় করেছেন, আমায় মুর্শিদাবাদ ঘুরিয়ে আনবার জন্যে এসেছেন। প্রভাদিকেও বললেন, উনি গেলেন না, ধন্যবাদ দিয়ে আমাদের জীপে তুলে দিয়ে এলেন।

তার পরদিন আমি যখন পড়তে এলাম, মনে হোল প্রভাদিরই যেন ছমছমে ভাব একটা; কথায় কথায় অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন, প্রশ্নগুলোই আগে ঠিক ক'রে নোব, বোঝাতে গিয়ে দু'এক জায়গায় নিজেই অসঙ্গত করে ফেলে অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ছেন, আমি হেসে টুকলাম—'আজ আপনিই অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছেন প্রভাদি; কেন বলুন তো?'

একেবারে গম্ভীর হয়ে গিয়ে একটু ভাবলেন। তক্ষুনি উঠে প'ড়ে বললেন—'বোস, আসছি।'

ভেতরের ঘরে গিয়ে একটা চিঠি হাতে ক'রে এনে টেবিলে রেখে দিয়ে বললেন—'কিছু মনে কোরনা, খামেভরা থাকলে নিশ্চয় খুলতাম না।'

আমার সেই চিঠিটা, একটা ভাঁজ খুলতে না খুলতে টেবিলে হাতের ওপর মাথা চেপে আমি হু হু ক'রে কেঁদে উঠলাম।

অনেকক্ষণ কেঁদে যেতে দিলেন আমায়, পিঠে হাত বুলিয়ে যাচ্ছেন আস্তে আস্তে, একসময় আমি নিজে হতেই চুপ ক'রে যেতে বললেন—'ব্যাপারটা কি বলো আমায়। আপত্তি আছে?'

আপত্তির সবটাই, কিন্তু আর উপায়ও তো নেই। আমি যতটা পারলাম রেখে-ঢেকে ব'লে গেলাম। তার মধ্যে উনি প্রশ্ন ক'রে ক'রে আরও অনেকখানি বের ক'রে নিয়ে শেষে বললেন—'কিছু মনে কোরনা, কোন প্রমাণ আছে?'

'প্রমাণ?'—ব'লে আমি ধাঁধায় পড়ে যেতে বললেন—'থামলে কেন? বলো, মেয়েয়-মেয়েয় কথা হচ্ছে।'

সেদিনের কথাটা মনে প'ড়ে যেতে আমি আর উপায় না দেখেই

কোনরকমে কথাটা মুখ থেকে বের ক'রে দিলাম—'উনি সে-ধরনের মানুষ ন'ন।'

'সে-ধরনের মানুষ ন'ন!'—চিবিয়ে চিবিয়ে কথাটা ব'লে বাইরের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। চোখ দুটো জ্বলছে। এক সময় বললেন—'আচ্ছা! তুমি আজ যাও। কাল পারতো একটু সকাল-সকাল এসো কলেজ থেকে, আমিও চ'লে আসব। চিঠিটা আমার কাছে থাক। ভয় নেই।'

চাকরটাকে আগের দিনও সরিয়ে দিয়েছিলেন, সেদিনেও ছিল না। পড়া হোল না, এদিক ওদিক দু'একটা কথার পর বললেন—'হ্যাঁ, কালকের সেই চিঠির ব্যাপারটা। ঐ রকমই পোষ্ট ক'রে দিতে চাও, কি দেখা ক'রে সব কথা ব'লতে চাও? সত্যি দেখা ক'রতে চাও তো তার ব্যবস্থা ক'রতে পারি—অনারেব্‌ল্, কেউ টের পাবে না'।"

চুপ ক'রে গেল বিপাশা। চোখ দুটো আবার ডবডব করে উঠল। মুছে নিয়ে অপ্রতিভভাবে হেসে বীরেশের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বলল—"আট মাস দেখিনি, দেখা হওয়ার আশ্বাস…"

আবার চোখ ডবডবিয়ে এল। মুছে নিয়ে বলল—"ওঁকে বললাম –'দেখা যদি একবার হোত।…'

শেষ করতে না দিয়ে বললেন –'কি করবে—এই রকম কাঁদুনি? কাব্য? কাব্য?…ভুলে থাকি?' ব'লতে ব'লতে—চোখ দুটো আবার জ্ব'লে উঠেছে, আমি বললাম—'কি করব? উপায় তো নেই।'

বললেন—'ঢের উপায় আছে। এরা নামায়, তারপরে কেটে পড়বার পথ খোঁজে'।"

এক নিঃশ্বাসে সুখ-দুঃখ, আশা-ভরসা, তার সঙ্গে লজ্জা-সরমের কথাগুলো কোন রকমে বলে নিয়ে, আর পারল না বিপাশা, ডুবন্ত মানুষের মতো দু'হাতে বীরেশের হাত চেপে ধ'রে বলল—"সব তো শুনলেন, এবার আমি কি করি?…দু'জনের দিক ভেবে—তার মধ্যে

বিশ্বাস করুন, বেশী ক'রে আপনার দিক ভেবেই আমি পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াচ্ছিলাম—দৈবের অভিশাপে নেহাৎ। অজান্তে কী যে এক জাঁতিকলে প'ড়ে গেছি আমি!—বুঝছি তো, প্রভাদি চায় ওর দল-পুষ্টি হোক—আমি সরে দাঁড়াতে চাইলেও ও ছাড়বে না আমায়—এ অবস্থায় আপনিও যদি আমায় এই অকুলে একলা ফেলে সরে দাঁড়ান —আমি তাহলে কি করি? কার কাছে দাঁড়াই?…বলুন—বলুন না আমায়…"

মজ্জমানের মতোই হাত দুটো চেপে ধরে ইনিয়ে-বিনিয়ে কেঁদে যেতে লাগল।

স্থিরভাবে বাইরের দিকে চেয়ে ব'সে আছে বীরেশ, চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে। সেদিন সন্ধ্যায় ঘাটে ব'সে 'অঙ্গনা'-পত্রিকাকে মাঝে রেখে দু'জনের জীবনভোর কাব্য-স্বপ্ন, কঠিন বাস্তবের স্রোতে কোথায় ভেসে গেছে। একটা সম্পূর্ণ নূতন ধরনের পরিস্থিতি, মন এ-ধরনের কিছুর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। এই আটমাস ধরে অঙ্গনায় যা গড়ে তুলল সত্যে-কল্পনায়, সব বিরস, বিবর্ণ হয়ে গেছে। শুধু একটা তীব্র অনুতাপ—মুহূর্তের দুর্বলতায় একটা অমূল্য জীবন কোথা থেকে কোথায় এনে ফেলল!

অনেকক্ষণ একভাবে কেটে গেল। শেষে একটা শেষ সংকল্পে মনটাকে কঠিন ক'রে নিয়ে বলল—"ওঠো, লক্ষ্মীটি। আমি তোমায় এমনি ক'রে ভেসে যেতে দোব ভেবেছ? তোমায় তো ব'লেছিই—তুমি ভেবে নিয়ে যা বলবে তাই হবে। এবার এসে বুঝলামও তো এ-অবস্থায় বলবার আর আছেই বা কি?…ডেকেছ, চলে এসেছি। একটা কিছু ঠিক ক'রে আসা হয়নি। শুধু একটা কথা ব'লে যাই তোমায়—আমি এমনভাবে এসেছি এবার—অনেকটা এগিয়েছিও—যাতে কোন অপমানের মধ্যে দিয়ে তোমাকে যেতে না হয়। আজ এই পর্যন্তই থাক। দেরি হবে না। দরকার মনে হলে তোমায় প্রভাদির ঠিকানায় চিঠিও দোব।"

চৌদ্দ

বিপাশা চ'লে গেল। একবার মনে হয়েছিল, বাইরের ফটক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসুক, যতটুকু পায়; বিপাশাই বলল—"আপনি আর বেরুবেন না।" ধক্ ক'রে বুকে বাজল কথাটা—কেউ দেখে ফেলবে! গোপনতা! বৈঠকখানার দরজা পর্যন্ত গিয়ে, সেখানকারই একটা চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে দরজার সামনাসামনি হয়ে বসল। যতটুকু দেখা যায়। বিপাশা বরাবর সামনের দিকে মুখ ক'রে এগিয়ে গেল, তারপর ফটক খুলে বেরুবার সময় একবার মুখ ঘুরিয়ে চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে ব'সে রইল বীরেশ।

বাড়িটা অসহ্য বোধ হচ্ছে। এইবার ওরা এসে পড়বে, অন্তত প্রভার আর দেরি নেই। হয়তো কাছাকাছিই কোথাও, কারুর বাড়িতে ওৎ পেতে ব'সে আছে। এসে একরাশ প্রশ্ন। ওর অধিকারও আছে। সাক্ষাৎটা তো ঘটিয়ে দিল। হয়তো সব প্রশ্ন শোভনও হবে না। সেদিকেও তার 'অধিকার' আছে ব'লে জানিয়ে দিয়েছে; বিপাশা 'দিদি' বলে, সুতরাং···

একদণ্ডও মন টেঁকছে না এখানে। বেরুবার উপায় নেই। নির্জন, স্তব্ধ বাড়িটা ওকে যেন গিলে ফেলে ধীরে ধীরে উদরের রসে জারিত করছে।

তবু চলেই যেত, না হয় খানিক পরেই; কিন্তু আর কলকাতার গাড়িও পাওয়া যাবেনা।

সন্ধ্যার একটু আগে প্রভা এসে গেল, তার আগেই অবশ্য চাকরটা এসে গেছে। একটা জবর গোছের খবরও দিল প্রভা। বলল—পথে বিপাশার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় ও তাদের বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে গল্পসল্প ক'রে এল। যায় মাঝে মাঝে, সন্দেহের কিছু হ'চ্ছে কিনা ঠারেঠোরে বুঝে আসতে। এবারে তো আরও বেশী নজর রাখতে হয়েছে।

একটু হাসল। অর্থপূর্ণ ই, বলল —"আবার দরকার প'ড়লেই আসবেন, ভয় নেই।"

গা ঘিন ঘিন করছে। ভয় হচ্ছে, ওদের দু'জনের অন্তরের বেদনায় সিঞ্চিত যে কথাগুলা হোল আজ দু'জনের মধ্যে—শুদ্ধতায় গোপন — তার একটাও না ঢেলে দিতে হয় এই কলুষিত কর্ণে।

রায় এসে পড়ায় আর এগুল না কথা। বীরেশ দেখেছে, এ কাছে থাকলে অপরের সামনে প্রভা একটা পর্দা র.খার ভাব রেখে যায়। অভিনয়ও হ'তে পারে। পুরুত ডেকে শাস্ত্রসম্মত দাম্পত্যের অভিনয়।

রাত্রেও গতকালের মতো ও সতর্ক থেকে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল মোটামুটি। একটা কথাই রইল, প্রস্তুত হ'য়ে আসিনি, শীঘ্র একবার আসবে, এবার চিঠি দিয়েই।

পরদিন একটা সম্পূর্ণ নূতন ধরনের অভিজ্ঞতা।

গাড়িটা সকাল সাতটার সময়। স্নানাদি সেরে কিছু জলযোগ ক'রেই বেরিয়ে পড়া ঠিক করল বীরেশ। প্রভা আহার ক'রেই যাওয়ার জন্য বলল, ও জানাল তা'হলে বাড়ি পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। ভেতরকার কথা ঐ—এখানে আর একেবারে মন টেঁকছে না; সমস্ত রাত একরকম বিনিদ্রই কেটেছে।

স্নান সেরে তৈরি হচ্ছে, আফিসের ফীটনটা গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। রায় বলল—"যাক্, গাড়িটা এসে গেছে, একটা ডিফেক্ট্ হ'য়ে পড়েছিল। ভেবেছিলাম আসতে পারবে না। তা'হলে চলুন. আপনাকে তুলে দিয়ে আসি।"

যা এড়িয়ে যেতে চায় সেটা ঘাড়ে এসে পড়ছে, বীরেশ একটা খুশির ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করে বলল—"তা'হলে তো খুবই ভালো হয়, চলুন।"

প্রভা ফটক পর্যন্ত গিয়ে, বীরেশকে শীঘ্র আবার আসার কথা ব'লে গাড়িতে তুলে দিয়ে এল।

অনেকখানি পথ। এক-ঘোড়ার ফীটন ধুক-ধুক ক'রে চলেছে। কালকের কথা যাতে না ওঠে সেই উদ্দেশ্যে বীরেশ সাধারণভাবে সহরটা নিয়ে প্রশ্ন শুরু ক'রে দিল ; রাজবাড়ি, কলেজ, রাস্তাতেও দ্রষ্টব্য যা একটু-আধটু পড়ছে। বাড়িতেই যে সিগারেটটা ধরিয়েছিল সেইটে ঠোঁটে চেপে রায় উত্তর দিয়ে যাচ্ছে, একটু ছাড়াছাড়া আর যেন অন্যমনস্কভাবে। মনে হয় যেন নিজের কিছু প্রশ্ন আছে, বা, কিছু ব'লতে চায় নিজে। এক সময়, ওরই মধ্যে একটু বিরতি পেয়ে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বলল—"বাই দি বাই, কালকের ইণ্টারভিউটা আপাদের কেমন হোল ? অবশ্য, যদি আপত্তি না থাকে।"

"ভালোই তো···" এক কথায় সারবার চেষ্টা করল বীরেশ।

"সাকসেস্‌ফুল ?"—পাশ থেকে গোল্ড ফ্লেকের টিনটা তুলে নিয়ে ঢাকনাটায় মোচড় দিল রায়।

"বলতে পারেন।···আপনি দেখছি যাকে চেন-স্মোকার ব'লে তাই, ফুরুতে দেন না।"—একটু হেসে মন্তব্য করল বীরেশ।

"একটা বিশ্রী অভ্যেস হ'য়ে গেছে···"

"কস্‌ট্‌লিও। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দাম তো শুনেছি অনেক বেড়ে গেছে।"

"দুষ্প্রাপ্য। অনেক কষ্টে···"

"কী যে ধাক্কাটা দিয়ে গেল ! সারা পৃথিবীটারই ওপর।"

"স্বাভাবিকই ; ওয়ারল্ড্ ওয়ারই তো···"

একটা সিগারেট বের ক'রে টিনের গায়ে ঠুকে ঠুকে ধরাল রায়। ওয়ারল্ড্ ওয়ার থেকে কালকের ইণ্টারভিউয়ে ফিরে আসার সোজা সরল পথ খুঁজে না পেয়ে ঐদিকে গেল চ'লে, বিষয়টা তখন খুব চালু। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি—চারিদিক দিয়ে বিশৃঙ্খলা, চারিদিক দিয়ে নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা ; প্রসঙ্গের অভাব হোলনা বীরেশের। ওরা ঐ আলোচনা নিয়েই ফীটন থেকে নামল।

•

স্টেশনের ভেতরে গিয়ে শুনলো, গাড়ির কোন ঠিক নেই। ইন্‌জিন্ নিয়ে কি গোলমাল হ'য়েছে, গাড়ি এখনও লালগোলাতেই।

রায় বলল—"নতুন কথা নয়, নিত্যই হ'চ্ছে এ লাইনে। চলুন, ভেতরে গিয়ে বসা যাক্।"

একটা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট ক'রে নিয়ে ওরা ওয়েটিং রুমে চ'লে গেল। মাঝখানে একটা গোল টেবিল, চারিদিকে চারটে চেয়ার। তুটোয় সামনা-সামনি হ'য়ে বসল। ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিংরুম, একজন মিলিটারি সাহেব ছাড়া আর লোক নেই। সেও ঘরের একদিকে মদ খেয়ে একটা ইজিচেয়ারে পা ছড়িয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে : পাশে টিপয়ে একটা বোতল আর পেগ রাখা।

এবার রায় আর অবসরই দিল না। চেয়ারে হেলান দিয়ে ব'সেই সিগারেটটা সরিয়ে আরম্ভ ক'রে দিল—"একস্‌কিউজ মি মিস্টার মিটার, বুঝছি আমার অনধিকার চর্চা হচ্ছে, তবু···ইয়ে—আপনি বিপাশাকে এভাবে বিয়ে ক'রতে যাচ্ছেন কেন? তা যদি বললেন তো এ্যাট্ অল্ ওকে চাইছেনই বা কেন বিবাহ করতে? আপনার নিজের জাতও নয়। বাড়ির যে মত নেই সে তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে।"

ভূতের মুখে 'রাম'নাম, তাও একবারে এতখানি, বীরেশ একটু অবাক হ'য়ে চেয়েই রইল। ব্যাপারটাকে ঠেলে ঠেলে আসছিল ব'লে ভেতরে ভেতরে বেশ একটু বিরক্ত, খানিকটা স্পষ্ট ক'রেই মনের ভাবটা প্রকাশ করতে যাচ্ছিল—ওর মুখের 'অনধিকার চর্চা' কথাটা ধ'রেই, সামলে নিয়ে একেবারে ঘুরে গেল। বলল—"মিস্টার রায়, আপনাদের হোল পুরুত ডেকে গোত্র মিলিয়ে শাস্ত্রসম্মত বিবাহ। আর, আমাদের এটা ব্যভিচারই তো। বোঝাতে গেলেও বুঝবেন কি?"

এবার রায়েরই অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকবার পালা।

বীরেশ যা বলল তা ওর বিচার-বিশ্বাসের কথাই, কিংবা বিদ্রূপই? তবে, ও-ও নিজেকে সামলেই নিল। সহজ যুক্তির ভঙ্গিতেই বলল

—"মাফ করবেন, আপনি যা বললেন—শাস্ত্রসম্মত বিবাহ ব'লেই আমার এ-ধরনের বিবাহে একটু কৌতূহলী হওয়া স্বাভাবিক নয় কি? একটু নিরাপদ দূরত্ব থেকে দেখতে পাচ্ছি ব'লে আমাদের এর মন্দ দিকটা লক্ষ্য ক'রে যাওয়ার সুযোগটা বেশি নয় কি?"

বিমূঢ়ভাবে চেয়ে রয়েছে বীরেশ, কথা জোগাচ্ছে না। ঠোঁটে জিভ ভিজিয়ে বলল—"কিন্তু আপনি…আপনারা ছ'জনেই তো ইণ্টারভিউয়ের ব্যবস্থাটা করলেন।"

রায় চুপ ক'রে গিয়ে মাথাটা চেয়ারের পেছনে একটু উলটে দিয়ে তিন-চার টান সিগারেট খেল, যেন গ্রন্থিটুকু খোলবার খুঁট পাচ্ছে না। তারপর সোজা হ'য়ে একটু যেন ঝেড়েঝুড়ে ব'সে, সিগারেট টেনে নিয়ে বলল—"একটা কথা আপনাকে অকপটে স্পষ্ট ক'রে না ব'ললে চলবে না মিস্টার মিটার; কথাটা পারিবারিক সিক্রেট হ'লেও। এটা নিশ্চয় স্বীকার করবেন, শাস্ত্রসম্মত বিবাহ হ'লেই যে স্বামী-স্ত্রীর সব বিষয়ে একমত হবে এটা আশা করা যায় না। আমার স্ত্রী শিক্ষিতা, তাঁর মনে নতুন যুগের হাওয়া একটু লাগা আশ্চর্য নয়—যদিও দেখতেই পেলেন আমাদের দাম্পত্য আর পারিবারিক জীবনের ধারাটা—পুরনোই—সেই সনাতনই বলতে পারি। পুরুষে পুরুষে কথা হচ্ছে, ওঁদের কানে পৌছাবে না ব'লেই এইখানে একটা কথা বলতে সাহস করছি মিস্টার মিটার। কথাটা হচ্ছে, শিক্ষা কিছু আমিও পেয়েছি; একেবারে মূর্খ নয়, যুগ যুগ ধ'রে পেয়ে এসেছি ব'লে শিক্ষা আমাদের, অর্থাৎ পুরুষদের গা-সওয়া হয়ে গেছে; তাঁদের মতন মাথা ঘুরিয়ে দেয় না। যার জন্যে এযুগে আমাদের চেয়ে ওঁদের নতুন কিছু করবার ঝোঁকটা বেশি—সে নতুন-কিছুর মধ্যে সবচেয়ে বড় হোল এই রকম অসবর্ণ-বিবাহ, খুঁজে খুঁজে ছেলে ধরে নামিয়ে আনা…"

"বিপাশাকে আমিই নামিয়ে এনেছি মিস্টার রায়।"—কান দুটো লাল হয়ে উঠেছে, চেষ্টা সত্ত্বেও চোখ দিয়ে একটা বিদ্যুৎ ঠিকরে

বেরিয়ে গেল। রায় অবিচলিত থেকেই বলল—একটু হেসেই—"ঠিকই আছে। এক্‌সেপশন্ প্রুভ্‌স্ দ্য রুলস্ (Exception proves the rules)। ওঁরা ওঁদের চারম্‌স্ (Charms) দিয়ে···না, থাক এসব। আমার এই নিয়ে একটু চিন্তা করা আছে। কিছু গবেষণা এবং অভিজ্ঞতাও। সুযোগ পেলেই ওয়ার্নিংটা দিয়ে যাই। গাড়িটা যে-কোন সময় এসে যেতে পারে। যুক্তি-তর্কের অন্ত নেই এ নিয়ে, আমি আপনাকে মোদ্দা কথাটা বলে নিই। আপনি বিপাশাকে বিয়ে করবেন না।"

"কেন?"—নিঃস্বার্থ উপদেশে ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠছিল বীরেশ, প্রায় মুখ দিয়ে এবার সোজাসুজিই বেরিয়ে পড়েছিল—"তাহলে আপনার মতন ক'রে থাকতে বলেন ?"—সামলে নিয়ে একটু ঘুরিয়ে বলল—"তা'হলে অনেকে যে রেজেস্টারির ফরম্যালিটুকুও না ক'রে কাটিয়ে দিচ্ছেন, সেইভাবে থাকতে বলেন ?"

অবিচলিত থাকবার চেষ্টা ক'রেও একটু থমকেই গেল রায়। তারপর আবার বেশ সহজভাবেই বলল—"না মিস্টার মিটার, সে তো আরও খারাপ। আমি এ-ফাঁদে পা দিতে মানা করছি এই জন্যে যে··· যাক্, আপনাকে বিরক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে আরম্ভ করিনি। প্রথমেই বলেছি, পুরুষে-পুরুষে কথা হচ্ছে—ইয়ে—আমাদের সাধারণ ভাবে বিবাহ বলেই তার সঙ্গে তুলনা ক'রে—এরকম বিবাহের কতকগুলো যে দোষ আছে—জীবনের প্র্যাক্‌টিক্যাল্ সাইড্—মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক। এ বিষয়ে আমার কিছু স্টাডি (study) আছে।"

প্রশ্নের অপেক্ষাতেই থেমে গিয়ে মুখের পানে চাইল। বীরেশ বলল—"বেশ, বলুন।"

"প্রথমত, এসব বিবাহ বড় একটা টেঁকে না। এগুলো রূপজ—মোহজ। রূপের মোহ কেটে গেলেই দেখেছি একটা ক্লান্তি—অবসাদ এসে গিয়ে তখন দু'দিকেই বিচার আরম্ভ হয়—একটা রিগ্রেট,

অনুতাপ—কোনদিকেই কারুর তো সম্মতি ছিল না—এদিকে ওদিকে, দু দিকেই মূল কাণ্ড থেকে বিচ্ছেদ হ'য়ে গেছে—অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি মৃত্যু এসে হানা দিয়েছে—বাবা, মা, বা ঐ রকমই একান্ত আপন কেউ—তখন একমাত্র উপায়—বিদেশী রোগ, তার বিদেশী চিকিৎসাও তো সঙ্গে সঙ্গে এসে গেছে—একমাত্র উপায় বিবাহ বিচ্ছেদ—তারপর দেখা গেল সে-পথও বন্ধ···"

"কেন ?"—মাথা নীচু ক'রে শুনতে শুনতে ঘাড় তুলে প্রশ্ন করল বীরেশ।

"সন্তান।"

ছঁ্যাৎ ক'রে কথাটা বাজল গিয়ে বুকে। প্রভার ঘটা করে এ্যাপ্রন্ ঝোলানো।

টেবিলের ওপরে এ্যাসট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে আবার আরম্ভ করল রায়।

"এবার সন্তান নিয়ে প্র্যাক্‌টিকাল সাইডে আসা যাক মিস্টার মিটার। আশা করি আমায় মাফ করবেন, ইফ আই কম্ মোর ডিরেক্ট টু দ্য পয়েন্ট্ (If I come more direct to the point)—যদি একেবারে কাছের যা দৃষ্টান্ত তারই সুযোগ নিই। ধরুন, আপনার আর বিপাশার কথাই। একে তো বিবাহটাই হ'তে যাচ্ছে—কি যে বলি—সরকারী গির্জায়—তার ওপর আপনি কায়স্থ, বিপাশা ব্রাহ্মণকন্যা—বিবাহের বাজারটা কিরকম দাঁড়াবে ?—ধরুন, যদি পরিবার বা সোসাইটি মেনেই নিল আপনাদের বিবাহ—এইরকম নিচ্ছেও তো মেনে আজকাল—পুরুত ডেকে স্যাংটিফায়েড্ ক'রে নিচ্ছে—কয়েক জায়গায় দেখলামও তো—তাহ'লে ছেলে-মেয়ের বিবাহ হবে কোথায় ?—ঐ রকম নব-কুলীন ঘরে ?···"

"আদি-কৌলিন্যও কি গর্ব করার মতো মিস্টার রায় ?"—বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও যুক্তি হিসাবে কথাটা আপনিই বেরিয়ে গেল বীরেশের।

রায় বলল—"মোটেই নয়। বরং যদি বলি সেই পাপেই আজ এসে এই প্রায়শ্চিত্ত, তো, বোধ হয় বেশি ভুল হবে না। কিন্তু আমরা যারা আজকের জগতের, তাদের তো দেখতেই হবে, শ্রাদ্ধ আর বেশিদূর না গড়ায়।···হ্যাঁ, সন্তানদের কথা হচ্ছিল--যাদের নাকি আমরা ভুল পথে নিয়ে এলাম সংসারে। ছেলে হলে, মাফ করবেন মিস্টার মিটার, আমায় যুক্তি হিসেবেই বলতে হচ্ছে—ছেলের সাতখুন মাফ আমাদের সমাজে, কিন্তু···"

"আপনার কথা রেখে কথা বলি মিস্টার রায়। সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে—ধর্ম আর জাতিভেদ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে না কি? আর, এও মনে হয় নাকি যারা এ বিষয়ে অগ্রণী তাদের সাফার (suffer) ক'রতে হলেও, অদূর ভবিষ্যতে এটা গা-সওয়া হয়ে গিয়ে, আজ যেটা বিরাট প্রবলেম্ ব'লে মনে হ'চ্ছে, সেদিন আর সেটা সেরকম থাকবে না?"

যেন বিতর্কের শেষে এসেই সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে টিপে নিভিয়ে দিয়ে একটু বাইরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে বসে রইল রায়। তারপর হঠাৎ খানিকটা বিচলিত হ'য়ে ওর দিকে চেয়ে ব'লে উঠল—"ওটা সম্ভাবনা হিসেবে মেনে নিলেও পুরুষ হিসাবেই আপনাকে বলব—এ পথ ছাড়ুন। ঐ বিপাশা, সত্যিই যতটা জানি ও খুবই ভালো, নিরীহ --আমি কিন্তু ওর চেয়েও ভালো নিরীহ যে দেখেছি—মোহিনী শক্তি বিস্তার ক'রে একবার যদি জাঁতিকলে আটকে নিতে পারলে···দেখেছি তো, আমারই এক বন্ধুর ব্যাপারে—উঃ, সে যে কী যন্ত্রণা তার! কী ব্যর্থ হয়ে যাওয়া যে একটা জীবন—উঃ, মনে হ'লেও···"

উঠে পড়ল। চোখ দুটো চকচক ক'রে উঠেছে। বলল—"দাঁড়ান, গাড়ির খবরটা নিয়ে আসি।"

দোর খুলে বেরিয়ে বাইরে দাঁড়াল। জাল লাগানো কপাটের মধ্যে দিয়ে বীরেশ দেখল, রুমাল বের ক'রে চোখ মুছে নিয়ে ডান দিকে চলে গেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। এই লোকটাকে সেবারেও এবারেও যেন প্রভার হাতের পুত্তলী ব'লে মনে হয়েছে। বিপাশার কথাগুলার সঙ্গেও মিলে যাচ্ছে। লোকটাকে স্টাইলিস্, অহঙ্কারী ব'লে মনে হয়েছিল, এখন একটা ভ্রান্ত, অনুতপ্ত, নিরুপায় মনের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখতে পেয়ে বীরেশের মনটা ব্যথাতুর হ'য়ে উঠেছে। হ্যাঁ, অস্বীকার করতে পারে না, বিশেষ ক'রে পুরুষ বলেই। বিশেষ ক'রে পুরুষদের সতর্ক ক'রে দেওয়ার যে, ও এই ব্রত নিয়েছে, এই জন্যও।

কিন্তু সত্যই কি বিপাশাও প্রভাই!

গাড়ির কত দেরি জেনে ফিরে আসতে বিলম্ব হওয়ায় বীরেশ বুঝল রায় এখন খুব শীঘ্র ফিরবে না। মনটা এতই বিক্ষুব্ধ হ'য়ে পড়েছে যে, কাল্পনিক কোন বন্ধুর সঙ্গে নিজেকে প্রায় এক ক'রে ফেলেছিল; কিছুক্ষণ বাইরেই থেকে মনটা গুছিয়ে নেবে এখন।

নিত্যসঙ্গী সিগারেটের টিনটাকে ফেলে গেছে। বীরেশ অন্যমনস্ক-ভাবে ঢাকনা খুলে গোল্ডফ্লেকের মিষ্ট গন্ধটা একটু শুঁকল। তারপর টেবিলে পা তুলে দিয়ে চেয়ারে এলিয়ে ব'সে চিন্তা-স্রোতে গা ঢেলে দিল।

—এই বিপাশাও কি প্রভা হ'য়ে উঠবে একদিন—সম্ভব কি হওয়া? রায় যে কথাগুলা বলল, খুব খাঁটি হ'লেও তার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই। ভালোবাসা অন্ধ ক'রে দেয়, মূঢ়তাই এনে দেয় অনেকটা, এ কথাটা সত্য হলেও এ পথে পা দেওয়া পর্যন্ত সে এর ভালোমন্দ সব দিক বিচার ক'রে গেছে। শুধু নিজের দু'জনকে নিয়েই নয়; রায় যে বলল তার এ বিষয়ে 'স্টাডী' আছে, দৃষ্টি খুলে রেখে লক্ষ্য ক'রে গেছে, এটা তার ক্ষেত্রেও খাটে। দেখেছে, ট্রাজেডীই বেশি। দেখেছে, যদি একটা সফল হোল তো তার জায়গায় পাঁচটা ব্যর্থ। হয়তো ব্যর্থতার সংখ্যাই আরও বেশি। কিন্তু, সত্যই তারাও কি এই পথেই ঢালতে চলেছে তাদের জীবন? সে আর বিপাশা। তার নিজের কথাই ধরা যাক। তার কি এটা রূপজ মোহের উর্দ্ধে কিছু নয়?

বিপাশাকে রূপসীই বলা চলে, যদিও একেবারে 'আহা মরি' গোছের কিছু নয়। তাই দিয়ে তাকে বশ ক'রে নিয়েছে? তার এটা ভালোবাসা নয়? এই যে তপঃক্ষীণা তাপসীকে দেখে এল, তার সমস্তটাই মিথ্যা?

চিন্তাটা যেন এই একটি প্রশ্নের চারিদিকে একটা আবর্ত সৃষ্টি ক'রে ঘুরপাক খাচ্ছে, বেরুতে পারছে না।

নিজের দিকেই ফিরে এল বীরেশ। তন্ন তন্ন ক'রে নিজের অন্তঃস্থল খুঁজছে, যদি এতটুকু কোথাও ব্যতিক্রম দেখে তো ক্ষমা করবে না নিজেকে।

এক সময় পেয়ে গেল। ব্যতিক্রম নয়, একটা সমাধানই। নিজের ভালোবাসাকে সংশয়ের কুহেলী ঠেলে তার স্বরূপে দেখতে পেয়েছে বীরেশ। তাব ভালোবাসা যদি একেবারে নিঃস্বার্থ নয়, আত্মবিলীন-করা নয় তো সেদিন হাতের-মধ্যে পেয়েও—বিপাশাকে, সেইদিনই তাকে বিদায় দিয়ে চাইল কেন? সে কি নিজের দিকে চেয়ে?—না, তার-বিপাশা সুখী হবেনা? সুখী হবেনা পরিবারে, সমাজে, তার নিজের জীবনে।

চিন্তার এই সূত্রটুকু ধ'রে এক জায়গায় এসে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল বীরেশ। রায় দরজা ঠেলে এসে ব'সতে মনের পুলকেই টিনের ঢাকনাটা খুলে বলল—"নিন্। এবার চেন বজায় রাখতে দেরি হয়ে গেল আপনার। গাড়ির আর কতদূর?"

"তা হোল বৈকি একটু। ভাবছিলাম খালি খালি ঠেকছে কেন এত।" হেসে একটা সিগারেট বের ক'রে নিয়ে ধরাতে ধরাতে বলল—"গাড়ির ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা। আজকাল যত সব হাঁটাই-করা ইন্‌জিন এই সেক্‌সনে চালাচ্ছে তো। ব'লছিলাম আমি তা'হলে আর ব'সে থাকি কেন? কিছু দরকার হবে কি?"

"না, তেমন কিছু কই আর? যা সামান্য আছে তা এখনি হয়ে যেতে পারে।"

"কি বলুন, বলুন !"—আগ্রহভরেই ব'লে উঠল রায়, সঙ্গে সঙ্গেই সুরটা পালটে নিয়ে একটু অনুতপ্তভাবেই বলল—"হ্যাঁ, আর একটা কথা মিস্টার রায়, কবে আবার দেখা হবে না-হবে—আপনার ক্ষমাটা চেয়ে রাখতে চাই।"

"কেন, ক্ষমার কথা কি ক'রে আসে ? এত আদর-যত্ন পেলাম আপনাদের কাছে ?"

"সম্প্রতি যেসব অনাচার ঢুকেছে সমাজে, পরিবারে, তাতে মনটা খুবই চঞ্চল হয়ে থাকে। বিশেষ করে বিবাহের ব্যাপারে, যেটা নাকি একবারে সবকিছুর মূলে। কিছু তো করবার নেই। এর পরিণামগুলো লক্ষ্য করি, ভাবি, আর আপশাই। করিনা আলোচনা কারুর সঙ্গে ; তবে আজ তার কিছু কিছু আপনার কানে ঢেলে দিয়ে আপনারও অযথা অশান্তি বাড়িয়ে দিলাম। ব'লেও থাকব যে ভালোও তো হচ্ছে, যতই কম পার্সেণ্টেজ্‌ই হোক। যতদূর ওকে স্টাডি (study) ক'রে জানতে পেরেছি, বিপাশা সেই অল্পসংখ্যকদের মধ্যেই পড়ে। আমার কথায় যদি আপনার মনে কোন দ্বিধা এসে থাকে তো আমায় ক্ষমা করবেন। আপনি ওকে নিন মিস্টার মিটার।"

"ক্ষমার তো কথাই আসে না ; আপনি আমার ধন্যবাদ নিন মিস্টার রায়, অসীম ধন্যবাদ।"

"কি রকম ! আমায় ধন্যবাদ !"—বিস্মিত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল রায়।

বীরেশ বলল—"ধন্যবাদ, আপনি আমায় এত অল্প পরিচয়ে অকপটে আপনার অভিজ্ঞতার কথা ব'লে যা উপকার ক'রেছেন তার জন্যে। আরও একটা বড় উপকার করতে পারেন। সেটা সোজাসুজি আমার উপকার না হ'লেও আমিও নিজেকে উপকৃতই মনে করব।"

রায় আঙুলে সিগারেট ধ'রে বিস্মিত প্রশ্নের দৃষ্টিতে চেয়েই রইল। বীরেশ ব'লে চলল—"বিপাশা খুবই ভালো মেয়ে মিস্টার রায়। কিন্তু তবু, আপনি এ-ধরনের বিবাহের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যা যা বললেন

সেগুলা তো থেকে যায়ই। হয়তো ভেবে ছাখেনি এতটা, একটা সংসার-অনভিজ্ঞ মেয়ে, হয়তো ক্ষমতাই হয়নি এখনও ভেবে দেখবার। ওকে কেউ যদি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে নিরস্ত ক'রতে পারতো তো বোধহয় ভালো হোত। আপনার সে-ক্ষমতা আছে। নিজের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতায় দেখলাম বলেই, আপনাকে অনুরোধ করছি। বলবেন, আমি নিজে বলছিনা কেন। সম্ভব নয় মিস্টার রায়। অস্বীকার করতে পারছিনা যে, আমি নিজেই মোহগ্রস্ত। আপনিও অস্বীকার ক'রতে পারেন না যে, এক অন্ধ অন্য এক অন্ধকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারেনা। আমি যতই চেষ্টা করব, কাপুরুষের মতো ছেড়ে আসতে চাইছি বলে ততই ও আমায় জড়িয়ে ধরবে। আপনিই এই সিচুয়েশন্‌টা বাঁচাতে পারেন।"

সেইভাবেই সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল রায়। বুঝে উঠতে পারছেনা। একটু পরে প্রশ্ন করল—"সিন্‌সিয়ারলিই বলছেন মিস্টার মিটার?"

"একটি কথা নেই এর মধ্যে যা আমার একেবারে অন্তরের কথা নয়। শুধু একটা কথা;—সমস্তটাই যেন আপনার দিক থেকে বলছেন, ওকে কন্‌ভিন্স্‌ করবার জন্যে, যেমন আজ কন্‌ভিন্স্‌ করেছেন আমায়। আমার কথা একেবারেই বলবেন না। তাহলে তার ফল উল্টোই হবে, জানি তো ওকে।"

"দেরি হবে মিস্টার মিটার। ওর ওপর বাড়ির দৃষ্টি যেমন সতর্ক, তার ওপর আবার প্রভা যেমন ওকে গার্ড করে রাখে, দেখছেনই তো। তাকে তো আরও এড়িয়েই যেতে হবে।"

বীরেশ বলল—"উনি তো ঘুণাক্ষরেও জানলে চলবে না। এই ড্রামাটা তো উনিই চালাচ্ছেন; আর শেষ দৃশ্য পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতেও চান, এটুকুও বুঝি তো।"

রায়কে ফীটনে তুলে দিয়ে ফিরে এসে আবার টেবিলে পা তুলে দিয়ে চিন্তা ক'রতে গিয়ে প্রথমেই বীরেশের মনে যা উদয় হোল তা একটা আত্ম-প্রশ্ন—ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ এ কি এক কাণ্ড ক'রে বসল সে? এ যে বিপাশাকে হারিয়ে ফেলাই। নিজে হ'তে চেষ্টা ক'রে পারেনি, বিপাশার ভালোবাসা ভঙ্গুর নয় বলেই। এবার, রায় যতই সতর্ক হ'য়ে অগ্রসর হোক না কেন, বিপাশা তো না ভেবেই পারে না যে, বীরেশ নিজে না পেরে এবার রায়কে লাগিয়েছে। এ তো শুধু নিজের কাছেই কপটাচারী, প্রবঞ্চক হওয়ার লজ্জা নয়, এর ফলে যে অভিমানটা হবে বিপাশার, তা কি শুধু ছাড়াছাড়িতেই শেষ হবে?

পরশু থেকে যা চলছে, একটার পর একটা সে জটিলতা—আর চিন্তা ক'রেও পেরে উঠছে না বীরেশ। প্রায় ছিঁড়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় মনের-তারটাকে একেবারেই ঢিলে ক'রে দিল; এ আর এমন কী সমস্যা? বাড়ি গিয়েই প্রথম কাজ হবে রায়কে একটা চিঠি লিখে দেওয়া—ও এখন যেন বিপাশার কাছে কথাটা না তোলে। একটা বিশেষ কারণ হয়েছে, পরে এ বিষয়ে জানাচ্ছে ওকে।

চিকিৎসা নয়, একটা মুষ্টিযোগই। মনটা কিন্তু এতেই শান্ত হোল আপাতত। এরপর একটা ব্যাপার হ'য়ে মনটা ঘুরেও গেল এদিক থেকে। তারপর আরও কিছু ঘটে সবটাই চাপা পড়ে গেল। বেশ কিছুদিনের জন্যেই।

সাহেবটা হঠাৎ চোখ খুলে ধড়মড়িয়ে উঠে মাতালের অবোধ দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল—"Where am I?"(এ আমি কোথায়?)

মনটা একটু হালকা হ'য়েছে ব'লে বীরেশ একটু রসিকতা ক'রেই উত্তর করল—"Ask your bottle". (তোমার বোতলকে জিজ্ঞেস করো)।

সাহেবটা ঢুলতে ঢুলতে বোতলটা মুঠিয়ে নিয়ে এমন ক'রে কটমটিয়ে চাইল যে তাকেই লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়তে যাচ্ছে মনে ক'রে বাঁচাবার জন্যে ডান হাতটা তুলে ধরল বীরেশ। সাহেবটা কি একটা কথা মুখে পিষে নিয়ে বোতলটা উপুড় ক'রে ঢকঢক ক'রে খানিকটা গলায় ঢেলে দিয়ে আবার আগেকার মতো ঘুমিয়ে পড়ল।

বীরেশ একটু বসে রইল, তারপর নিরাপদ সঙ্গ নয় বুঝে দোর খুলে বাইরে চলে গেল। গাড়িটারও খবর নিতে হবে।

খবর নিয়ে জানল, একটু দেরিই আছে এখনও। যে ক'খানা বেঞ্চ রয়েছে প্ল্যাটফর্মে সবগুলিই ভর্তি। একটু পায়চারি করল, তারপর একটু তফাতে একটা বেঞ্চের ওপর নজর পড়ল। একটি যুবক, প্রায় ওরই বয়সী, একটি তরুণী, ওর স্ত্রী বলেই মনে হয়, একটি মেয়ে, মলয়ের চেয়ে একটু ছোটই। তিনজনেই সুশ্রী, সুবেশ। মেয়েটি তো ফুটফুট করছে। সাদা ধপধপে ফ্রক-পরা, বব্ ক'রে ছাঁটা কোঁকড়া-কোঁকড়া চুলে একটা সাদা রিবন্-বাঁধা ; বেঞ্চের কাছাকাছি এটা কুড়িয়ে ওটা ফেলে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে। ডেকে বারণ করা থেকে টের পেল নাম রীতা।

বীরেশ একবার একটু তফাৎ থেকেই সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল, তারপর ফেরবার সময় কাছাকাছি এসে প্রশ্ন করল—"আর কেউ আছেন কি আপনাদের ? বসতে পারি ?"

"না, আর কেউ নেই। বসুন না।"—একটা মাঝারি সাইজের সুটকেশ, তার একটা ব্যাগ ; একটু টেনে নিল, দরকার না হ'লেও নিজেরাও একটু স'রে বসল। বীরেশ, মাঝখানে ব্যাগ সুটকেশ আর যুবা নিজে, শেষের দিকে তরুণীটি।

খুব হালকা একটি এসেন্সের গন্ধ হাওয়ায় ছড়িয়ে রয়েছে। সব মিলিয়ে এমন একটি পরিবেশ মন যেন জুড়িয়ে গেল।

কথা কইতে ইচ্ছে হচ্ছে। হয়তো পরশু থেকে অনবরত যে ধরনের কথা হ'য়ে আসছে তার প্রতিশোধ হিসাবেই, কিন্তু সঙ্গে সুন্দরী

স্ত্রীলোক ব'লেই গায়ে পড়ে আলাপ ক'রতে সংকোচ আসছে। বীরেশ মাঝামাঝি একটা উপায় বের ক'রে নিল। শিশুটিকে লক্ষ্য ক'রে বলল—"তোমার অমন ফ্রকটা যে নোংরা হ'য়ে যাচ্ছে খুকি ; উঠে এসো।"

"আসবার মেয়ে ? তখন থেকে ব'লে ব'লে হয়রান হচ্ছি দু'জনে। ...আপনিও কি এই ট্রেনেই যাবেন ? কোথাকার টিকিট ?"—যুবাই কথা শুরু ক'রে দিল।

বীরেশ বলল—"যাব তো কলকাতাতেই, ওদিকেই বাড়ি। কিন্তু গাড়ির যা অবস্থা দেখছি, কখন্ যে দয়া ক'রবেন !...আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ?"

যুবা চোখ নামিয়ে একটু হাসল, পাশেও একটু আড়চোখে চেয়ে নিয়ে বলল—"কোন্‌টে আগে বলি ?—একজন যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি, একজন যাচ্ছে তার বাপের বাড়ি।"

তরুণীটি মুখটা ওদিকে ক'রে নিল সংযত হাসির সঙ্গে।

বেশ সরস মনও, বড় ভালো লাগছে। শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে 'উদ্ভট'-এর একটি শ্লোক জানা আছে বীরেশের—হরি (নারায়ণ) পয়োনিধিতে শয়ন করেন, হর (মহাদেব), তিনি শয়ন করেন হিমালয়ে, এই থেকে প্রমাণ হয়, 'অসার' এই সংসারে সারবস্তু হ'চ্ছে শ্বশুরমন্দিরই। শ্লোকটা মনে পড়ে যেতে, তার ওপর যুবকের বলার সরস ভঙ্গিতেও একটু হাসল। লোভও হোল একটু আউড়ে দিতে ; তবে, প্রথম আলাপেই অতটা এগিয়ে না গিয়ে বলল—"বাপের বাড়ির কাছে শ্বশুরবাড়ি আর কবে দাঁড়াতে পেরেছে ? বিশেষ ক'রে মেয়েছেলেদের কাছে, যাঁরা বঞ্চিতই থাকেন। কোথায় বাপের বাড়ি ওঁর ?"

"এলাহাবাদ।"

"ও বাবা ! তাহলে তো খুব দূরের যাত্রা আপনার। তবে, শ্বশুরালই তো ; ঐ যা।"

"বাড়াচ্ছেন, বাড়ান : তবে এবার একটা আলাদা এ্যাট্রাক্শন্ আছে ; নৈলে শ্বশুরালয় হ'লেও এখন যাওয়ার কোন তাগিদ ছিল না।"

"সেটা কি ?"

"কেন, দেখেননি ? এবার এলাহাবাদে একটা খুব বড় এক্‌জিবিশন্ হ'চ্ছে, বাইরে থেকেও পার্টি সব এসেছে। গরম পড়ে আসছে, এবার তো গুটিয়েই আসছে। স্টেশনেও বড় প্ল্যাকার্ড সাঁটা রয়েছে। রঙীন। দেখেননি আপনি ?"

"চোখে পড়েনি।"—বীরেশ উত্তর করল।

একটু থেমে প্রশ্ন করল—"আর আছে কত দিন ?"

"তা দিন দশ-বারো হ'তে পারে। হপ্তাখানেক তো বটেই।"

একটু থেমে বলল—"যাবেন ?"

"শুনে লোভ তো হয়, কিন্তু…"

থেমে গিয়ে একটু হাসল। যুবা একটু সময় দিল, তারপর কুণ্ঠিত ভাবে বলল—"বোধ হয় আন্দাজ করেছি…"

"কি ?"

"পাথেয় ইত্যাদির কথা। বাড়িই ফিরে যাচ্ছেন তো। কিন্তু তার জন্যে…"

বীরেশ একটু চোখ তুলে আন্দাজ ক'রে নিল, বলল—"না, সেজন্যে আটকাবে না। বেশি নিয়েই বেরই। আটকাচ্ছে…"

"বলুন।"

"জানেন তো একটা কথা আছে, কলকাতার লোকের কাছে পশ্চিম বলতে 'লিলুয়া'। আমি আবার কলকাতার দক্ষিণের মানুষ, এলাহাবাদ-দিল্লীর নামই শোনা আছে, কখনও ওদিকে যাওয়া হয়নি।"

"তার জন্যে আটকাবে না। এর বাপের বাড়িতেই উঠবেন আপনি। তাঁরা লোক ভালোবাসেন। চলুন, চলুন। চারিদিক থেকে লোক আসছে—এ সুযোগ আবার কবে, কোথায় হবে…"

—খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠল।

"কিন্তু আপনি তো আমার পরিচয়ও কি তা জানলেন না এখন পর্যন্ত।" বাধা দিয়ে বলল বীরেশ—"অথচ শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলছেন।"—একটু হাসল।

ও একটু থমকে মুখের দিকে চাইল, বলল—"ও, বুঝেছি!··· তাই যদি বলেন তো মুখ দেখলেই পরিচয় পাওয়া যায় মানুষের।··· কী মুশকিল দেখুন! এর দিদি সেখান থেকে এত প্রশংসা ক'রে লিখছেন একবার দেখে যাওয়ার জন্যে, তা কাউকে যদি দলে টানতে পারলাম! একটা ভালো জিনিসের জন্যে মানুষের যে এত কম আগ্রহ হতে পারে···"

"ও অপবাদগুলো কিন্তু আমার ওপর খাটে না। ভালো জিনিস, সুন্দর জিনিসের ওপর খুব টান, আপনার মেয়েটিকে দেখা পর্যন্ত এত লোভ হচ্ছে!···খুকি, এসোনা এদিকে।"

মেয়েটি একবার ঘুরে দেখে নিয়ে আবার কাঁকর জমা করায় মন দিল। যুবা বলল—"এসো রীতা, মামা ডাকছেন।"

বীরেশ ফিরে ঘুরে চাইল ওর দিকে, বলল—"তাহলে ছাড়লেনই না আমায়!"

"বুঝলাম না।"—একটু বিমূঢ়ভাবেই চাইল ওর দিকে।

"আমি তো গাড়িতে চড়বার আগেই 'মামা' হ'য়ে এলাহাবাদে পৌঁছে গেলাম।···রীতা, এবার এসো তো মা, আর ভয় নেই।"

"এসো। এসো। নতুন মামা পেয়ে গেলে।"—হাসতে হাসতে বাপও তাগাদা দিতে মেয়েটি একটু বিমূঢ়ভাবে ওর দিকে চেয়ে আছে, বীরেশ নিজেই উঠে গিয়ে ওকে কোলে ক'রে নিয়ে এসে বসল। রুমাল বের ক'রে ওর জামা ঝেড়ে হাত দুটো মুছে দিয়ে মুখের কাছে ঝুঁকে বলল—"তোমার নাম রীতা? বাঃ, বেশ চমৎকার।"

"মার নাম সরিতা"—বোধহয় ছন্দের জন্যে বলল রীতা। তারপর

বোধহয় আরও কত জানে সেই শৈশব-দম্ভেই বলল—"বাবা বলে, আরও ভালো।"

তরুণী লজ্জায় উল্ট দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে নিল। যুবক কপট ক্রোধে হাসতে হাসতে বলল—"কবে তোকে কানে ধ'রে বলেছি রে—হতভাগা মেয়ে!"

বীরেশ কোন রকমে হাসি লুকিয়ে বলল—"আমি তো বলি—রীতা ঢের বেশি ভালো। মামার চেয়ে বাবা কি বেশি জানতে পারে?"

আগের স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল।

"তাহলে যেতেই বলছেন আমায়?"—যুবাকে প্রশ্ন করল বীরেশ।

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।"—বলে যুবা পকেট থেকে মনিব্যাগটা বের করতে গেল।

"ওকি আবার?"

"বাঃ, আমিই নিয়ে যাচ্ছি···"

"হয়েছে।"—হেসে বারণ-করার ভঙ্গিতে ডান হাতটা তুলে রীতাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বলল—"আমি এক্ষুনি আসছি, আর ধুলো ঘেঁটোনা, লক্ষ্মী মেয়ে।"

উঠে, পা বাড়িয়ে বলল—"ভালো কথা—কোন্ ক্লাস নোব?"

"আমাদের ইণ্টার ক্লাস।"

"চুপ ক'রে বোস রীতা, লক্ষ্মীটি।"—ব'লে উঠে গেল। খানিকটা এগিয়েছে, যুবা ডাকল—"শুনুন।"

ঘুরে দাঁড়াতে বলল—"উপস্থিত কৃষ্ণনগর পর্যন্তই নেবেন।"

কেন, একটু থমকে জিজ্ঞেস ক'রতেই যাচ্ছিল বীরেশ, কি ভেবে আবার এগিয়েই গেল। শিয়ালদর টিকিট রিফণ্ড ক'রে কৃষ্ণনগরের টিকিট নিয়ে একটু পরে ফিরে এসে রীতাকে কোলে নিয়ে বসল।

পরিচয় হোল পরস্পরের।

যুবকের নাম গোপীরমণ গোস্বামী। বাড়ি কাছেই শহরতলীতে। মুর্শিদাবাদে সিল্কের কারখানা আছে নিজেদের। গোপীরমণ এম-এসসি পাস ক'রে বাপের সঙ্গে ব্যবসা দেখে; তিন পুরুষের পুরনো ব্যবসা। এলাহাবাদে যাওয়ার আর একটা উদ্দেশ্য, শুনেছে জার্মানী থেকে নূতন ধরনের তাঁতের আমদানি হ'য়েছে এক্‌জিবিশনে, তারা চালিয়ে দেখাচ্ছেও। সুবিধা দেখলে যেমন অর্ডার দেওয়ার ইচ্ছা আছে, তেমনি যোগাযোগ ক'রে নিয়ে রেশম-তাঁত সম্বন্ধে জার্মানী থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসবার ইচ্ছা আছে।

রীতার মামার বাড়িরও পরিচয় দিল কিছু। ওর শ্বশুর সেখানে বড় একজন চিকিৎসক। সন্তানের মধ্যে দুটি কন্যা। বড়টির ঐ দিকেই বিবাহ দিয়ে বাড়িতেই রেখেছেন। তিনটি নাতি নাতনি। জামাইও এম. বি. ডাক্তার। শ্বশুরের সঙ্গে কাজ ক'রে।

"এর মধ্যে মামাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তো।"—বীরেশ ইচ্ছা ক'রেই একটু ঘুরিয়ে বলল।

"রীতার একটা সাধ; উইকনেস (weakness) বলতে পারেন, কে জানে কেন। একজনকে ধরে নেওয়া হয়েছে, তাতে কাজ হয়। নৈলে টপ করে আসতনা আপনার কাছে।"

"তাই আমায় অমন ক'রে দেখেও নিলে?"

"তাই। জন্মাবার পর এই দ্বিতীয়বার যাচ্ছে। যখন বোঝবার বয়স হবে, বুঝবে। ততদিন তো চলুক।"

একটু হেসে বলল—"এবারেও তো বেশ কেটেই যাবে।"

বোধ হয় প্রবঞ্চনাটুকুর জন্য বীরেশ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে থাকবে। সজাগ হ'য়ে প'ড়ে একটু হেসেই বলল—"হ্যাঁ, নেই মামার চেয়ে কানা মামাও তো ভালো।"

কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"হ্যাঁ, আপনি কৃষ্ণনগরের টিকিট করতে বললেন যে? অবশ্য তাই ক'রে এনেছি আমি।"

"আমায় শান্তিপুর-ন'দে হয়ে যেতে হবে। রীতার জন্যে পুজো দিতে হবে, মানত আছে।"

"চুল দিতে হবে? এমন চমৎকার চুল!"—একটু ভীতভাবে ব'লে উঠল বীরেশ; রীতার মাথায় আলগাভাবে হাত বুলাতে বুলাতে।

গোপীরমণ হেসে বলল—"না, আম'দের ঠাকুরের চুলে লোভ নেই, তাঁর নিজেরই দিব্যি মাথাভরা চাঁচর কেশ। চুলের লোভ, যাঁর জটা নিত্যি খসে খসে পড়ছে। আমাদের শুধু মাথা ঠেকিয়ে পূজো দেওয়া।"

শেষের মন্তব্যটুকু ক'রে আবার হেসে উঠল। বীরেশ যোগ দিল। সরিতা হেসে মাথা ঘুবিয়ে নিয়েছে, বীরেশের একটা কথা মনে পড়ে যেতে চকিত দৃষ্টিতে সেও প্রশ্ন করল—"তাহলে আপনারা হচ্ছেন বৈষ্ণব?"

গোপী হেসে বলল—"হ্যাঁ, তবে, একটা যে কথা আছে, 'জাত খোয়ালেই বোষ্টম', সে রকম নয়।"

"তাহলে? জাতপাঁত সব মানেন?"—উৎসুক হ'য়ে উঠেছে—"ধরুন, বিবাহে ভেদাভেদ…"

"ভেদাভেদ যদি সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বলেন তো তা অবশ্য সেটা নেই, ওঁরা হচ্ছেন শাক্ত, আমরা বৈষ্ণবই, তবে…"

"জাতিতে জাতিতে?"—প্রবল ঔৎসুক্যের জন্যই এগিয়ে দিল বীরেশ।

"ও! অসবর্ণ বিবাহ?…সেদিকে শ্বশুরমশাই কায়স্থ হ'লে তাঁকে অন্য পাত্র দেখতে হোত। ওঁরা গঙ্গোপাধ্যায়; কুলীন। এখন অবশ্য ভঙ্গ।"

প্রবল উৎকণ্ঠার সঙ্গে শুনে যাচ্ছিল বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বীরেশের। মুখ দিয়েও আপনি বেরিয়ে পড়ল—"তাহলে আর কি হোল?"

একটু অস্বাভাবিক মনে হওয়ায় গোপীরমণ প্রশ্ন করল—"কেন বলুন তো ?"

তরুণীও একবার সোজা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল। নাকের ওপর একটি ছোট্ট রসকলি চিকচিক ক'রে উঠল বীরেশের দৃষ্টিতে। আরও যেন গুলিয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল—"না...ইয়ে... আমি বলছিলাম—আগে...অনেক আগে নাকি, শাক্ত-বৈষ্ণবেও বিবাহ চলত না।"

"থাকে কখনও ওসব ? না, থাকা উচিত, বলুন ?"

"আমিও তাই বলি।"

বুকটা হালকা ক'রে নিয়ে বলল—"যা যাওয়ার তা এমনি ক'রে আস্তে আস্তে যাবে। যাক্ সে কথা।...আচ্ছা নিতান্ত একটা কৌতূহলই আমার—খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা আপনাদের ; আমিষ-নিরামিষ।"

"আমি ওঁর গলায় মালা দিয়ে সেদিক দিয়ে লাভবান হয়েছি, উনি আমার গলায় মালা দিয়ে লোকসানেই পড়েছেন।"

তিনজনেই হেসে উঠল। তরুণী কোন রকমে চেপে নিয়ে কপট রোষে ঘাড়টা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল —"ভারি লোকসান ! যা'তা' গেলা !"

ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল। রীতা কখন মায়ের পাশে চ'লে গিয়েছিল —ছুটে এসে ভীতভাবে চোখ বড় বড় করে বলল —"ওগো শোন—বাবা একদিন রাধারাণীর গলায় মালা খুলে..."

"চুপ কর পাগলী।"—উঠে প'ড়ে ঠোঁটে হাসি টিপে হাতটা ধরে টেনে নিল গোপীরমণ ; বলল —"এ হতভাগা মেয়েকে নিয়ে যদি কোথাও বেরবার জো আছে !"

তরুণীও একটু মুখ ঘুরিয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ি এসে পড়েছে। এগিয়ে গিয়ে উঠে পড়ল সবাই।

চমৎকার লাগছে। অঙ্গনায় মাস্টারমশায়ের সান্নিধ্যের পূর্বে এমন সরস, মুক্ত দিন জীবনে আর এসেছে ব'লে মনে হয় না।

মাস্টারমশায়ের গাম্ভীর্যের মধ্যে হাস্যপ্রবণতা, আজকের রসের ভিয়েন অন্য ধরনের ; গোপীরমণের বয়সসুলভ চটুলতা, সরিতার সঙ্কোচ, সর্বোপরি রীতার শৈশবসুলভ প্রলাপ-কাকলি—সব মিলে একটা নূতন মাধুর্য এনে দিয়েছে এই নিতান্তই একটা অপ্রত্যাশিত, পথে-কুড়িয়ে-পাওয়া অন্তরঙ্গতার মধ্যে। একটু বেদনা মেশানো।

মাঝে মাঝে সে কথাও মনে হয়েছে বৈকি। তারও কি এই রকমই একটা কিছু প্রাপ্য ছিল না ? তার জায়গায়—যদি আসেই বিপাশা···

আর ভাবা যায় না।

চিন্তাটা ঠেলেই রাখছে বীরেশ। ভেঙে ভেঙেও যাচ্ছে গোপী-রমণের আলাপে, রীতার প্রলাপে, ক্বচিৎ সরিতার বিরূপ টিপ্পনীতে —"হ্যাঁ, দেশে ও তো মস্ত বৈষ্ণব ! যাঁর জানা নেই তাঁকে বলুন।"

আমিষ-নিরামিষের কথায়। জার্মানীতে শিখতে যাওয়ার কথায় —"হ্যাঁ, যেতে দিলে তো !"

"অবিশ্বাস ?"

গোপীরমণের প্রশ্নে সরিতা কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বীরেশকেই সাক্ষী মেনে বলে—"কি রকম আলগা মুখ দেখছেনই তো। এ-মানুষকে একলা ছেড়ে দেওয়া চলে সে গোঁয়ারদের দেশে ?"

সরিতারও আড়ষ্টতা একটু একটু ক'রে খসে পড়ছে পথ চলতে চলতে।

কৃষ্ণনগরে নেমে ওরা ব্রাঞ্চ লাইনে শান্তিপুর চলে গেল। সেখানে মানতের পূজা দিয়ে আরও সব দ্রষ্টব্য স্থানগুলো ঘুরে, গঙ্গা পেরিয়ে যখন নবদ্বীপ পৌঁছাল তখন সন্ধ্যা অতীত হয়ে একটু রাত্রি হয়ে গেছে। সেখানে গোপীরমণদের পাণ্ডা ঘাটেই উপস্থিত ছিল। থাকবার ভালো ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিল। রাত্রি কাটিয়ে ওরা সোনার গৌরাঙ্গ মন্দিরে রীতার মানসিক পূজা দিয়ে দ্রষ্টব্য স্থান সব দেখে বেড়াল। গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে আখ্যানে-উপন্যাসে জড়িত সব

জায়গাগুলোই দেখে দেখে বেড়াল, বিশেষ করে বীরেশের একেবারেই অ-দেখা বলে। ওদের যা কাজ তা সকালের দিকে হ'য়ে গেলেও সেদিন আর বেরুতে পারল না নবদ্বীপ ছেড়ে।

এ আবার একটা নূতন ধরনের অনুভূতি। সমস্ত দিন আবিষ্ট হয়ে সন্ধ্যার একটু পরে সোনার গৌরাঙ্গ মন্দিরে আরতি দেখে যখন ফিরল, তখনও দূরের কাছের ঘন্টারবে, বাতাসে দোলখাওয়া ধূপধূনার গন্ধে বীরেশের মনে হোল কোন্ যেন এক নূতন জগতে এসে পড়েছে হঠাৎ—সেখানে অঙ্গনা নেই, কলোনী নেই। বহরমপুরে এই সদ্যত্যক্ত ছুটো দিন নেই, এমন কি নিজেকেও যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ যেন একলা কবে সে-সব ছেড়ে কোন্ নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে গিয়েছিল, তারই ভাবমূর্তিতে বিলীন হ'য়ে যাওয়া।

ক্লান্তির জন্য খোলা ছাতেই বিছানা পাতিয়ে শুয়ে ছিল বীরেশ। মুগ্ধ, স্বপ্নালু দৃষ্টিতে নক্ষত্রলোকের দিকে চেয়ে চেয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

ওরা সকালেই প্রস্তুত হ'য়ে একটা গাড়ি ধ'রে ব্যাণ্ডেলে চ'লে গেল। সেখান থেকে একটা উত্তরগামী একস্প্রেস ধ'রে পরদিন সকালেই এলাহাবাদে গিয়ে থামল।

সরিতার ভগ্নীপতি গাড়ি নিয়ে এসেছিল, অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা সহরের মাঝামাঝি ওদের বাড়ি গিয়ে পৌঁছাল: বেশ সম্ভ্রান্ত পল্লী একটা। ছাড়া ছাড়া বাড়ি, সবগুলোই খানিকটা করে বাগানের মধ্যে। গেটে নেম-প্লেট দেওয়া। এ বাড়িটায় পেতলের ফলকে কালো অক্ষরে লেখা—Dr. K. Ganguly। উঁচু ছাতের একতলা মাঝারি আকাবের বাড়ি. সামনে বারান্দা, কর্তা নিজে আর সবাইকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, প্রণাম-নমস্কারাদি শেষ হ'লে গোপীরমণ বীরেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিল। ওর বন্ধু, এক্‌জিবিশন্ দেখবার জন্য সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

বাড়িটার সামনে গোল টেবিল পাতা বেশ চওড়া একটা বারান্দা,

দু'পাশে দু'খানা ঘর। বারান্দার মাঝখানে ভেতরে যাওয়ার একটা দরজা ; খোলাই, তার ভেতর দিকে, অল্প তফাতে একটা সবুজ রং করা কাঠের পার্টিশন্, যাতে সোজাসুজি নজর ভেতরে গিয়ে না পড়ে। ভেতরে যাওয়ার একটা রাস্তা বাড়ির ডান দিক দিয়েও চলে গেছে। ঘর দুটার বাঁ দিকেরটা বৈঠকখানা, ভালো করে সাজানো। ডান দিকেরটা অনেকটা খালি, বাইরের কেউ এলে থাকবার জন্যেও ব্যবহার করা হয়। বীরেশের ঐ ঘরেই ব্যবস্থা হোল।

কর্তার নাম করুণাময় গাঙ্গুলী। বেশ সুপুরুষ। ভারী শরীর, পুরন্ত মুখে ফ্রেঞ্চ্ কাট্ কাঁচা-পাকা দাড়ি, বড় বড় চোখে টরটয়জ শেলের চশমা পরা। মুখে একটা মোটা চুরুট প্রায় ধরানো থাকে। দৃষ্টি অনেকটা মাস্টারমশায়ের মতো, প্রসন্ন, হাস্যচঞ্চল।

এই সাম্যটুকু প্রথম পরিচয়েই অপরিচয়ের দূরত্ব নষ্ট ক'রে দিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দ ক'রে দিল বীরেশকে। পৌঁছাতেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে খানিকটা গল্প-সল্পের পর আর সব ভেতরে চ'লে গেলে, উনি বড় জামাইকে নিয়ে বীরেশের সঙ্গে খানিকটা গল্প করলেন ; তারপর দুবার পিঠ ঠুকে—'ফীল এ্যাট হোম' (Feel at home), ব'লে জামাইকে দেখাশুনা ক'রতে ব'লে উঠে পড়ে নেমে গেলেন। ওঁর ক্লিনিকটা কপাউণ্ডের মধ্যেই রাস্তার ধারে। রোগীরা আসতে আরম্ভ করেছে। ক্লিনিকের পাশেই দুটো মোটরের গ্যারেজ।

একটা চাকর মোতায়েন র'য়েছে ; কিছুক্ষণের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে, জলযোগ-পর্ব পর্যন্ত শেষ হয়ে গেলে কর্তা আর তাঁর বড় জামাই ছাড়া সবাই বৈঠকখানায় একত্রিত হলেন। ঐখানেই প্রোগ্রামও ঠিক হয়ে গেল—ঐ দিনই বিকালে এক্‌জিবিশন, তারপর···

স্বাচ্ছন্দ্য আর প্রাচুর্যের মধ্যে বেশ খানিকটা অভিজাত অভ্যর্থনা ; বিদেশ আর অপ্রত্যাশিত ব'লে অভিভূত ক'রে দিয়েছে মনটাকে।

বিকালে দু'খানা গাড়ি ক'রে কর্তা আর বড় জামাই করালীচরণ বাদে এরা সবাই ঘণ্টা তিনেক ধ'রে এক্‌জিবিশন দেখে এল। বিরাট

কাণ্ড, দিন চারেক লাগল দেখা শেষ করতে। এর ফাঁকে ফাঁকে মোটরে ক'রে সহরটা ভালো ক'রে দেখে নিল বীরেশ; সঙ্গে গোপীরমণ থাকেই, আরও দু'তিন জন সঙ্গী জুটে গেল; আত্মীয়, পরিচিত, ওদেরই বয়সী। একদিন সকলে মিলে দুর্গটাও দেখে এল।

ক'টা দিনেই বাড়ির সঙ্গে পরিচয়ে, ঘনিষ্ঠতায়, বীরেশ বাড়ির একজনই হ'য়ে গেছে; ভেতর-বাহির ব'লে প্রভেদটা গেছে ঘুচে। সম্পূর্ণ একটা নূতন জগতে, নূতন পরিবেশে, নূতন নূতন মনের সঙ্গে পরিচয়ে, আত্মীয়তায় জীবনের দিক্‌বলয় ক'টা দিনেই এতখানি বেড়ে গেছে যে, নিজেকে যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তার মধ্যে। ফেলে-আসা জীবনটাও যেন ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

এই অভিভূত ভাবটা আরও বেড়ে গেল।

রবিবার। এ-দিনটা করুণাময় চেম্বারে বসেন না; নিতান্ত সেরকম কেস্ না থাকলে 'কল'-এও যান না; করালীচরণই সারে। উনি বাইরে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে যান, বা, তাঁদের কেউ কেউ এলে বাড়িতেই থেকে যান।

বীরেশ গোপীরমণ, সরিতা, রীতা আর সরিতার বড় বোনের বড় ছেলে বাইরে বেড়াতে গিয়েছিল; সন্ধ্যার পর ফিরে মোটর থেকে নেমে সবাই ভেতরে চলে যাচ্ছিল—আজকাল বীরেশও প্রথমটা ভেতরেই চলে যায়, করুণাময় বারান্দায় আর দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গে ব'সে গল্প করছিলেন, টুকলেন—"বীরেশ, তুমি একটু ব'সে যেও।"

একটা সোফা খালি ছিল, বীরেশ গিয়ে বসল।

"কোথায় কোথায় গিয়েছিলে?"—প্রশ্ন করলেন উনি।

বীরেশ জানালে ওঁদের কাছে ওর একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে ওঁদের পরিচয় দিলেন। যিনি বড়, ওঁরই সমবয়সী, তিনি আগ্রায় নিজের চেম্বার ক'রে প্র্যাকটিস্ করেন, নাম কৃষ্ণদয়াল, বেশ কয়েক পুরুষ ধরে বাসিন্দা। সঙ্গী ওঁর ছেলে, এম. বির ছাত্র, নাম দীপঙ্কর।

পরিচয় শেষ হ'লে বললেন—"আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম, তারপর একটা সুযোগও হয়ে গেল, কৃষ্ণদয়াল আসায়। ওর সঙ্গে একটু কথাও হয়েছে। বলছিলাম, এলাহাবাদ তো তোমার একরকম ভালো করেই দেখা হ'য়ে গেল। এবার ।তোমরা বাইরেটাও ঘুরে এসো ; তুমি আর গোপী-বাবাজীর কথা বলছি। বাংলার ছেলেরা কেমন যেন কুণো হ'য়ে যাচ্ছে। গোপী তো বছর আটেক বিবাহ হয়েছে, এর মধ্যে মাত্র বার তিনেক এসেছে। তারপর কিন্তু আর বেরুতে চাইবে না। শ্বশুরবাড়ির অন্ন ধ্বংস ক'রছে মনে করবার ভয়ে কিছু বলাও যায় না, বুঝতেই পারছো দয়াল…"

চুরুটটা মুখে দিয়ে ওঁর দিকে চেয়ে খানিকটা হেসে নিয়ে ব'লে চললেন—"এবার তুমি রয়েছ, ওকে টেনে নিয়ে যাও। বলব-বলবই করছিলাম, দয়াল আসাতে সুবিধা হোল। তোমরা ওর ওখানে উঠে, আগ্রা-দিল্লী দেখে, ফিরতি পথে যতটা পার দেখে নিয়ে এসে বোস। ভারত-সভ্যতার যত পুরনো ট্র্যাডিশন এইখানেই জমা হয়েছে। এই সুযোগ, এরপর আমাদেব মতো জড়িয়ে পড়লে আর পারবে না। আমাদের মতোই ব'সে ব'সে উপদেশই দিতে থাকবে…শ্বশুর হ'য়ে পড়লে ঐটুকুই থেকে যায়, কি বলো দয়াল ?"

আবার চুরুট মুখে দিয়ে হাসতে লাগলেন। কয়েকটা টান দেওয়ার পর বললেন—"যাও। রেষ্ট নাওগে। দয়াল মেয়ের বাড়ি এসেছে ; পরশু যাবে, প্রস্তুত হয়ে নাও দু'জনে।"

এলাহাবাদে একটা সপ্তাহ কেটে গেছে। দীপঙ্করের সঙ্গে আগ্রা-দিল্লী একটু ভালো ক'রে দেখে নিতে চারটে দিন লেগে গেল, দিল্লীতে ওদের এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে। দু'জায়গাতেই বাড়ির মোটর এরপর বাড়ি-মুখো হোল ওরা। পথে যতটা পারল, বড় বড় কয়েকটা সহর, তার মধ্যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আধুনিক সহরও আছে আবার প্রসিদ্ধ তীর্থও আছে। এলাহাবাদ পেরিয়ে এসে বারাণসীও ওরা

বাদ দিল না। এইটে শেষ, এরপর ওরা ফিরে যাবে এলাহাবাদ। বারাণসীতে এসে পৌঁছাল বারো দিনের দিন।

হ্যারিকেন্ টুরই, ঝড়ের মুখে উড়ে বেড়ানো, তবে বিশেষ ক্লান্তি বা অবসাদ নেই বললেই চলে। একেবারে নিখরচায়। গোপীরমণের তো নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই, বীরেশ এলাহাবাদের টিকিট করবার সময় ভাড়া দিতে গিয়ে জানল, করুণাময় দুজনের ভাড়া আর সব রকম খরচ-খরচা ধরে বাড়তি মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে দিয়েছেন, এ বিষয়ে কোন কথা চলবে না।

সে-সময়ের সেকেণ্ড ক্লাসের ভাড়া—ইণ্টার আর ফার্স্ট ক্লাসের মাঝামাঝি, সেটা তখন একটু বিশেষ অবস্থাপন্ন লোকেই ব্যবহার করত ; ভালো হোটেল দেখে থাকা, টাঙা-ট্যাক্সিতে ঘোরা, যখন যেটা সুবিধা, প্রতিনিয়ত দেখাশোনা করার জন্য একটা বেশ চৌকশ লোকও দিয়েছেন, হ্যারিকেন্ টুরের ঘূর্ণী লেগে গেলেও প্রভাবটা জমবার অবসর পায় না।

এর সঙ্গে নিত্য-নূতন দেখার একটা অননুভূতপূর্ব আনন্দ। আশ্চর্য লাগে বীরেশের। আলাদীনের প্রদীপ-জ্বালা এমন ক'টা দিন হঠাৎ কোথা থেকে এসে পড়ল ওর ভাগ্যে !

তবে, দেহে অবসাদ জমতে না পেলেও মনটা এক একবার ছায়াচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েই বৈকি। দেখেছে, সেই ছায়া ঘনীভূত হ'য়ে দুটি মূর্তিতে আকার নিয়ে ওঠে, কখনও মা, কখনও বিপাশা। হয়তো জন্মগত সংস্কারের জন্য এ আবির্ভাবের একটা প্রকৃতিভেদও আছে। একটা সুন্দর কিছু দেখলে, বিশেষ ক'রে ইতিহাস-বিখ্যাত সহরগুলা—একটা হর্ম্য, একটা স্তম্ভ, একটা সরোবর, একটা উদ্যান—বিপাশার ছায়াটা এসে পড়ে তার ওপর। এটা বিশেষ ক'রে জ্যোৎস্না রজনীতে দেখা তাজমহলকে বিষাদমণ্ডিত করে দিয়েছিল। অপর পক্ষে, তীর্থতলায়—মন্দিরে, নদীতে, সরোবরে, সোপানে ভেসে ভেসে উঠেছে দাক্ষ্যায়ণীর মূর্তি। মনের ব্যাপার, বিপাশাও যে এসে না পড়ছে মাঝে মাঝে

এমন নয়, কিন্তু যেন সংস্কারবশেই বীরেশ ঠেলে রাখবার চেষ্টা করেছে। মনে হয়েছে, যেন বেশ শুচি সংগত নয়, শোভন নয়, তীর্থের বাতাবরণে। তর্ক করেছে মনে মনে। বিদ্রোহ করেছে—সে তা কিছু অন্যায় করেনি। মানুষে-মানুষে যা নিতান্তই সহজ, বিশ্বের যাবৎ মনুষ্য সমাজেই স্বীকৃত, কৃত্রিম সমাজ বন্ধনের আগল দিয়ে আজ তিরস্কৃত বলে, তাকে ঠেলে রেখে সেই আগলটাকেই মেনে নিতে হবে? বিশেষ ক'রে আর-সব দিক দিয়েই যে-সব আগল আজ শিথিল-বন্ধন হ'য়ে ভেঙে ভেঙে পড়ছে। তীর্থ যদি তীর্থই, দেবস্থান, সব জীর্ণ সংস্কারের ঊর্ধ্বে, তবে অনাঘ্রাত কুসুমের মতো শুদ্ধ যে বিপাশা, তার চিন্তাটাও নিষিদ্ধ হবে কেন?···যদি বা পায় আপন ক'রে তাকে তো, আর সব দম্পতির মতো সেখানে এসে দেবতাদের আশীর্বাদ নেওয়া নিষিদ্ধ হবে কেন?

বিদ্রোহী মন যুক্তি দাবী করে। পায় না।

মায়ের মূর্তিটা কিন্তু বেশ সহজভাবেই জেগে উঠে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে। তবে, যেন বিষণ্ণতার মধ্যেই। দাক্ষ্যায়ণীকে সুখ-সমৃদ্ধির মধ্যেও সুখের দীপ্তিতে সারা-জীবনে পেলও তো খুব কমই।

বারাণসীতে শেষ দিন। কাল সকালেই তারা এলাহাবাদে ফিরে যাবে। দশাশ্বমেধ ঘাটের মাঝামাঝি একপাশে একটা নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে একাই ব'সে ছিল বীরেশ। মাথা ধ'রে গোপীরমণের শরীরটা একটু খারাপ থাকায় বাসাতেই থেকে গেছে। সামান্যই, তবে, কাল যেতে হবে, আর বেরোয়নি।

উঁচু জায়গা, দুই পাশের আর নীচে গঙ্গার অনেকখানিই দেখা যায়—দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত। একটু দেরি ক'রেই বেরিয়েছিল, বেরুবে কিনা মনস্থির করতে না পেরে, এসে খুঁজে পেতে বসতে বসতে চারিদিকে রোদ রাঙা হয়ে এল। একটা পাৎলা ভিড় জমে উঠছে ঘাটে।

আজ একলা বলেই মনটা বড় বেশি ক'রে অন্তর্মুখী হয়ে উঠেছে; যার জন্যে কখন আকাশের স্বল্প আলোটুকু নিভে এসেছে খেয়াল হয়নি। দূরে-কাছে হু'একটা ক'রে প্রদীপ জ্বলে উঠতে লাগল।

আজ দাক্ষ্যায়ণীকে বড় বেশি ক'রে মনে পড়ছে। তার মধ্যে এই কথাটাই বেশি ক'রে যে, তিনি এই সমস্ত থেকে একরকম সারাজীবনই বঞ্চিতই থেকে গেলেন। বিশেষ করে তীর্থদর্শন, যার কিছুটা জোটেই কোনরকম করে বাঙালী মেয়েদের ভাগ্যে। বাবা ধর্মমতে নাস্তিক না হোন, এ-যুগের কিছু কিছু শিক্ষিতদের মতো এ বিষয়ে অনেকটা উদাসীনই ছিলেন। যতদূর জানে, ওর জন্মের পূর্বে মার ভাগ্যে, ওর ঠাকুমার সঙ্গে একবার দলবদ্ধ শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমাটা ঘটে। পরে, দেখেছে একবার দলে প'ড়ে বারাণসীটাও।

অঙ্গনার বাইরে মার এই হুবার মাত্র পদক্ষেপ। তারপর সংসার আর একটিমাত্র সন্তানের বোঝা।

অথচ সে-সন্তান তাঁর জন্য করল কি? অন্ততঃ বৈধব্যের পর হিন্দু ললনার একমাত্র সান্ত্বনা যে তীর্থ-পরিক্রমা, সেইটুকু এনে দেওয়ার দায়িত্ব তো সেই একমাত্র সন্তানেরই?

সে তখন অন্য এক দায়িত্ব সৃষ্টি ক'রে নিয়ে—হয়তো একটা মৃগ-তৃষ্ণিকার পেছনেই ছুটেছে!

আশ্চর্য লাগছে। হাসিই পাচ্ছে, হু'জনের মধ্যে একটা অদ্ভুত সমতা রয়েছে। মাও কি একটা মৃগতৃষ্ণিকার পেছনেই ছুটে চলেছেন না? অদর্শনে অসহায়ভাবে গুমরানো। যখন জাগ্রত, যখন নিদ্রিত, স্বপ্ন দেখেন, একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছেন সারা সংসারে।

হুধারে গঙ্গার তীর বেয়ে আলোকবিন্দুর ভীড় জমে উঠল। দূরে-কাছে আরতির ঘণ্টা উদাত্ত হয়ে উঠে একসময় স্তিমিতও হ'য়ে এল, বীরেশ তখনও এক ভাবেই বসে, একই চিন্তা শাখা-পল্লবিত হয়ে মনটাকে নিঝুম ক'রে এনেছে—মার জীবনে এ-আশীর্বাদটুকু এনে

দেওয়া হয়নি !···পাগলের মতো মা তাকে সারা সংসারে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।···

হোটেলে একটা ডবল-বেডের ঘর ওদের। শেষ রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখে বীরেশ ধড়মড় ক'রে উঠে পড়ল—দরজাটা একটু খোলা, তার ফাঁকে দাক্ষ্যায়ণী তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছেন।

যেন কিছু দেখবার আশাতেই বাইরে বেরিয়ে এল। কোথাও কিছু নেই। আর ভেতরে না গিয়ে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল। বুঝছে, প্রথম রাত্রির চিন্তাটাই রূপ নিয়ে উঠেছিল, স্বাভাবিকই ; মন কিন্তু প্রবোধ মানছে না। গোপীরমণ যখন উঠল তখনও ও পায়চারিই করছে। ওকে প্রথম প্রশ্ন—"আচ্ছা, এখান থেকে কলকাতার গাড়িটা কখন বলতে পারেন ?"

"সে তো টাইম-টেবিলটা দেখে নিলেই হবে। কিন্তু, কেন বলুন তো ?"

"একবার ভাবছি, এখান থেকেই চলে যাই। অনেক দিন হয়ে গেল না ? বাড়ির খবর কিছু নেই।"

"আছে কিনা, সে তো এলাহাবাদে গেলেই টের পাবেন। ঠিকানা দেওয়াই আছে। তা ছাড়া একজিবিশনে সবার জন্যে জিনিসগুলা কিনলেন। আর, এতদিনের ঘুরপাক, গায়ের ব্যথাও খানিকটা তো মেরে নিতে হবে।"

একরাশ যুক্তি জড়ো করল।

নিজের দিকেও যুক্তি আছে ; এতদিন রইল, এত করলেন, বিদায় না নিয়ে যাওয়াটা কেমন হয় ? —জামাই সঙ্গে রয়েছে, তাকে মাঝপথে ফেলে রেখে···

পূর্বব্যবস্থা মতো এলাহাবাদেরই টিকিট করা হোল। বিকালে বাড়ি পৌছাল। রবিবার, করালীচরণ সামনের ছোট বাগানটায় বেরিয়ে বেড়াচ্ছিল। এগিয়ে এল। মোটরের শব্দে ভেতর থেকেও সবাই বেরিয়ে এসেছেন। একটু কথাবার্তার পর করালীচরণ

বলল—"ও, হ্যাঁ, আপনার একটা টেলিগ্রাম এসেছে···দিন পাঁচেক হোল।"

ভেতর থেকে নিয়ে এসে হাতে দিতে, বীরেশ খাম ছিঁড়ে পড়ল—Come away sharp. (শীঘ্র চলে এসো)

ঘণ্টা তিনেক পরে একটা গাড়ি, তাইতে যাত্রা করল বীরেশ। নেমে সোজা কলোনী, বাড়ির পথেও পড়ে ওটা। তালা বন্ধ। গলি থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে এগিয়ে যেতে বলল।···নিশ্চয় তেমন কোন খারাপ খবর নয়···জায়গা নিয়েও একটা গোলমাল চলছিল···আর সব তো ভালই দেখে গেছে···টেলিগ্রামও সেই রকম···ত্নপুরের পর নিস্তব্ধ বাড়ির দরজায় ঘা দিল। ধরণী এসে খুলে দিল। "বড় মাসী নেই বীরু।" —ব'লে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে হু হু করে কেঁদে উঠল।

সতেরো

দাক্ষ্যায়ণীর মৃত্যুটা এল নিতান্তই আকস্মিকভাবে, নিঃসন্দিগ্ধ পথে।

বীরেশের অনুপস্থিতিটা দীর্ঘ হ'য়ে পড়ায় এদিকে একটু আধটু কাতর হ'য়ে পড়লেও মোটের ওপর ভালই ছিলেন, শরীরের দিক থেকে সুস্থই ছিলেন। টেলিগ্রামটা ছিল জমি নিয়েই, যেমন অত উদ্বেগের মধ্যে বীরেশের সন্দেহ হয়েছিল বিশেষ ভাষাটার জন্যে। একটা গোলমাল পেকে ওঠবার সম্ভাবনা দেখে, উকিলের পরামর্শে মুখুজ্জেমশাই টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দেন।

সেইদিন রাত্রেই বাড়িতে সিঁদ কেটে একটা বড়গোছের চুরি হয়ে যায়। তৈজসপত্র, এমনকি টাকাকড়ির ওপরও চোরের বিশেষ লক্ষ্য ছিল বলে মনে হয়না, যদিও যায় কিছু কিছু। পরদিন বিকালে, বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা ভাঁট-বৈঁচি-অমূললতার ঝোপে একটা ভাঙা ট্রাঙ্ক পাওয়া গেল। ট্রাঙ্কটা বীরেশ্বরের। আর কি ছিল,

কি নিয়েছে, বোঝা যায়না, তবে বইখাতা কাগজপত্রগুলা ছড়ানো। সে লোকটার নজরে পড়ে সে ঘাঁটাঘাঁটি না করে একজনকে মুখুজ্জে মশাইয়ের কাছে দৌড় করিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দামোদর আর একজন প্রতিবেশীর সঙ্গে চলে আসেন। সুচিত্রা আর গঙ্গা সেইমাত্র স্কুল থেকে এসে উঠানে পা দিয়েছে, বইশ্লেট ফেলে রেখে তারাও সঙ্গ নিল।

কাগজগুলো গোছাতে গোছাতে একটা ফটো পাওয়া গেল। মুখুজ্জেমশাই পরীক্ষা করবার জন্যে মোটা চশমার সামনে তুলে ধরেছেন, "ও মা, দাদার ফটো! দাদা আর বিপুদির!" বলে সুচিত্রা ছোঁ মেরে নিয়ে ছুটল বাড়ির পানে।

দাক্ষ্যায়ণী, গৌরীদেবী, আরও কয়েকজন দরজার বাইরে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন। "কি সুন্দর দাদার ফটো!—ভাগ্যিস চোরেরা নেয়নি!—দাদা আর বিপুদি!…"—বলতে বলতে সুচিত্রা ছুটে এসে দাঁড়াল হাঁপাতে হাঁপাতে। গৌরীর বিপুর নাম কানে যেতেই খটকা লেগেছে, 'দেখি'—ব'লে হাত বাড়িয়েছেন, দাক্ষ্যায়ণীই এগিয়েছিলেন, 'দেখিতো' ব'লে তিনিই নিয়ে নিলেন। সরল কৌতূহলেই। ইদানীং কান অনেকটা গেছে, হয়তো বিপুর নামটা শুনতেও পাননি ভালো ক'রে।

প্রথমটা একটা সুন্দর জিনিস দেখার সহজ প্রশংসাতেই ব'লে উঠলেন—"বাঃ, বেশ তো!"

পরক্ষণেই যেন হঠাৎ চৈতন্য হতে গৌরীদেবীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—"কে মেয়েটি? জানিস গৌরী?"

সেই হোল শুরু। "কৈ, দেখিনি তো। দাও দিকিন।" —বলে নিয়ে নিলেন গৌরী। কয়েকজনের মধ্যে যে হাতফের হোল তাতে টিপে টিপে একথা-সেকথার মধ্যে তাড়াতাড়ি সরিয়েও ফেললেন ফটোটা কিন্তু কোন ফল হোল না। কিম্বা কিছুটা উল্টা ফলই হয়তো হোল। প্রথমটা চুপ ক'রে ব'সে নিজের মনেই ভেতরে ভেতরে

আসরাতে লাগলেন দাক্ষ্যায়ণী। তারপর চিড়বিড়ানি। রাত আটটা পর্যন্ত জ্বরের সঙ্গে প্রলাপ –কখনও স্পষ্ট, কখনও জিভে মিলিয়ে-যাওয়া—"কাদের মেয়ে ?···কবে হোল···ব'লেনি তো···যেতে বল্না··· ডাক্না দেখি···"

খারাপ লক্ষণ দেখে সন্ধ্যার সময়ই ডাক্তার ডেকে বসিয়ে রাখাই হয়। কোন উপশম নেই। জ্বর বেড়েই চলল আর ভুল বকা। মাঝ রাত থেকে একরকম অচৈতন্য। তারই মধ্যে থেকে থেকে চমকে উঠে— "কে মেয়েটি ?···বীরু এল ?···স্বঘর তো ?···আজকাল যে আবার···"

সকালে মাস্টারমশাইকে খবর দিয়ে ধরণীর কাছে লোক পাঠিয়ে দেওয়া হোল। সেও সোজা কলকাতার ডাক্তারের কাছে চলে যাবে। তাকে পাওয়া গেল না।

কিছুই করা গেল না। সন্ধ্যার একটু আগে দাক্ষ্যায়ণী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

বীরেশ একেবারে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। ধরণী কেঁদে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে, একচোট চিৎকার ক'রে সে কেঁদে উঠেছিল, তারপর শোকের অনুপাতে আর যেন সেরকম হা-হুতাশ নেই। দাক্ষ্যায়ণীর কাজটা খুব বড় ক'রেই হবে, তার আয়োজনে ব্যাপৃত রইল— অপরেশ আর বয়স্থ প্রতিবেশীরা ব্যাপৃত ক'রে রাখলেনই বলা ঠিক হবে; ওর নিজের যেন অনেকটা ছাড়া-ছাড়া ভাব, নির্লিপ্ততা! সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ ক'রে সেটাকে ভাষায় নিয়ে এলে এইটেই দাঁড়ায়— এসবের আর অর্থ কি আছে ?

সঙ্গ পরিহার করে। অপরেশ প্রায় রোজই আসেন, কাজের বিষয়ে আলোচনা করতে। দু'তিন দিন ওকে সঙ্গে ক'রে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন, কিন্তু বিশেষ যেন সাড়া পান না। চিন্তিতই হয়ে পড়লেন। শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়ে একটা মাস কেটে গেল।

দিন তিনেক পরের কথা। দান-খয়রাৎ-ভোজে বিশিষ্ট রকমের

বড় কাজটার জের তখনও রয়েছে ; মাস্টারমশাই রোজই সন্ধ্যায় যান, সেদিনও বেরুবেন, দেখেন, ফটকটা খুলে বীরেশ আস্তে আস্তে প্রবেশ করল। উনি এগিয়ে গিয়ে ওকে সঙ্গে ক'রে বারান্দায় নিয়ে এলেন। দুটো চেয়ারে মুখোমুখি হয়ে বসলেন দু'জনে।

চুপচাপই গেল খানিকটা। মাস্টারমশাইও কি ব'লে আরম্ভ করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না।

তারপর একসময় কোঁচার খুঁটটা তুলে নিয়ে চোখ দুটো মুছে নিতে, যেন কিছু একটা বুঝে নিয়ে অপরেশ বললেন—"চলো—বরং আমরা পুকুরের ওধারে গিয়ে বসি ; জ্যোৎস্নাও রয়েছে এখন।"

নিঃশব্দেই দু'জনে বাগানের মধ্যে দিয়ে গিয়ে চাতালটার ওপর পাশাপাশি বসলেন। আর বিলম্ব হোল না। কোঁচার খুঁটে চোখ মোছায় যে সন্দেহটা করেছিলেন—এতদিনের অবরুদ্ধ শোক একেবারে বাঁধ ভেঙ্গে নেমে এল। "আমি মাকে মেরে ফেলেছি স্যার!" —বলে দু'হাতের অঞ্জলিতে মুখ ঢেকে হু হু ক'রে কেঁদে উঠে অপরেশের হাঁটুর ওপর লুটিয়ে পড়ল বীরেশ।

দরকার ছিল এ কান্নাটার, অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে যেতে দিলেন অপরেশ, আস্তে আস্তে পিঠে ডান হাতটা টেনে যাচ্ছেন। বেগটা স্তিমিত হয়ে এলে একটু ঝুঁকে বললেন—"ওঠ বীরেশ, উঠে বোস। এবার তোমার কিছু বেশি বিলম্ব হওয়ায় তিনি একটু কাতর হয়ে পড়েন ঠিকই, তা হলেও সুস্থই ছিলেন, আমি তো প্রায়ই দেখা করতে যেতাম…"

"সে জন্যে নয় স্যার। আমি তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছি…ওঃ, কী করি? কী প্রায়শ্চিত্ত আছে আমার? উফ্…"

—আবার একটু ভেঙে ওঁর উরুতে মাথা ঘষতে লাগল। অপরেশ হতবাক্ হ'য়ে গেছেন। একটা কথা মনে উঁকিঝুকি মারছে, কিন্তু জিহ্বায় আটকাচ্ছে, একটা মাঝামাঝি ঠিক ক'রে নিয়ে বললেন— "তবে? আর কি কারণ হ'তে পারে? …অবশ্য, যদি আপত্তি থাকে…"

"…না, আমি বলব স্যার—বলবার জন্যেই এসেছি। আমি এ-পাপের ভার আর সহ্য করতে পারছি না।…ওফ্! কী হবে আমার?…"

কাৎরে কাৎরে কেঁদে চলল।

ওকে কাঁদতে দিয়ে অপরেশ বেশ ভাল ক'রে নিজের মন আর মুখের ভাষা গুছিয়ে নিলেন, তারপর ওর মুখের কাছে ঝুঁকে বললেন—"একটা কথা পরিবারে, সমাজে স্বীকৃত বীরেশ; সেটা হচ্ছে ছেলে, ছাত্র, শিষ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হলেই সে বন্ধুর সামিল। প্রয়োজন হলে অনেক রহস্যেরই—গোপন রহস্যেরই আদান-প্রদান করতে হয়, নৈলে অনেক গলদ থেকে যায়, যাতে ক'রে নানাভাবেই ক্ষতি হতে পারে…"

একটু থামলেন। বীরেশও চুপ করে রইল। তারপর যেন অনেক সংকোচ কাটিয়ে একটু স্খলিত কণ্ঠেই বললেন—"শুনেছি—কথাটা চাপা দেওয়ার চেষ্টাই হয়েছিল অবশ্য—স্বাভাবিকও—শুনেছি দাক্ষ্যায়ণী দেবীর একটা ফটো দেখার পর থেকেই—তোমার সঙ্গে একটি মেয়ের…"

"ওই—ওই আমার সর্বনাশ করেছে—ওই স্যার—ওই!…"

—স্তব্ধ, উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল বীরেশ, কান্নার রেশ থেমে গেছে, একেবারে ফণা-ধরা সাপের মতো আধ-শোওয়া হ'য়ে উঠে বসল। চোখ দুটো সাপের মতো জ্বলছে। দুটো সেকেণ্ডও নয় কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়ে আবার কান্না—

খুবই একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় প'ড়ে কিছু যেন স্থির ক'রে উঠতে পারছেন না অপরেশ; তবে স্থিতধী, সমদর্শী মানুষ, অপরাধ-নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যাচাই করবার ক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতা দুই-ই আছে, আবার মন খানিকটা গুছিয়ে নিয়ে পিঠে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন—"কিছু মনে কোরনা বীরেশ, এক অর্থে রমলাও কি আমার সর্বনাশ করেন নি? অন্তত লোকে তো তাই বলেছে; আমারও কখনও ধর্মত্যাগ ক'রে অনুতাপ হয়নি, দুষিনি রমলাকে আমার পথে এসে

দাঁড়াবার জন্যে—তাই বা জোর ক'রে কি ক'রে বলতে পারি? তফাৎ এই যে ওটার domain—ক্ষেত্র ছিল অন্য; ধর্ম, সমাজ; এটার domain বিশেষ ক'রে একটা বয়সে নারী-পুরুষের মনের সম্বন্ধ—দেহেরও বা নয় কেন?···এইখানে একটা প্রশ্ন এসে পড়ছে।··· এবার উঠে বসবে কি তুমি?"

বীরেশ উঠে সোজা হ'য়েই বসল, শুধু মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখল। অপরেশ যেন বিচারকের মসৃণ অচপল কণ্ঠে ব'লে যেতে লাগলেন—"প্রশ্নটা হচ্ছে, তুমি বললে তুমিই তোমার মায়ের মৃত্যুর কারণ, আবার বলছ—বেশ উত্তেজিতই হয়ে বললে, মেয়েটিই তোমার সর্বনাশের হেতু—উপস্থিত দাক্ষ্যায়ণী দেবীর মৃত্যুই নিশ্চয় তোমার সবচেয়ে বড় সর্বনাশ। তাহলে দু'জনেই দায়ী কি করে হবে? অন্ততঃ একজন মুখ্য আর একজন গৌণ তো নিশ্চয়।·· আমায় আরও একটু সঙ্কোচ কাটাতে হচ্ছে বীরেশ। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত আমাদের—পুরুষদেরই দোষ থাকে বেশি···তাহলে—তুমি উত্তেজিত হয়ে ওঠার জন্যেই বলছি···"

আরও একটু মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে এবার নীরবে অশ্রুবর্ষণ ক'রে যাচ্ছিল বীরেশ, চোখ দুটো মুছে নিয়ে ঘুরে বলল—"আমায় ক্ষমা করুন স্যার, প্রথমত আপনার সামনে উদ্ধত হয়ে ওঠার জন্যে, দ্বিতীয়ত ওর ওপর এমন একটা নীচ দোষারোপ করবার জন্যে···"

"তাহলে নেই ওর কোন দোষ!" —অতিমাত্র বিস্মিত হ'য়েই চাইলেন অপরেশ।

"বিন্দুমাত্রও নয় স্যার।···শুধু তাই নয়—সব দিক দিয়েই ও নিরীহ; নিষ্কলুষ···আমিই ওকে···মা গেলেন···কিন্তু সমস্ত পাপের দায়ী হয়েও আমি যে কত নিরুপায়···আপনাকে সব কথা শুনতে হবে স্যার···সাজা একদিন আপনার কাছে পেয়েছি—আজও সব শুনে আমার যা প্রাপ্য সাজা আমায় দিন, আমি মাথা পেতে নিতে এসেছি স্যার।"

কলোনীর প্রথম দিন থেকে বহরমপুরের শেষ দিন, স্টেশনে যতীন রায়ের সঙ্গে কথাবার্তা পর্যন্ত, সব কথা অকপটে একটি একটি ক'রে ব'লে গেল। অবশ্য কাহিনীর কাঠামোটাই, রোমান্সের দিকটা, ওর অনুভূতির দিকটা স্বভাবতই বাদ দিয়ে। বিপাশার অনুভূতির গভীরতাও তার আচরণের মধ্যে দিয়ে যতটা প্রকাশ পেল, তার বেশি অপরেশের গোচরে স্পষ্ট ক'রে আনা চলেনা; তবে দু'জনেই যে তারা অন্তরে বাহিরে নির্মল, নিষ্কলুষ, এ কথাটা স্পষ্ট করে দিতে বাকি রাখল না বীরেশ।

দীর্ঘ কাহিনী। শেষ হ'লে দু'জনেই অনেকক্ষণ নিশ্চুপ হ'য়ে ব'সে রইলেন। শেষে, অপরেশ একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন ক'রে বললেন—"আজ অনেকখানি রাত হ'য়ে গেল। অনেকটা দূরত্ব; কাল আবার এসো, একটু সকাল-সকাল। আমি নিজেই বিকেলে অতীনের ওখান থেকে হয়ে আসব যাতে ও আর না আসে, মাত্র দু'জনেই থাকি আমরা।

পরদিন সন্ধ্যায় একরকম নীরবেই দু'জনে ওপারে চাতালটায় গিয়ে বসলেন। তারপর ওঁর প্রথম কথা—"বিচারকের ভার দিয়ে রেখেছ বীরেশ, পাদ্রী পুরোহিতের কাছে ক্রিশ্চানদের কনফেশনের মতো অপকটে সবই বলেও গেলে, কিন্তু আমি তো দু'জনের কারুরই দোষ খুঁজে পাচ্ছিনা।"

একটু হেসেই চাইলেন ওর দিকে। এদিকে অনেক দিন পরে ওঁর মুখে প্রসন্নতার ভাব দেখে একটু বিস্ময়-পুলকিত হয়েই দৃষ্টি তুলে চাইল বীরেশ। "কিন্তু স্যার—" বলে কি বলতে যাচ্ছিল, উনি কানে না তুলে নিজের চিন্তা ধ'রেই ব'লে চললেন—"অবশ্য, একেবারে যে অপরাধ হয়নি তোমার একথাও বলা চলে না। কিন্তু মহাকালের দরবারে সে-অপরাধ তো টেঁ্যাকে না। একটি মেয়ে তোমার বোনের সঙ্গে সখ্যের জন্যেই তোমাদের ওখানে যাওয়া-আসা শুরু করল—তার

অভিভাবকেরা সহজ বিশ্বাসেই নীরব সম্মতিও দিলেন, কিন্তু তোমাদের বয়স এবং সে-বয়সের যা আকর্ষণী শক্তি সেটা তো কাজ ক'রে যাবেই। বিশেষ ক'রে, যে-পরিস্থিতির মধ্যে যাওয়া-আসা মেলা-মেশা—আংশিক বা কদাচিৎ সম্পূর্ণ নিভৃতেই—তাতে যে-মহাকালের বা মহাপ্রকৃতির এই মৌলিক রচনা, সেই আবার তোমাদের অপরাধী ব'লে সাব্যস্ত করতে পারে কি ক'রে ?"

একটু স্মিত হাস্যের সঙ্গে ওর মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে ব'লে চললেন—"যদিও সমাধানটা এত সহজ নয়। কথাটা হচ্ছে, মহাকাল, মহাপ্রকৃতি তো রয়েছেই, কিন্তু মানুষের সম্বন্ধ প্রধানত খণ্ডকালের সঙ্গেই, সেটাকে যুগ বলব। ঘটনা, পরিস্থিতি, পরিবেশ অনুযায়ী এক একটা যুগের ধর্ম-সমাজ-আচার-আচরণ তৈরি ক'রে না নিলে আমাদের চলেনা। কিন্তু তার সবগুলাই শাশ্বত নয় বলে তার মধ্যে জীর্ণতা এসে পড়ে। জীর্ণতার সংস্কার প্রয়োজন, কিন্তু একটা যুগ থেকে অন্য যুগে নিঃসাড়ে এসে প'ড়ে এমন একটা অভ্যাসে দাঁড়ায় যে সংস্কারের নামে আমাদের বুক কেঁপে ওঠে। ব্যাপারটা খুবই জটিল—ডিটেলে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি আপাতত আমাদের সামনে যা রয়েছে—বিবাহে জাতিভেদ, তার কথাই ধরি। পৃথিবীটা বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে এত ছোট হয়ে এক-সংসারত্বের দিকে এগিয়ে চলেছে যে, এটা আর কেউ মানতে চাইছে না। শুধু আমরা এই ভারতবর্ষেই—তাও শুধু হিন্দুরাই—এটা আঁকড়ে ধরে ব'সে আছি। অথচ এটা যে-বর্ণাশ্রমের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে বর্ণাশ্রমের আজ আর কিছুই নেই···"

—বলতে বলতেই হঠাৎ সব গাম্ভীর্য ঠেলে রেখে স্বভাববশতভাবে হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন অপরেশ। ঘাড় হেঁট ক'রেই শুনছিল বীরেশ, মুখ তুলে চাইতে বললেন—"এসব আপাতত এই পর্যন্ত থাক। কেউ শুনতে পেলে মনে করবে, 'বেম্মদত্যিটা' আবার ছেলেটার ওপর ভর করেছে। একেবারে তোমার এই 'স্পেসিফিক (specific) কেসটাতে এসে পড়া যাক'।"

আবার গম্ভীর হয়ে পড়লেন।—"আমার কাল রাত্রে ভাবতে, কি মনে হোল জান বীরেশ? মনে হোল, সমাজ যদি সুস্থ থাকত, সজীব থাকত, তাহলে গঞ্জনা-শাস্তির বদলে তোমায় তো পুরস্কৃত করবারই কথা।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে চাইল বীরেশ।

"তোমার সব কথা আগাগোড়া তো শুনলাম। আমার আশ্চর্য লাগছে, যেদিনই তুমি মেয়েটিকে ব'লে তার সম্মতি পেলে, সেইদিন থেকেই আবার তোমার মন উলটেও গেছে। প্রধানত তার কথাই ভেবে—তাকে ভালবাস, তার কল্যাণ চাও বলেই—তাকে বিরত করবার প্রাণপণে চেষ্টা করেছ—যেদিন তোমাদের বিবাহলগ্ন—যেদিন সে তোমার করতলগত, সেদিন থেকেই। সেটা ক্ষণিক একটা ভাবোচ্ছ্বাস নয় তোমার। বহরমপুরে মিস্টার রায়কে যেভাবে ব'লে এসেছ তাতে ; ওকে পাওয়ার ব্যাকুলতা বেশি কি ওকে না-পাওয়ার সংকল্প..."

সহানুভূতির গভীরতায় অশ্রু নেমেছিল বীরেশের চোখে, ঘুরে মুছে নিল। অপরেশ বললেন—"থাক এসবও, লজ্জা পাচ্ছ। এ-সংযম, এ আন্তরিকতা আমার আশ্চর্য লেগেছে ব'লেই খানিকটা বেরিয়ে পড়ল মুখ দিয়ে।"

একটু থেমে কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন—"মার মৃত্যুটা তোমার বড় লেগেছে। নিজেকে দোষী ক'রে আত্মগ্লানিতেই আরও এমনটা হয়েছে, নয়তো কারুর মা চিরকাল থাকেন না। তাঁর বয়স হয়েছিল, বৈধব্যের দশা, হিন্দুললনার পক্ষে তাঁর যাওয়াটা এমন কিছু খারাপ হয়নি। আর একটা কথা...তোমার মুখের ওপর বলতে বাধছে...তবে কাল রাত্রে ভাবতে ভাবতে আমি মনে মনে শিউরেও উঠেছি বীরেশ..."

"কী স্যার? বলুন।"—উৎসুক আগ্রহে দৃষ্টি তুলে চাইল বীরেশ।

"তোমার মা নিতান্তই একটা আকস্মিক আবিষ্কারের জন্যে মারা গেছেন। শুনলাম, চোরেরা তোমার যে-ট্রাঙ্কটা ভাঙে তার মধ্যে

তোমাদের দু'জনের একটা ফটো পাওয়া যায়। দাক্ষ্যায়ণী দেবীর হাতে যে এটা পড়ে সেটাও নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই। মুখুজ্জে মশায়ের হাতেই আগে পড়লে, পাকা লোক, উনি সরিয়েই ফেলতেন, এত বড় ট্রাজেডিটা গোড়াতেই শেষ হ'য়ে যেত। সুচু ছেলেমানুষ, একেবারে তাঁর হাতে তুলে দিল। এর মধ্যে তোমার ভূমিকা কতটুকু—ফটোটা কোনকালে তোলা—সেটা সূক্ষ্ম বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু আরও একটা সম্ভাবনা ছিলই।"

যেন আবার একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েই চুপ করে যেতে বীরেশ বলল—"সেটা স্যার···থাক···বলতে···"

"বলছিলাম,(মানুষ একটা বড় রকমের আত্মত্যাগের সঙ্কল্প ক'রে সেটা যে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত পালন ক'রতে পারবেই, এটা জোর ক'রে বলা যায়না। কত রকম দুর্বল মুহূর্ত এসে পড়তে পারে তার জীবনে, সাধারণভাবে ধরতে গেলে একটু-আধটু তো থেকেই যায় দুর্বলতা) এর ওপর, যেমন বললে, তুমি তাকে কথাও দিয়েছিলে—যদি মত না বদলায় তো সে যা বলবে তাই হবে।

তার মতন অবস্থায় পড়া একটা মেয়ে—বিশেষ ক'রে, তার মতন একটা মেয়ে, তার বলবার কি থাকতে পারে বলো। তারপর তার কাছে কথা রাখতে গেলে, তোমার মায়েব মৃত্যুর এই ট্রাজেডিটাও সেভাবে আসত···"

আবার দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠে লুটিয়ে পড়ল বীরেশ। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ভাঙা ভাঙা শব্দে কেঁদে যেতে লাগল—"জানি স্যার জানি, দিবারাত্রি আমায় এই চিন্তাই তাড়া করে গেছে···এদিক দিয়ে মা নিজে গিয়ে আমায় বাঁচিয়ে গেছেন। এ ট্রাজেডি—এর থেকে কি করে মুক্তি পাই আমি? চেষ্টা করেছি—কিন্তু তারই মধ্যে এও বুঝছিলাম—প্রতি মুহূর্তেই আমি দুর্বল হয়ে উঠছি—আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছি—মা নিজে গিয়ে আমায় বাঁচিয়েছেন স্যার···"

আঠার

অদ্ভুত একটা শূন্যতার মধ্যে কাটতে লাগল দিনগুলা ; সব কিছুই আছে, শুধু এক মা না থাকায় সব কিছুই যেন অর্থহীন হয়ে গেছে। কাজে মন বসাবার চেষ্টা করে, যান্ত্রিকভাবে ক'রে যায়ও খানিকটা, তারপরে অবসন্ন হয়ে পড়ে। জমি নিয়ে মোকদ্দমাটার তারিখ পড়েছিল, গেল না। অশৌচকাল শেষ হয়ে গেছে, মুখুজ্জেমশাই যাবে ব'লেই জানতেন, একেবারে শেষ মুহূর্তে ওর মনের কথা জানতে পারলেন। ভিন্ গাঁয়ে এক চাকলা ভালো জমি, একতরফা বিচারে হাতছাড়া হয়ে গেল। মুখুজ্জেমশাই অপরেশকে গিয়ে জানালেন ব্যাপারটা, বললেন—"এরকম হ'লে তো বাগান, পুকুর, শেষ অবধি বাস্তুভিটের দিকে পর্যন্ত হাত বাড়াবে লোকে।"

অপরেশ একটু চুপ করে থেকে বললেন—"অতটা নিশ্চয় ভয় নেই। এটা একেবারে টাটকা শোকের মাথায় এসে পড়েছিল তো। তাহলেও আপনি আমায় ওর দলিলপত্রগুলো একবার দেখিয়ে রাখবেন।...যাক্, বরং এই কেস্‌টার প্রসঙ্গ তুলে ওকেই দেখাবার কথা ব'লে রাখব।..."

রমলা দেবীও ছিলেন । তাঁর দিকে চেয়ে একটু ম্লান হেসেই বললেন,—"শোকটা বড় লেগেছে। লোকে হাত বাড়াবে কি, নিজে থেকেই হাতে সব তুলে দিয়ে না বসে।"

ফটোর কাহিনীটা এখন অঙ্গনার সবার সাধারণ সম্পত্তি। এ সম্বন্ধেও একদিন রমলা দেবী প্রশ্ন করলে চাপাই দিয়ে দিলেন কথাটা। বললেন—"শুনেছিলাম, দাক্ষ্যায়ণী দেবী ওকে নাকি নিজেই দেখে শুনে বিয়ে করতে বলেন। ফটোটা তাই নিয়েই হওয়া সম্ভব বলে মনে হয়। তবে, ওদের নিয়ম মতো এক বছর তো কোন শুভ কাজ হওয়ার জো নেই। ওটা তোলাই রইল এখন।"

ফটোটা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকার জন্যে আর একটা যে ব্যাপার হোল তা একটু অপ্রীতিকরই ওঁর পক্ষে। ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার জন্যে অঙ্গনার একটা অংশে বীরেশ আর অবন্তীকে নিয়ে একটা যে কাহিনী জেগে উঠছিল—অপরেশের একটা কূট চাল হিসাবে, সেটা পুষ্টির খোরাক পেল। অবন্তীর ওপর একটা কৌতূহল-দৃষ্টি এসে পড়তে লাগল। নির্বিকারই রইলেন অপরেশ।

বীরেশদের বাড়ি আসাটা বাড়িয়েছেন, তাকে অন্যমনস্ক রাখবার জন্যেই বিশেষ করে, কেননা বীরেশের বাড়ি ছেড়ে বাইরে যাওয়াটা বড়ই কমে গেছে। ফলে, নিজেকে নিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকা। যান, কিন্তু দাক্ষ্যায়ণীর কথাটা একেবারেই তোলেন না।

বিপাশা-ঘটিত কাহিনী তো অঙ্গনাতে একেবারেই ওঁদের দু'জনের মধ্যে নিরুদ্ধ। এমনকি উনি যতটা জানেন, ধরণীও ততটা জানে না।

বিপাশার কথা নয়, সুতরাং অসবর্ণ-বিবাহের কথাও আর ওঠে না। তারপর একদিন আবার দুটোই এসে পড়ল।

বীরেশ যা একটু বাইরে যেতও তা অপরেশের ওখানে। সেদিন প্রণবের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁর ওখানে নিমন্ত্রণ ছিল; অতীন, আরও কয়েকজনের সঙ্গে। খাওয়া-দাওয়া ক'রে সবাই চলে গেলে অপরেশ বীরেশকে আটকে রাখলেন। শরীরটা তেমন ভালো নয়, ওঁর বাড়ি গ্রামের অন্য প্রান্তে, কিছু বিশ্রাম ক'রে নিয়ে যাবে।

দু'জনেই খানিকটা বিশ্রাম নেওয়ার পর বাইরে এসে বললেন—"চলো, তোমায় খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি।"

বিকেল হয়ে এসেছে। গরম পড়েছিল, সকালে এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে সে-ভাবটা কেটে গেছে। একটা পাতলা মেঘের স্তর আকাশে ছেয়ে আছে; তবে, বর্ষণ-রিক্ত বলেই মনে হয়; বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

বাড়ি-ঘর নেই, দুদিকে ঘন গাছপালা; মাঝখান দিয়ে পিচ-ঢালা কলকাতা-ক্যানিঙের চওড়া রাস্তা। অনেকখানি গিয়ে বাঁ দিকে রাস্তা থেকে একটু নেমে একটা পুকুর। সামনে বেশ পরিচ্ছন্ন একটি ঘাট।

দু'দিকে বসবার জন্যে সানের বেঞ্চি। অপরেশ বললেন—"চলো একটু বসা যাক, বেশ মাঝামাঝি পড়ে জায়গাটা, বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা যায়, দু'জনে দু'দিকে চলে যাব।"

নেমে গিয়ে একটা বেঞ্চে বসলেন পাশাপাশি।

একটু অন্যমনস্ক থেকে উনিই শুরু করলেন কথা—

"জানিনা এটা বোসের গঙ্গা, কি ঘোষের গঙ্গা, কি ঘোষালের, তবে আদি গঙ্গা স্রোত হারালেও আল বেঁধে বেঁধে তাঁকে এভাবে আটকে রাখা—এটা এক দিক দিয়ে আমার বড় অদ্ভুত লাগে বীরেশ ; অদ্ভুত হলেও, ভালোই। ভক্তি অবুঝ হলেই, আন্-কোশ্চেনিং (unquestioning) হলেই তা শুদ্ধা ভক্তি। হিন্দুস্থানীদের মধ্যে একটা কথা আছে—"মন যব চাঙ্গা, তব কটোরামে গঙ্গা।' ঘোষের গঙ্গা, বোসের গঙ্গার মধ্যেও—কথাটার একটা প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় না? এদিক দিয়ে যাওয়া-আসা করতে এই পুকুরগুলা দেখলে আমার কথা-গুলো মনে হয়।"

একটু হেসে উঠে বললেন—এই ছাখো, আমি আবার তোমাদের মত সেই পৌত্তলিকতায় ফিরে যাচ্ছি না তো!"

পরক্ষণেই সুরটা পালটে গিয়ে বললেন—"যাক্, তোমায় ক'দিন থেকে একটা কথা বলব-বলব মনে করছি, বীরেশ, তোমার মার মৃত্যুর খবরটা মেয়েটিকে জানিয়ে দিয়েছ ? দুটো মাস তো কেটে গেল।"

অতিরিক্ত বিস্মিত হয়ে বীরেশ ওঁর মুখের দিকে চাইল, হঠাৎ উত্তর জোগাচ্ছে না।

বললেন—"বুঝেছি। আমার মুখে প্রশ্নটা বড় খাপছাড়া লাগছে। মেয়েটির সম্বন্ধে কি করবে না করবে আমার প্রশ্নের মধ্যে তার ইঙ্গিত একেবারেই নেই,...সেটা সম্পূর্ণ তোমার ওপর নির্ভর করে, এবং তিনি গেছেন ব'লে তোমার পথ যে পরিষ্কার হয়েছে, এমন কথা..."

"আরও কি বন্ধই হয়ে গেল না স্যার ?"

"সেই কথাই বলছিলাম। যাকে নিয়ে তোমার মার মৃত্যু, তা

যতই অপ্রত্যক্ষ হোক, তাকেই আবার কথা দিয়ে রাখা যে, সে চাইলে তাকে গ্রহণ করতে—এ জটিল গ্রন্থী কি ক'রে খুলবে আজ সত্ত সত্ত বলা যায় না। একটা চেষ্টা করছ, বহরমপুরে রায়কে বলেও এসেছ, তাতে যদি গ্রন্থীটা আপনিই খুলে যায়। জানিয়ে দেওয়ার কথাটা আমি কিন্তু এমন ভেবে বলছি না। দু'মাস হয়ে গেল, রায় যে কবে বলবার সুবিধা করতে পারবে জান না, প্রভা যে-ধরণের স্ত্রীলোক, যেভাবে মুঠোর মধ্যে করে নিয়েছে তাকে, ঘুণাক্ষ'রও জানতে পারলে রায় এগুতে সাহসও করবে না। যতটা শুনলাম তোমার মুখে, মেয়েটি বড় ভালো। নিরীহ আর নিরুপায় তো বটেই—খবরটা পেলে সে অন্ততঃ এ সান্ত্বনাটা পাবে—'সান্ত্বনা' কথাটা হয়তো ঠিক হোল না—অন্তত এটা বুঝতে পারবে এখন মার বাৎসরিক পর্যন্ত একটা বছর, অন্তত দশটা মাস তোমার আর কিছু করবার নেই। তার মধ্যে…"

বীরেশ মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে হাতে চোখ দুটো মুছে নিতে থেমে গেলেন উনি। ও আবার ঘুরে একটা ঢোঁক গিলে সহজ গলাতেই বলল—"জানিয়ে দোব স্যার।"

এ ব্যাপারটা আর তোলবার ইচ্ছা না থাকলেও উনি জিজ্ঞেস করলেন—"কি করে?"

"রায়কেই লিখে দোব। তার অফিসের ঠিকানাতেই।"

"তাই কোর।…উঠবে?"

"একটু বসবেন না? মা বড় বেশি খাইয়ে দিয়েছেন। মা না থাকলেও এদিক দিয়ে মায়ের অভাব হয় না তো।"—একটু হাসল।

"বোস একটু তাহলে। একটু পরেই কিন্তু গ্রামের মেয়েরা জল নিতে আসবে।"

"এ পুকুরটায় খুব কম। কাছাকাছি লোকালয় নেই তো। আমি মাঝে মাঝে এসে ব'সে থাকি এখানে।…একটা কথা আমিও ক'দিন থেকে বলব-বলব মনে করছি স্যার। আমাদের একটা কাগজ বের

করার কথা হয়েছিল। 'অক্ষয় তৃতীয়া'তেই। তা তো হোল না। ভাববেন কথাটা এবার ?"

"কাগজ বের করার কথা বলছ ?"

—বলে উনি শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ গেল ; যেন স্মৃতি-মন্থনে তলিয়ে গেছেন।

উদ্বিগ্নভাবে প্রতীক্ষা ক'রে বীরেশ একসময় বলল—"আপনি চুপ ক'রে গেলেন স্যার।"

"কাগজটা সম্বন্ধে আর কথা তুলব না ভেবেছিলাম বীরেশ, ঘটনাচক্রে বেশ চাপা পড়ে গিয়েছিল। সেই জন্যে তোমার মেয়েটিকে একটা খবর দিতে বললাম, কিন্তু তার সঙ্গে যে কাগজ বের করারও সম্বন্ধ আছে এ-কথাটা তোমায় বলিনি।"

"কী সম্বন্ধ স্যার ?"

"গোড়া থেকেই বলতে হয় তাহলে। তুমি বাইরে চলে গেলে, এর মধ্যে ছুটো নাম-করা সাপ্তাহিকে আমি, 'অঙ্গনা' নাম দিয়ে আমরা একটা প্রগতিশীল কাগজ বের করছি বলে বিজ্ঞাপন দিই, ঠিকানা দিয়ে। এর মধ্যে গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা পাঠাবার কথা থাকে। সাহিত্যে প্রগতির ভাব-ভাষা-বিষয়বস্তু যে কোন্ দিকে যাচ্ছে তার কিছু কিছু নিশ্চয় জান। সে যা লেখার বন্যা নেমে এল, সামলানো যায় না। বলবে, সেসব তো না ছাপলেই হয়। কিন্তু পড়তে তো হবে বাছাইয়ের জন্যে, সে আমিও পারব না, তুমিও পারবে না। সোবার (sober) গোছের যে একেবারেই ছিল না, এমন নয়। তবে বেশির ভাগই কাঁচা বলেই সোবার। কাগজের পরিকল্পনা বাদই দিতে হবে। তুমি ফিরে আসার অপেক্ষা করছিলাম, এই সময় আমার হাতে একটি কবিতা এসে পড়ে। কাঁচা লেখাই, ছন্দের বাঁধুনি আলগা, কিন্তু এত মর্মস্পর্শী, বিরহের প্রতীক্ষায় এত আতুর যে আমার মনে হয়েছিল ওটা, আর তার সঙ্গে সোবার টোনের লেখাগুলো মেজে-ঘষে না হয় একটা সংখ্যা বের করেই দেখি। কবিতাটি দীর্ঘও।

এরপর তুমি এসে গেলে। অনেক ব্যাপার ঘটে গেল। চাপাই পড়ে যাচ্ছিল কথাটা, এমন সময় তোমার ওদিকের কাহিনীটা সব শুনলাম।"

আবার একটু চুপ করে গেলেন; যেন মস্ত বড় একটা দ্বিধায় পড়ে গেছেন। তারপর আবার দৃষ্টি নামিয়ে এনে বললেন—"অবশ্য, তোমার কাহিনীর সঙ্গে বিশেষ কোন মিল নেই; এক প্রতীক্ষা করে থাকা ছাড়া, তবু আমার মনে হোল—মেয়েটি বড় ভালো বলেই মনে হোল—একটা খবর তাকে দিয়ে দিলে কেমন হয়? তুমি আবার যাবেও বলেছিলে, আবার রায়কে বিরত করবার জন্যে চেষ্টাও করতে বলে এসেছ। মনে হয় শীঘ্র এখন যে যেতে পারবে না সেটুকু জানিয়ে দেওয়া ভালো। আর যাই হোক···"

গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ। বিষয়টা নিতান্তই প্রচ্ছন্নভাবে, ইঙ্গিতে-ইসারায় এতটা পর্যন্ত বলে এসে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—"দেখবে কি লেখাটা? ঠিকানা নেই, নাম যেটা দিয়েছে সেটা ছদ্মনামই বলে মনে হয়। পদ্যটা খুবই—কি যে বলে···"

"থাকনা স্যার। কাগজটা যখন বের করছেনই না···"

"তাহলে থাক; সেই কথাই ভালো।···না, কাগজ বের করা হবে না। অন্তত এখন তাড়াতাড়ি নয়। যত ভাবছি, বাধাগুলোই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সব চেয়ে বড় বাধার কথা তোমায় বললাম। উল্ট যে-হাওয়াটা একটু একটু শুরু হয়েছে, কাগজটা কিছুটাও সেই-মুখো ক'রে বের ক'রতে পারলে একটু সার্থকতা ছিল, কিন্তু অনুকূল মনে হলেও সেটা ঠিক অনুকূল নয়। অনুকূল হাওয়ার লক্ষণ, সেটা একটানা হবে, স্থায়ী হবে। এটা এলোমেলো। বেশ, এর ভালো দিকটা বেছে নিয়ে গল্পে প্রবন্ধে এটাকে একটু এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা গেল। কিন্তু আমার সম্পাদনায়—আমি ব্রাহ্ম বলেই স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, অবাধ বিবাহ—এসব বিশ্বাস করি বলেই যে আলোড়নটা হবে, বিশেষ করে অঙ্গনার মতো জায়গায়, সেটা সামলানো যাবে না।

তারপর, নিজেদের মধ্যে অস্বীকার ক'রে লাভ নেই, তোমার ব্যাপারটা —যা নিয়ে একটা গুঞ্জন উঠেছেই, সেটাও এসে পড়ছে এর মধ্যে।...

...তা হলে হাওয়া একটানা অনুকূল হাওয়া...অবশ্য হবেই একদিন...কিন্তু, সে কতদূর ?"

সেই সুদূরের দিকে দৃষ্টি মেলে আবার চুপ করলেন। পরে ঘুরে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের স্বরে বললেন—"হবেই বীরেশ, হতে হ'বে। ধরিত্রী একটা নবযুগের জন্ম দিচ্ছে। এসব তারই আশা, তারই বেদনা। আর দেরিও নেই বেশি। স্ত্রী-অবরোধ ঘুচিয়ে, স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা, মানুষ হিসাবে তাদের সমান অধিকার—এসব মেনে নিয়েছে সমাজ। অবাধ বিবাহও, অনেকখানি। তবে, তাও এখন সবার জন্যে নয়। অর্থাৎ সবার মধ্যে নিরপেক্ষভাবে কল্যাণ এনে দিতে পারছে না এখনও, অন্যভাবে অকল্যাণের না হলেও...যেমন ধর তোমার দৃষ্টান্তটাই।"

এতই অকস্মাৎ আর উদ্দীপনাময় যে, বীরেশ একটু চকিত হয়েই দৃষ্টি তুলে চাইল। উনি বলে চললেন—

"আমি মেয়েটির কথা জানিনা। পারিবারিক সংস্কার, বিশ্বাস, বাবা-মা আছেন কিনা, কিরকম মনোভাব নিয়ে কিরকম অবস্থায় আছেন —কিন্তু তোমার মা যে তোমাদের বিবাহের ব্যাপার নিয়েই মারা গেলেন এটা তো মানতেই হয়। কারণটা কি, না ঐ যুগ-যুগের সংস্কার, যার মধ্যে বিশেষ ভাবে গড়ে উঠেছেন উনি। এইরকম উদাহরণই তো বেশি। এইগুলো পরিষ্কার হ'য়ে গেলে আর কোন গোল থাকবে না। কিন্তু যৌবন তো নিজেরই ধর্মে অত ভেবে কাজ করে না। সেই হয়েছে এই যুগের ট্র্যাজেডী। যা তোমার বেলায় হোল। যদিও তোমার শিক্ষা, বিবেক, মনের গঠন অন্যরকম ব'লে সতর্কই হয়ে গেলে। কিন্তু, আবার সেই সতর্কতার জন্যেই, যুগধর্মের আবার কত বিপদ, কত নব নব সমস্যা! একটা দুষ্ট-বৃত্ত, বা, ভিসস্ সার্ক্‌ল, নয় ?

তাহলেও মূলত এগুলা কল্যাণই, অবস্থাগতিকে অকল্যাণে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এই মনোবৃত্তিই সমাজের ভবিষ্যত আশা; তাকে সুদরে দেবে। আমি রায় আর প্রভাদের কথা ধরছি না। তাদের হোল নিছক স্বেচ্ছাচার। কখনও পুরুষে মেয়েকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। কখনও মেয়েই পুরুষকে আটকে রেখে নিজের অভিসন্ধি সিদ্ধ করছে। এদের প্রেম নয় বীরেশ, ক্ষণিকের মোহ, ক'টা দিনের জন্যে যৌবনকে শান্ত রাখা। তাই টঁ্যাকেনা··, টঁ্যাকবার নয় বলেই এদের জন্যে ডিভোর্সের—বিবাহ-বিচ্ছেদের দরজাটা খোলা। যে-বিচ্ছেদের জন্যেই অন্যদিকে, মেয়েটিকে হতাশায় দিশেহারা হয়ে নিজের মনটাকে কবিতায় ঢেলে দিতে হয়েছে। তোমরা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিকে চেষ্টা করছ, একটা যুগ-যুগান্তরের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, ওরা সেই প্রশ্নটাকে বিকৃত করে পেছনে টেনে রাখছে সমাজকে।"

থামলেন। বললেন—"অনেকখানি বকে গেলাম। অনেক কথা জমে উঠেছিল মনে। কাগজের চিন্তা যে আমি একেবারে ছেড়ে দিয়েছি, এমন নয়। অগ্রগতি আর পশ্চাৎ-গতির মাঝামাঝিও একটা গতি আছে; একদিন আবার অতীনকে নিয়ে বসা যাবে।···ওঠ।"

উঠতেই তুটি মেয়ের ওপর নজর গিয়ে পড়ল। একজনের মাথায় আধ-ঘোমটা, একজনের খোলা। হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তু'জনের কাঁখেই পিতলের ঘড়া। ঘাটের একপ্রান্তে একটা টগর-করবীর ঝাড়। কখন এসে তার আড়ালে প্রতীক্ষা করছিল, গল্পের ঝোঁকে লক্ষ্য হয়নি।

"এসো মা, আমরা যাচ্ছি"—ব'লে অপরেশ বীরেশকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন। নীরবেই। রাস্তায় উঠে একটু নিম্নস্বরে বললেন—"স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতার হুড়োহুড়িতে আবার একদিকে

আমরা যে এই চিরন্তনী 'অঙ্গনা'কে হারাতে বসেছি, বীরেশ, সে-ক্ষতিপূরণটা কে করবে ?…"

হেসে ওর পিঠে হাত টেনে দিয়ে বললেন—"আজ আর প্রশ্ন নয়। ··যাও।"

উনিশ

পুকুরটা মাঝামাঝি পড়লেও বাড়ি প্রায় মাইল খানেক পথ।

কবিতাটি যে কার তা আর বুঝতে বাকি নেই। বাকি নেই নিশ্চয় মাস্টারমশায়েরও। দেখাতে যে চাইলেন তার মধ্যে এই কথাটাই প্রচ্ছন্ন ছিল। নিতান্ত কষ্টে, নিতান্তই গুরুর হাত থেকে প্রণয়িনীর চিঠি নেওয়া যায়না বলে ও-ও নিতে পারল না।

অত্যন্ত ইচ্ছা করছে কিন্তু একবার দেখতে। ছদ্মনামের মতোই কবিতার ছদ্ম আকারে চিঠিই তো একটা; তার উদ্দেশ্যেই লেখাও।

কবিতা থেকে কবির ওপর মনটা গিয়ে পড়ল। বর্ষা আরম্ভ হোল। আজ তার দ্বিতীয় বা তৃতীয় পদক্ষেপ। আজকের মতোই একটি বর্ষণক্লান্ত সন্ধ্যায়, বাতায়নের স্তিমিত আলোয় নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে লিখছে বিপাশা। দেখতে পেলে মূল খাতাটায় দেখা যেত, এখানে-ওখানে অশ্রুবিন্দু ঝ'রে প'ড়ে অক্ষর গেছে ঝাপসা হয়ে।… যদি দেখতে পাওয়া যেত কোনরকমে।

হঠাৎ নিজেকেই চমক লাগিয়ে একটা কথা মনে হতে থমকে দাঁড়িয়েই পড়ল বীরেশ। নিজে গিয়ে দেখা করলেও তো পারে, আর রায়কে চিঠি না লিখে। বাধা কি ? কাগজটাও বেরুচ্ছে না।

সময়েই এসে পড়েছে। ভত খেয়াল হয়নি, আকাশে পাৎলা মেঘের আস্তরণটা কখন্ ঘন হয়ে এসেছে। বড় সড়ক থেকে নিজেদের মাটির পথে নামার সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি নামল। ঐটুকুতেই ভিজে গিয়ে বারান্দায় উঠতে সুচিত্রা ঘোষণা করল—"মা, ঐ তোমার আদুরে গোপাল ভিজে বেড়ালটি হয়ে এসে গেছেন !"

"কথার ছিরি দেখেছ মেয়ের ! কোথায় শুকনো তোয়ালে কাপড় এগিয়ে দেবে, না···"

—আপনিই নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। সুচিত্রা গেঞ্জি নিয়ে এসে দাঁড়াল। উনি গলা বাড়িয়ে বামন ঠাকরুণকে চা আর হালুয়া করতে বলে দিতে বীরেশ বলল—"হালুয়া ওসব থাক, শুধু চা।" নিজেই গলা বাড়িয়ে বলল--"শুধু গ বামনপিসি !"

"কেন রে ? সেই কখন্ তো খেয়েছিস। ওঁদের সকাল সকালই হয়ে যায়।"

"মা···মানে রমলাদেবী তুদিনের যুগ্যি খাইয়ে দিয়েছেন একেবারে।"

উনি খাটে বসেছেন, বীরেশ একটা চেয়ারে। সুচিত্রা দলুকে নিয়ে কি একটা খেলার পরিকল্পনা ঠিক করছিল বারান্দায় ; তাইতে লেগে গেল। বৃষ্টি বেশ জোরে নামল। এদের গল্প চলেছে। নূতন বর্ষা নিয়েই। বামনঠাকরুণ তু'কাপ চা দিয়ে গেলেন। গৌরীদেবী নিজেরটা হাতে নিয়ে বললেন—"নামুক ভালো করে বাপু, কাজলের জলটা একেবারে পেটে নেমে গিয়েছিল। চারিদিকেই পুকুর ডোবা সব শুকিয়ে আসছে···"

বীরেশ একটা চুমুক দিতে গিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল।

"হাসলি যে ?"—বিস্মিত প্রশ্ন করলেন গৌরী দেবী।

"হাসলাম মাসিমা—পুকুর ডোবার কথায় একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার—মাস্টারমশাই বোধহয় এবার তোমাদের মতন শিবপূজো আরম্ভ করবেন।"

"কি রকম ?"

"ঘোষ না, বোস—কাদের 'গঙ্গার' ঘাটে এতক্ষণ বসেছিলাম আমরা"—বলতে বলতেই মুখের ভাবটা বদলে গেছে, বলে চলল—"হাসছি বটে, কিন্তু হাসির হ'য়েও হাসির কথা নয়। যতই দেখছি শুনছি, ওঁর যেন থৈ পাচ্ছি না।···নামটাই যেন 'গঙ্গা', কিন্তু আসলে

তো পুকুরই; তা লক্ষ্য করছিলাম, বলতে বলতে ভাসাভাসা চোখ দিয়ে যেন জল বেরিয়ে যাবে!…”

“যে দরের মানুষ, ওঁরা কি কারুর দেবদেবী নিয়ে অশ্রদ্ধা দেখাতে পারেন বাবা? তার জন্যে আলাদা মানুষ আছে।”

হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে একটু চকিত হয়ে উঠেই বললেন—“ওরে বীরু, হিন্দু হবেন কি, হিন্দু তো হয়েই গেছেন উনি! কেন, তোকে কিছু বলেন নি?”

“কৈ, না তো।”—একটু ভেবে নিয়ে উত্তর কবল বীরেশ।

“তরশু আমি আর ও-বাড়ির দিদি বেড়াতে গিয়েছিলাম। গিন্নীর সঙ্গে প্রায় ঐ কথাই তো হোল যতক্ষণ ছিলাম। অবন্তীর বিয়ের জন্যে একটু ব্যস্তই ছিলেন ওঁরা—ওঁদের পদ্ধতি মতো একেবারে—কি যে বলে, ইয়ে করে বিয়ে দিতে চান না তো—খোঁজ করছিলেন, শেষ-কালে পেয়ে গেছেন।”

“বেশ তো, তাতে…”

“ছেলেটি হিন্দু। কাশীতে বাড়ি, ব্রাহ্মণই। ব্রাহ্ম পরিবারে বিয়ে দিতে একেবারে আপত্তি নেই বাপমায়ের। ছেলে ডাক্তারি পাশ করেছে, বিয়ের পর বিলেতে তিন বছর থেকে পড়তে যাবে। তোকে কিছুই বলেননি?”

“বলবেন নিশ্চয়। আজ আমাদের একেবারে অন্যধরণের কথা হচ্ছিল। ফাঁক পাননি। বেশ ভালো খবরই একটা। মেয়েটি সৎপাত্রে পড়বে। বড় ভালো মেয়ে…”

“ওমা, ভালো নয়? রূপে গুণে অমন একটি মেয়ে অঙ্গনায় বের করুক দিকিন কেউ। পোড়া সমাজ! খালি হিংসে দলাদলি নিয়েই আছে সব। অমন একটা হীরের টুকরো গ্রাম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, কারুর হুঁস হোল না! ওরা সোজা ব্রাহ্মণ নয়, কাশীর ব্রাহ্মণ। ড্যাং ডেঙিয়ে নিয়ে চলল।…আজকাল সবই হচ্ছে, ভুলেও যেত সবাই। তা কারুর হুঁস আছে এদিকে?”

চুপ করলেন। বেশ একটু আক্রোশ গ্রামের ওপর। বীরেশ অল্প হাসির সঙ্গে চায়ে চুমুক দিয়ে যাচ্ছে।

একটু পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার প্রায় আপন মনেই আরম্ভ করলেন উনি—"আমার হয়েছিল ইচ্ছে বাপু, নুকুব কেন? সবই তো হ'য়ে যাচ্ছে, যা যুগ পড়েছে…ভেবেছিলাম দিদিকে বলি, রাজি করি, তা…"

"আমার রাজি হওয়ার কথাও তো আছে মাসিমা, তা, আমি তো বোনের মতোই দেখে এসেছি বরাবর। সেইজন্যেই আরও…"

ধমক দিয়ে উঠলেন গৌরী দেবী—"থাম তো বাপু! ওদের মতন আমাদেরও নাকি সবাই 'ভ্রাতা-ভগ্নীর' দল! জ্বালাসনি!…"

বীরেশ বেশ ভালো করেই হেসে উঠল। বলল—"কিন্তু সে তো মিটেও গেছে মাসিমা। তার জন্যে আপশোস ক'রে আর ফল কি?"

ভাবাবেগের জন্যে একটু লজ্জিতই হয়ে পড়ে থেমে গেলেন গৌরী দেবী। একটু মগ্নস্বরেই বললেন—"মিটেই অবিশ্যি গেছে, আর চাবা নেই। তবে অমন একটা মেয়ে…"

হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে বলে উঠলেন—"হয়েছে। তাহলে এবার তুই বিয়েটা করে ফেল বাবা—আর মানাচ্ছে না। বাড়িতেও আর টেঁকা যাচ্ছে না।"

"একটা বছর তো কিছু হবে না মাসিমা। মার বাৎসরিক পর্যন্ত। আমি না মনে করলেও, তোমরা যদি একটা শুভকাজই ব'লে মনে কর।"

"না; শুভ কাজ আর কি করে? তা, এসব ক্ষেত্রে পুরুতের বিধান নিয়েও তো হয়।"

হেসে ফেলল বীরেশ। বলল—"সে অরক্ষণীয়া মেয়ের বেলায়। আমিও অরক্ষণীয়ই?"

"নয় যেন! তা দেখাশোনাও তো করতে হবে? তাই না হয় হ'তে থাক।…হ্যাঁ, এই বেশ মনে পড়ে গেল। ফটোর মেয়েটি কে

র‍্যা ? দিদিতো দেখলেন না, শুনলেন না, একেবারে বিছানা নিলেন। ঠিক করে বলবি, একেবারে নুকুবিনি বীরু, দিব্যি রইল আমার।"

—ভাবভঙ্গি বদলে কড়া চোখে চেয়ে রইলেন।

হাসি মুখে চেয়ে লঘুভাবেই প্রশ্ন কবল বীরেশ—"একটি বামনের মেয়ে। নেবে ?"

একেবারে শিউরে উঠলেন গৌরী দেবী—"ওরে বাবা! বামন! গোখরোর ছাঁ। বাড়ি এনে সবংশে নাশ হব শেষকালে ?"

"কেন মাসিমা ? এই তো তুমিই ভাবছিলে অবন্তীর কথা। ব্রাহ্মণই তো ওঁরা। বিয়েটা হচ্ছেও ব্রাহ্মণের সঙ্গেই।"

"ওরা হোল ব্রাহ্ম। কায়েতের সঙ্গে কায়েৎ, ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রাহ্মণ। ধরা-বাঁধা জাত ব'লে কিছু নেই তো ওদের।…থাক বাপু, তোর সঙ্গে তর্কে কে এঁটে উঠবে ? কথা দে। আমি এদিকে ঠিক করি। বিয়ে তো এক কথায় হয়ও না।"

"একটু চুপচাপ থাকো মাসিমা।"—অনুরোধের স্বরেই বলল বীরেশ।

"একটা বিশেষ দরকারে পড়ে গিয়ে বাইরে যেতে হচ্ছে। ঘুরে আসি, তারপর…"

"আবার বাইরে! এই তো এতদিন ধরে ছিলি।"

"হঠাৎই চলে আসতে হোল তো।"

"তা যা।"—নিরুপায় ভাবে কণ্ঠস্বর এলিয়ে দিয়ে বললেন। "তবে থাকবিনি বেশি দিন।"

পরক্ষণেই আবার সেই কঠোর হুঁসিয়ারি—"কিন্তু বামনের মেয়ে নয় বীরু। না, ও সইবে না।"

পরদিন অপরেশকে বলে আসতে গেল বীরেশ।

পৌঁছাতেই ওঁর প্রথম কথা—"বেশ, তুমিই এসে গেছ ? আমিই তোমার কাছে যাব মনে করছিলাম।…চলো, একটু বাগানের দিকে

বেড়াতে যাই। একটা বৃষ্টিতেই গাছগুলো কিরকম তাজা হ'য়ে উঠেছে দেখবে।"

বাগানে প্রবেশ করেই বললেন—"একটা বড় ভালো খবর আছে বীরেশ। কালই বলতাম তোমায়, কিন্তু যে ধরণের প্রসঙ্গ এসে পড়ল, তার মধ্যে ঢোকানো যেত না। ইয়ে—অবন্তীর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে।"

"শুনলাম স্যার কাল মাসিমার মুখে। ওঁরা বেড়াতে এসে মার মুখে শুনে গেছেন।· ·এত আনন্দ হোল! শুনেছি, কিন্তু ডিটেলে (Detail) শোনা হয়নি।"

বেড়াতে বেড়াতেই উনি সব ব'লে গেলেন।

ওঁদের হিসাবে অবন্তীর যে ঠিক বয়স হয়নি, এখনও ম্যাট্রিকের ছাত্রীই—এটা বীরেশ বুঝতেই পারে। তবে, এদিকে এসে, বীরেশের যাওয়া-আসার জন্যে ওর নাম অবন্তীর সঙ্গে যুক্ত করে যে একটা আলোচনা উঠেছিল, এটা ওঁকে ভালো তো লাগছিলই না, বাড়াবাড়ি হলে বীরেশও যে এতে আঘাত পাবে এই ভেবে উনি একটু ব্যস্ত হয়েই ভেতরে ভেতরে অবন্তীর বিবাহের জন্যে চেষ্টা করছিলেন। (অপরেশ হেসে বললেন—এর মধ্যে এটা যে "বেম্মদত্তির কূটচাল"—এমন কথাও মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল)। কয়েকটি ব্রাহ্মপাত্রের মধ্যে দুটি পাত্র মনের মতো ছিল, কিন্তু তারা মেয়ের বয়স আর শিক্ষার স্বল্পতা দেখে পেছিয়ে যায়। তারপর কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এই ছেলের পিতার সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করেন অপরেশ, বিজ্ঞাপনে unorthodox ideas অর্থাৎ পাত্রপক্ষের কোন রকম গোঁড়ামি নেই কথাটা দেখে। ঠিক হয়ে গেল।

সাদা প্রাণখোলা মানুষ, যেটুকু না বললেও চলত—বীরেশ-অবন্তী নিয়ে আলোচনা—সেটা পর্যন্ত অকপটে শিষ্যকে বলে বললেন - "Little Angana makes a history (ক্ষুদ্র অঙ্গনা একটা ইতিহাস গড়ে তুলল)। কেমন মনে হচ্ছে বলো।"

"চমৎকার স্যার !"—দীপ্ত মুখে উত্তর করল বীরেশ।

"কিন্তু orthodoxy একটু রয়েই গেছে।"

—প্রসন্ন দৃষ্টির সঙ্গে কথাটা বললেও বীরেশ একটু শঙ্কিত কণ্ঠেই প্রশ্ন করল—"কেন স্যার ?"

"পাত্রের আপত্তি নেই ব্রাহ্ম পদ্ধতিতে, তবে বাপমায়ের ইচ্ছা বিবাহটা হিন্দু মতেই হয়। ঠিক জিদ বা একটা সর্ত নয়, তবে ইচ্ছাটা তাই বলে মনে হয়। আমি রাজি হয়েছি। আদি সমাজে তো অনেকটাই তাই, আমি সম্পূর্ণভাবেই রাজি হয়েছি ; যদিও জানি আমাদের সমাজে অনেকে একটু ক্ষুণ্নই হবেন। শুধু এইটুকুই নয় বীরেশ, অঙ্গনা আমায় যেভাবে দুহাত বাড়িয়ে নিয়েছে, আমিও আমার মেয়ের বিয়েতে তেমনি ক'রেই কোল বাড়িয়ে দোব। মেয়েদের স্ত্রী-আচার আদি—যাঁরা আসবেন দয়া করে—তাঁরা যেভাবে চাইবেন সেইভাবেই হবে।···তাহলে একটা কথা বলি তোমায় বীরেশ। আমাদের জীবনের বড় বড় কাজগুলো ছেঁটে-কেটে হালকা ছিমছাম করে আনা—বিবাহের ব্যাপারেই যেটা শেষ পর্যন্ত রেজেস্টারি আফিসে গিয়ে দু'জনের দুটা দস্তখতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আফিস থেকে ফেরার পথে—আমি এর কখনই পক্ষপাতী ছিলাম না। (হেসে) হয়তো এক পুরুষে ব্রাহ্ম বলে রং ধরেনি। বেশ খানিকটা হৈ চৈ হোল, আলো বাদ্যি, খাওয়া-দাওয়া—সংশ্লিষ্ট দুটি হৃদয়ে আনন্দের একটা মৃদু লহর উঠুক—তাদের কেন্দ্র করেই তো এতটা হচ্ছে। মনে গভীর হয়ে বসুক ব্যাপারটা। তোমায় একদিন মহাকাল আর খণ্ডকালের কথা বলি আমি। মহাকালের গলার মালায় প্রতিটি ফুলের স্বাতন্ত্র্য আছে বীরেশ—তার বর্ণ, তার গন্ধ, তার সুষমা-সৌষ্ঠভ নিয়ে। এ হচ্ছে সেই জিনিস। বাদ দিতে গেলে আর থাকে কি ?"

শেষের দিকে কতকটা উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই ব'লে নিয়ে চুপ করে হেঁট মুখে কয়েক পা এগিয়ে এসে বললেন—"সবই তোমায় বললাম মোটামুটি। অপছন্দ বা অমতের কিছু যদি থাকে তো বলবে।"

"আপনার ব্যবস্থায় খুঁৎ থাকবে স্যার?"—বীরেশ হেসে বলে। জুড়ে দিল—"থাকলেও এত শীগগির বের করতে পারা যাবে?"

উনিও হেসে উঠলেন। বললেন—"বেশ, হাতে রাখো। পারলে বলবে কিন্তু খাতির না রেখে। ছেলে বিয়ের পর বিলেতে এম. আর. সি. পি'র জন্যে যাবে। ওদিকে আর দিন নেই—শ্রাবণের মাঝামাঝি দুটো দিন আছে, তারই একটা বুঝে-সুঝে ঠিক করবেন লিখেছেন। তুমি থাকছো তো?···থাকতেই হবে। যদি বাইরে কিছু দরকার থাকে তো সেরে এসে বোস'। দেখছ, একটু এম্বিশস্ স্কীমই (ambitious scheme) আমার। তোড়জোড় করতে সময় নেবে। নিশ্চয় সামলাতেও।"

"আমি কালই একবার বেরিয়ে পড়ছি স্যার।"

"কালই?"—মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে কি যেন মিলিয়ে নিলেন। প্রশ্ন করলেন—"মেয়েটিকে জানানো সম্বন্ধে রায়কে চিঠি লেখা হয়ে গেছে বোধ হয়?"

বীরেশ স্কুলের ছাত্রের মতোই ধরা পড়ে গিয়ে একটু ঘাড় হেঁট করে তখনই মুখ তুলে স্পষ্টই অপ্রতিভ হয়ে বলল—"রায় কি করবে না-করবে, ভাবলাম, নিজেই গিয়ে না হয় ওদের মাধ্যমে দেখাটা ক'রে নিজেই বলে আসি।"

"সেই ঠিক হবে।···হ্যাঁ, সেই ঠিক। অযথা একটা সাস্‌পেন্সে (suspense) ফেলে রাখা ঠিক নয়। চলো যাই এবার। ভালো খবর জানাবার উৎসাহে তোমায় চা থেকে বঞ্চিত করে এসেছি। তোমার মার মুখনাড়া খেতে হবে।"

দাক্ষ্যায়ণীর মতোই গৌরীদেবীরও নিশ্চয় অনিদ্র রাত্রি কেটে থাকবে। সমস্ত দিনও অন্যমনস্ক থেকে কথায়-কথায় ভুল করে কাটালেন। রাত্রে পাখা হাতে ক'রে খাওয়াতে বসে কতকটা স্পষ্ট,

কতকটা আত্মগতভাবে বলে গেলেন—"তা, মেয়েটি কেমন ?···ফটোতে তো মন্দ মনে হলনা···তা আর সবদিকে কেমন—স্বভাবটভাব ?"

"যেমন আর সব বাঙালীর মেয়ে হয়।···কেন ?"—কৌতুকের ভাবটা চেপে গম্ভীরভাবেই বলল বীরেশ।

"তাই জিজ্ঞেস করছি। বামন বলেই সাহস হয় না—নইলে এরকম তো হচ্ছেই আজকাল।···সেবার কলকাতায় বাপের বাড়ি গিয়ে তো শুনে এলাম···সময় পালটাচ্ছে···সবই মেনে নিতে হচ্ছে···শুধু বামন বলেই সাহস হয় না।···তাছাড়া, গ্রামে ঘোঁট একটা হবেই —সেটা সামলাতে···তুই কিন্তু বেশি দেরি করবিনি বীরু, আর-বারের মতন···একটা ঘোঁট তো অবন্তীর বিয়েতেও হবে। দেখা যাক্‌ সেটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়···"

কুড়ি

পরদিন খাওয়াদাওয়া করে বেরিয়ে প'ড়ে সেদিনটা কলোনীতেই কাটায়। সুযোগ বুঝে উদ্দেশ্যটা ধরণীকে বলে, দেরি হয়ে গেলে অঙ্গনা থেকে বার তুই ঘুরে আসতে ব'লে পরের দিনই সকালে বহরমপুর রওনা হোল।

সেই ট্রেনটাই ধরল, তবে এবারে সন্ধ্যা হয়ে এল। গাড়িটা ঘণ্টাখানেক লেট ছিল, ওদিকে কোথায় কিসের একটা মেলা চলছে তার জন্যেই, যখন পৌঁছল তখন স্টেশনে আলো জ্বালা হচ্ছে।

তারপর নেমেই এক নিতান্ত অপ্রত্যাশিত দৃশ্য—বিপাশা ! বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল। ভালোবাসার অসম্ভব, অদ্ভুত আশা—বিপাশা কি ক'রে টের পেল বীরেশ এই গাড়িতেই আসছে !···নিতান্ত ক্ষণিক একটা পুলক-বিভ্রম। তখনই দেহ থেকে সমস্ত রক্ত যেন নেমে গেল। বিপাশার সঙ্গে ওর দাদা। ভীড় ঠেলে আসতে একটু যা দেরি হয়েছে, নৈলে এতক্ষণ একেবারে মুখোমুখি হ'য়ে

পড়ত। বীরেশও ভীড়ে আটকে গেছে ; তাড়াতাড়ি জোর করে ঠেলেঠুলে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে নেমে পড়ে পাশের ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অদৃশ্যই হয়ে বেশ কিছুটা দূর পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে দেখতে লাগল। শুধু বিপাশা আর তার দাদাই নয়, আরও দুজন ওঁদের পৌঁছে দিতে এসেছেন—স্ত্রীপুরুষে। নিশ্চয় বিপাশার এখানকার প্রফেসার মাসতুত দাদা আর তাঁর স্ত্রী। দাদা বিপাশার সহোদরের চেয়ে কিছু বড়, প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। বিপাশা আর তার দাদা উপরে গাড়ির মধ্যে, এঁরা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। বিপাশাই যে তাতে আর ভুল নেই। নামার মুখে বীরেশের মনে হয়েছিল, বিপাশার নজর যেন ক্ষণিকের জন্যে আটকে গিয়েছিল ওর ওপরে। ওরই মতো অসম্ভব পরিস্থিতিতে অসম্ভব আশা···বিপাশা নীচে চিবুকটা চেপে অল্প অল্প মুখ ঘুরিয়ে কাকে যেন খুঁজছে ভীড়ের মধ্যে। ওপরের আলো প'ড়ে একটু শীর্ণ, পাণ্ডুর মুখটা চিক চিক করে উঠছে।

গার্ডের হুইসিল পেয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল।

ভীড়ের মধ্যে চকমকির স্ফুলিঙ্গের মতোই বার কয়েক ঝিকমিক করে মিলিয়ে গেল বিপাশা।

সমস্ত ব্যাপারটা এতই আকস্মিক আর অবিশ্বাস্য যে গাড়িটা দূরে অদৃশ্য হ'য়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হোল, সমস্তটাই একটা মায়া, দৃষ্টিভ্রম। মাথাটা দপদপ করছে। প্লাটফর্মের শেষের দিকে ফাঁকায় সেবারের সেই বেঞ্চটায় রগ দুটো টিপে খানিকক্ষণ বসে রইল।

বিপাশাই গেল তার দাদার সঙ্গে ; কিন্তু একেবারে উল্টোদিকে কোথায় ?···হ'তে পারে, ওদিকে ওদের কেউ আত্মীয়-কুটুম্ব আছে, ওর দাদা দেখা করতে এসেছে, ওকেও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে।···কিন্তু হালকা ব্যাগের সঙ্গে একটা বড় ট্রাঙ্ক ছিল, কুলি তুলে দিল। ছেড়ে যাওয়ার লক্ষণই।···ওর সেবারের আসার কথাটা কি বেরিয়ে পড়েছে ?···

তাহলেও, ওদিকে কোথায় গেল ?···সেই আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করে ফিরে যাবে দেশে ?···

মাথাটা আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। খেয়াল হোল, রায়েদের বাড়ি গেলেই সব খবর পাওয়া যাবে। রাত হয়ে যাচ্ছে। উঠে পড়ল বীরেশ। বাইরে এসে একটা ফীটন ধ'রে রায়েদের বাসায় গিয়ে উঠল। দরজা বন্ধ ছিল, কড়া নাড়তে চাকরটা এসে খুলে দিল। একটু চিনে নিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল—"ও, আপনি ? আসেন।"

"কেউ নেই বাড়িতে ?"

"শুধু বাবুই থাকেন ; এখনও এসেন নি।"

"ওঁর স্ত্রী—প্রভা দেবী ? তোর দিদিমণি ?"

"তিনি আর থাকেন না হেথায়।"

"মানে ?···কোথায় থাকেন ?"

"ভিন্ পাড়ায় : খানিক দূরে। মকদ্দমা চলছে তো।"

"কিসের ?"

"ওই যে কী বলে ভালো।···মানে, এক সাথে আর থাকবেন নি।"

একটু দাঁড়িয়ে ভাবল বীরেশ। চাকরটা বলল—"ভেতরে আসেন, বসেন। বাবুর আজকাল এসতে একটু বিলম্ব হয়।··· চা করি ?"

"না, করতে হবে না।"—একটু যে ঘোরের মতো এসে গিয়েছিল, সেটা কেটে গিয়ে উত্তর করল বীরেশ। বলল—"একটা খবর তুই দিতে পারবি ? তোর দিদিমণির কাছে সেই যে মেয়েটি পড়তে আসত, সে যায় আর ওখানে ?···মানে, তোর দিদিমণির কাছে। তোর যাওয়া-আসা আছে সেখানে ? জানিস ?"

"আমার যাওয়া-আসা নেই। বাবুর মানা আছে তো। তবে প্রফেসার বাবুর বাড়ির ঝি আমার মাসশাউড়ি হয়। তানার মুখে শুনি, আলাদা হওয়া ইস্তক বাইরের দিদিমণি আর ওনার কাছে যায়

না। কেচ্ছা রটে গেছে তো। আর তিনি তো নেইও ওখানে। আজই চলে যাওয়ার কথা ছেল…"

"কোথায় ?…" একটা খুঁট পেয়ে একটু আগ্রহের সঙ্গেই প্রশ্ন করল বীরেশ।

"এজ্ঞে, তা বলতে নারব। মাসশাউড়ি ঐটুকুই বলতে পারল। …বসবেননি আপনি ? বাবু কদিচ-কখনও এসেও পড়েন। তানার কাছে বেবাক সব খবর মিলবে।"

"না, আর বসলে চলবে না আমার।…নাও এটা ধরো। আমি যে এসেছিলাম এ-কথাও বলে কাজ নেই তোমার বাবুকে।"

—একটা পাঁচ টাকার নোট বের ক'রে হাতে দিয়ে একটু দ্রুত পদেই বেরিয়ে গেল। চায়না, দেখাটা হয়ে যাওয়া। হয়তো পেত আরও কিছু খবর, কিন্তু ওদের নোংরামির মধ্যে ঢোকবার অভিরুচি নেই আর। রাত্রিটুকুর জন্যে একটা ভালো হোটেলও খুঁজে বের করতে হবে।

পেয়ে গেল মোটামুটি একটা ভালো হোটেল। এক সীটের একটি ঘর ছিল, ভর্তি হয়ে গেছে। ও ছু'-সীটের একটা ঘর ডবল ভাড়া দিয়ে নিয়ে বেশ ভালো করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়ে নিল। ভালো করে স্নান করে শরীরটা ঝরঝরে করে নিয়ে বারান্দায় একটা ইজিচেয়ার বের করিয়ে ব'সে রইল। ঠিক বুঝতে পারছে না কেন, কিন্তু বেশ ভালো বোধ হচ্ছে। মুক্ত, স্বচ্ছন্দ। জীবনে এই প্রথম একা, নিরিবিলি থেকেও বিপাশার চিন্তাটাকে মনে আধিপত্য করতে দিল না। উদয় হলেই ঠেলে ঠেলে রেখে যেতে লাগল। আশার দিকে—নিশ্চয় কোনও আত্মীয়-কুটুম্বের সঙ্গে দেখা করতে গেছে, এবার ফিরে যাবে। মনটা নিরাশার দিকে ঝুঁকে পড়ল—আর কী হবে এই আলেয়ার পেছনে ছুটে বেড়িয়ে ?

অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে বেশ ভালো আহারের ব্যবস্থা করিয়েছিল ; সমস্ত দিনের ক্লান্তি, তৃপ্ত আহার, নিশ্চিন্ত মন—সব মিলিয়ে গাঢ়

নিদ্রার পর সকালে যখন উঠল, মনটা তখন একটা সদ্যস্ফুট ফুলের মতো তাজা। এরকম একটা মনে হতাশার ছায়া দাঁড়াতে পারে না। এই বিশ্বাসটা নিয়ে উঠল বীরেশ যে, বিপাশা ফিরেই যাচ্ছে বাড়ি। এই বিশ্বাসটাই পুষ্ট হতে লাগল। তার সঙ্গে একটা কথা—এবার তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার। তারপর কি—সে চিন্তাটাকে উঠতেই দিল না মনে।

তবে তাড়াতাড়িতে একটা প্রতিবন্ধক এসে পড়ল।

মনটা স্বচ্ছ, উদার হয়ে উঠলে মানুষে দেবদেবীদের ওপর সদয় হয়ে ওঠে। ওঁদের নিয়ে কোন কালেই বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না বীরেশের, তবে সেবার গোপীচরণের সঙ্গে এলাহাবাদ যাওয়ার সময় শান্তিপুর আর নবদ্বীপ বেশ ভালো লেগেছিল। ফেরার পথটা এবারও ঐ রকম ঠিক করে নিল—শান্তিপুর, নবদ্বীপ, সেখান থেকে ব্যাণ্ডেল হয়ে যাওয়া।

দর্শনাদি সেরে রাত্রিটা সেবারের পাণ্ডার বাড়িতেই কাটিয়ে পরের দিন সকালে প্রথম গাড়িতেই বেরিয়ে পড়ে দুপুরের কাছাকাছি ব্যাণ্ডেলে এসে পৌঁছাল। এ-গাড়িটা ঐ পর্যন্তই—ধুলিয়ান থেকে ব্যাণ্ডেল। নামতে হোল। পরের লোকাল ট্রেনে হাওড়া যাবে। ঘণ্টাখানেক দেরি আছে।

ব্যাগটা হাতে করে অলসভাবে প্ল্যাটফর্মের ফাঁকা দিকটায় পায়চারি করছিল। "একটু শুনবে বাবা?"—পেছন থেকে ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়াল বীরেশ। ঐখান দিয়েই এসেছে এইমাত্র। এগিয়ে গেল। একটি প্রৌঢ়া, কয়েকটা পুঁটুলি আর একটা মাঝারি সাইজের তোবড়ানো ট্রাঙ্ক সামনে রেখে বসে আছেন। বীরেশ কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল—"আমায় কিছু বলবেন?"

"বড় বিপদে পড়ে গেছি বাবা। লজ্জাতেও। এমন তো হয়নি কখনও। কারেই বা বলি?"

"কি হয়েছে ?"

"সে অনেক কথা বাবা, কত শুনবে ? এখন আমাদের যদি দয়া করে একটু বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পার তো রাধারমণ তোমার মঙ্গল করবেন। এটুকু নিয়ে গিয়ে শেয়ালদয় তুলে দিলেই হবে। তিনটি প্রাণী আমরা। কখনও পথে বেরুইনি, সঙ্গে একটি সমত্থ মেয়ে বাবা। বুড়ো মানুষ, বড় বিপদে পড়েছি···"

চোখ মুছতে মুছতে বলে যাচ্ছিলেন, বীরেশ প্রশ্ন করতে দূরে জলের কলটার দিকে চেয়ে বললেন —"ঐ হোথায় জল খেতে গেছে।··· ঐ আসছে বাবা।···রাত থেকে কিছু খায়নি, জল খেয়ে পেট ভরাতে গিয়েছিল বাবা।···কী যে হবে !"—চোখে আঁচল চেপে ভালো করেই কেঁদে উঠলেন।

একটি বছর কুড়ি-বাইশের মেয়ে আর একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে দূর থেকেই তার ওপর কৌতূহল-দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে এসে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল। চেহারা দেখলেই বোধ হয় অনশন-অর্ধাসন নিয়ে বহুদিনের একটা বিপর্যয় তাদের ওপর দিয়ে গেছে। মেয়েটি আধ-ঘোরা হয়ে ছেলেটির মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হতভম্ব হয়ে গেছে বীরেশ। পাড়াগাঁয়ের দিকের বিপন্ন পরিবার বলেই মনে হয়। ভদ্র, অথবা আধা-ভদ্র। বিপন্নও আর অভুক্ত যে সেটা তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। শুধু, সঙ্গে সমত্থ মেয়ে বলেই কেমন যেন এগুতে ভরসা হয় না—পথেঘাটের এরকম অনেক গল্প তো শোনা যায় আজকাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিলম্বিত ফসল সব। কি করবে ভেবে উঠতে পারছে না।

একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েই ঘুরে চাইতে চাইতে ছেলেটির মুখের ওপর নজর পড়ে গেল। কাতর আবেদনের দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। বীরেশ প্রৌঢ়াকে বলল—"আপনারা এইখানেই একটু থাকুন, আমি এক্ষুনি আসছি।"

"বের করে দেবেনা তো বাবা ? গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছে।"

পা বাড়িয়ে দিয়েছিল বীরেশ, একটু থমকে ঘুরে চাইল। বলল —"না, কোন ভয় নেই, বসে থাকুন আপনারা, এক্ষুনি আসছি।"

প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি গিয়ে ভেণ্ডারদের কাছ থেকে কিছু লুচি, তরকারি, মিষ্টি আর গোটা চারেক কলা নিয়ে এসে বলল—"আগে আপনারা কিছু খেয়ে নিন।···আপনার জন্যে কলা এনেছি।··· ঘটিটা খুলে দিন আমায়।"

একটা পুঁটুলির সঙ্গে একটা কাঁসার ঘটি বাঁধা ছিল, প্রৌঢ়া খুলে দিয়ে বললেন—"আমার মুখে কি রোচে কিছু? এই নাও, রাধারমণ তোমার মঙ্গল করবেন বাবা।"

প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে একটা ছোট কুঠুরির ধারে প্রৌঢ়া বসে ছিলেন, বীরেশ জল এনে দিতে মেয়েটি ছেলেটিকে নিয়ে তার আড়ালে চলে গেল। প্রশ্ন করে করে বীরেশ যে কাহিনীটা শুনল তা সংক্ষেপে এই—

ওঁদের বাড়ি চব্বিশ-পরগণায় ডায়মণ্ডহারবার লাইনে···নেমে ক্রোশ দুয়েক ভেতরের দিকে যেতে হয়। ওঁরা বৈষ্ণব, বাড়িতে নাড়ুগোপালের বিগ্রহ আছে, নিত্য পূজা হয়। স্বামী কিছু করতেন না। বিগ্রহের সেবা নিয়েই থাকতেন। কৃষ্ণলীলা নিয়ে যাত্রার পালা আর গান লিখে কিছু পেতেন, আর রাস ও দোলে জমিদারবাড়ি থেকে কিছু বাঁধা বৃত্তিও ছিল। তার সঙ্গে কয়েক কাঠা ক্ষেত, একটা ফলের বাগান মিলিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে চলে যাচ্ছিল।

গ্রাম ছেড়ে বড় একটা কোথাও যেতেন না। প্রৌঢ়ারও এই প্রথম বাইরে আসা।

বেশ চলে যাচ্ছিল। ভক্ত আর কবি বলে কাছাকাছি গ্রামাঞ্চলে একটু খাতিরই ছিল। এদিকে এসে হঠাৎ ঝোঁক হোল তীর্থ করার। জীবনে কিছু হোল না, শেষ বয়সে মথুরা-বৃন্দাবনে কাটাবেন। সে একরকম পাগলামিই। সমস্ত বেচে দিয়ে সবাইকে নিয়ে সেখানে থাকার সংকল্প।

মেয়ে বড় হয়ে উঠছে, তার বিবাহ দিতে হবে। সবাই অনেক ক'রে বুঝিয়ে স্থজিয়ে বলায় ঠিক হোল, একেবারে বেচবেন না, বন্ধক দিয়ে, রাধারমণের সে রকম ইচ্ছা থাকলে একবার এসে বিয়েটা দিয়ে অবসেরের মতো চলে যাবেন। সবাইকে চেষ্টা করতে বলে, বসত-বাড়িটুকু ছাড়া সব সম্পত্তি বন্ধক রেখে সবাইকে নিয়ে বিগ্রহ বুকে করে বেরিয়ে পড়লেন।

প্রৌঢ়া ক্লান্ত হয়ে চুপ করলেন। একটু হেসে বললেন—"রাধারমণ সবই করলেন বাবা। আমার কপালের সিঁছুর মুছিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। যার নিজের অবসর হোলনা তাঁর সেবা থেকে, পাড়ার পাঁচজনে তার মেয়ের কপালে সিঁছুর তোলবার ব্যবস্থা করবে! সেই যুগই নাকি রয়েছে!"

বীরেশের নজরটা একবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কপালে গিয়ে পড়ল। সরিয়ে নিয়ে কুণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করল—"কি হয়েছিল তাঁর?"

"কিছুই নয় বাবা। বেশ আনন্দেই ছিলেন। ছপুরের একটু আগে গোপীনাথের মন্দির থেকে এসে বললেন--মাথাটা ধরেছে---যখন তখন গিয়ে বসে থাকতেন তো।—তারপর ঘণ্টা তিনের মধ্যেই বদ্যি এসে ভাল ক'রে দেখতেও পেল না—সব শেষ। বললে পশ্চিমের 'লু' লেগে গেছে। নিজের সাধনার যুগ্যি মৃত্যু বাবা। কিন্তু আমায় তো টেনে নেওয়া উচিত ছিল--সারা জীবন একটা কথায় 'না' বলিনি ···ও বাবা!···"

ভেঙে পড়লেন। হতভম্ব হয়ে গেছে বীরেশ। বলল—"চুপ করুন। যা হবার···আর ভেবে দেখুন, আপনি গেলে এদের অবস্থাটা হোত কি!"

প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল—"আপনাদের এখানে নামিয়ে দিলে বলছেন—টিকিট এই পর্যন্তই ছিল?"

"তাও নয় বাবা। সমস্ত সম্পত্তিটা বন্ধক দিয়ে মাত্র পাঁচশ টাকা নিয়ে আসেন। মাস তিনেক ছিলাম। শেষই হয়ে এসেছিল, ফিরেও

আসছিলাম, এমন সময় এই বজ্রপাত বাবা। যা ছিল তা থেকেও খরচ হয়ে গেল। একেবারে নিঃসম্বল হয়ে বেরিয়ে এলাম বাবা—ভিখিরী ক'রে বের করে দিলেন রাধারমণ !...”

আবার ভেঙে পড়লেন। বীরেশ চুপ করাবার চেষ্টা করতে বলে চললেন—“শুধু ভিখিরী নয় বাবা—তঞ্চক—টিকিট মাত্র আসানসোল পর্যন্ত করবার পয়সা ছিল—ভাবলাম, বাংলা দেশে তো গিয়ে পড়ি... তারপর—তারপর—কেউ দেখলেও না রাত্তিরে—চোর—তঞ্চকের মতন এতটা চলে এসেছি...ও বাবা! এও ত কপালে লেখা ছিল !...”

কথা কইতেই কোমল স্থানে ঘা পড়েছে, এরপর আর একরকম কোন প্রশ্নই করল না বীরেশ, অন্তত এসব নিয়ে নয়। “বসে থাকুন, কোন ভয় নেই। কেউ এসে জিজ্ঞেস করলে বলবেন, টিকিট কিনতে গেছে নিজের লোক।”—বলে সাব-ওয়ের দিকে এগিয়ে গেল টিকিট ঘরে যাওয়ার জন্য, নিজের মনে যা করবার ঠিক করে নিয়েছে।

হাওড়ায় নেমে শিয়ালদয় ট্যাক্সি করে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পৌছে গেল। বলল “চলুন আপনাদের বাড়ির স্টেশনেই নামিয়ে দিয়ে আসি। আমার বাড়িও ঠিক ওদিকে না হলেও, অসুবিধে হবে না, দক্ষিণেই আমারও বাড়ি।”

স্টেশনে যখন নামল, তখনও অনেকখানি দিন রয়েছে। বলল—“কোশ দুই বললেন না? চলুন, দিয়েই আসি সঙ্গে করে।”

মৃদু আপত্তি করেই যাচ্ছেন প্রৌঢ়া। ট্যাক্সিতে হাওড়া থেকে আসতে এবারও। শুনল না। বলল “সন্ধ্যা হয়ে যাবে, একলা মেয়েছেলে।”

খেয়ালী মানুষ, মনে কিসের একটা জোয়ার নেমেছে, গতকাল সন্ধ্যা থেকেই। তার সঙ্গে বৃদ্ধের বৈরাগ্যও মিশে গেছে। বোধহয় কাহিনীটা শুনে। সন্ধ্যার একটু আগেই পৌছাল ওরা।

খেয়ালের বশেই হোক, বা, মনে যে জোয়ারটা ঠেলে এসেছে,

তার জন্যেই হোক, ফেরার সময় আর একটা ব্যাপার করে ফেলতেই যাচ্ছিল বীরেশ, একটা সমত্থ মেয়ে জড়িত ব'লে সম্বৃত ক'রে নিল নিজেকে। বেশ ভালো একজোড়া বলদে-টানা একটা ছৈ-ওলা গাড়ি জোগাড় ক'রে নিয়ে এল ছেলেটি; প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে গুটি-চার মুগের লাড্ডু জোগাড় ক'রে আনতে যতটুকু দেরি হোল মেয়েটির, তারই মধ্যে।

শিয়ালদয় নেমে ট্যাক্সি করে যখন কলোনীতে পৌঁছে দোরের কড়া নাড়ল বীরেশ, রাত তখন দশটা হয়ে গেছে।

তারপরের দিনটা কলোনীতেই কাটাল। ওরা যতক্ষণ কলেজে রইল ততক্ষণ নিজেকে নিয়েই; এই দিন চারেকের মধ্যে ঘূর্ণির বেগে যে জটিল ব্যাপারগুলো ঘটে গেল, সেগুলোকে মনের মধ্যে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা ক'রে।

সন্ধ্যার পর দুজনে পার্কে গিয়ে ধরণীকে সব কথা বলল। শুধু বহরমপুর-ঘটিতই সব কথা। বিপাশা যে কলোনীতেই চলে আসছে, ধরণীরও তাই আন্দাজ। চিত্রাকে দিয়ে খুব সন্তর্পণে খবরটা নিতে হবে।

প্রৌঢ়া আর তার ছেলে-মেয়ে দুটিকে নিয়ে ব্যাণ্ডেল থেকে যে ঘটনাগুলো হোল, তা নিষ্প্রয়োজন বোধে একেবারেই বাদ দিল। এমন কিছুই নয়, অথচ বলতে গেলেই একটু যেন বড়াই করার ভাব এসেই যায়।

চিত্রাকেও সন্তর্পণে বলতে হোল। রাত্রে যখন তিনজনে খেতে বসেছে, বীরেশ বিশেষ কিছু আগ্রহ না দেখিয়েই কথাবার্তার মধ্যে বলল—"সেবার হয়নি, এবার ভদ্রলোকের চিঠি পেয়ে বহরমপুরে গিয়ে তোর বিপাশার খোঁজ নিয়েছিলাম রে চিত্রা দেখা করবার জন্যে। শুনলাম ওর দাদা গিয়ে আবার এখানেই নিয়ে এসেছেন। ইচ্ছে হয় তো খোঁজ নিতে পারিস।"

"আবার ফিরে এসেছে!" হাত থামিয়ে উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল চিত্রা—"আমি কালই খোঁজ নিচ্ছি। ও নাকি পারে বাইরে পড়ে থাকতে!"

"তা ব'লে একেবারে বাড়ি ব'য়ে গিয়ে খোঁজ নিতে যেওনা যেন। বলছিলে না, সবার একটু অন্য রকম ভাব।"—ধরণী টুকে দিল।

"সে আমি না বুঝেই কি যাব মান খোওয়াতে?"—গম্ভীর হ'য়ে গিয়েই বলল চিত্রা—"এই তো হয়েছে। আমার ক্লাসের ছন্দা ওদের পাড়াতেই থাকে, তাকে দিয়েই খোঁজ নোব। একদিন ডাকিয়েও পাঠাব কলেজে।"

একুশ

বিপাশা ফিরে আসছে—নিশ্চয় ফিরেই আসছে—এই উল্লাসের গায়ে ব্যাণ্ডেলের অভিজ্ঞতাটা খুব গভীর ভাবেই নাড়া দিয়েছিল বীরেশের মনটাকে। বিপন্ন পরিবারটিকে একেবারেই বিপন্মুক্ত না করে তৃপ্তি পাচ্ছিল না। শিয়ালদতেই ছেড়ে দিলে হোত। সেখান থেকে ওদের স্টেশনে, তাতেও তৃপ্তি না পেয়ে দুকোশ. হেঁটে তাঁদের বাড়ি।

তাতেও তৃপ্তি পায়নি বীরেশ। বেদনার ওপর আরও একটা বড় আনন্দের প্রলেপ দিয়ে সেটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেওয়ার জন্যে মনটা ব্যাকুলই হয়ে উঠেছিল, শুধু একটি যুবতী মেয়ে সংশ্লিষ্ট বলে কুণ্ঠাটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

কিন্তু একটা যে অস্বস্তি লেগেই রইল তার জন্যে কুণ্ঠাটুকু ধরেও রাখতে পারল না। বাইরে একটু কাজ থেকে গেছে, সমস্ত দিনটা লেগে যাবে ব'লে সকাল-সকাল রাঁধিয়ে খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়ল।

গাড়ি থেকে নেমে বোষ্টমপাড়ায় পৌঁছাতে দুপুর পেরিয়ে গেল। প্রৌঢ়া একাই ছিলেন, প্রশ্ন করতে বললেন, মেয়ে ছেলেটিকে নিয়ে

কাছেই গ্রামান্তরে একজন আত্মীয়ের বাড়ি গেছে। অনেক দিন পরে আসা, দেখাশুনা ক'রে বেড়াচ্ছে। জিজ্ঞেস করলেন, ডেকে পাঠাবেন?

ব্যস্তত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। কি করবেন, কোথায় বসাবেন বুঝতে পারছেন না। একটা লোক স্ব-ইচ্ছায় এসেছে, পরশু গিয়ে হঠাৎ আজ আবার এল, জিজ্ঞেস করতেও যেন বাধছে।

গোলপাতায় ছাওয়া মাটির ঘর। দোরের কাছে আলপনা দেওয়া। বোধহয় এসেই কাল বা আজ কিছু পুস্পার্চ্চনা হয়েছে। দাওয়ায় একটা মাদুর পেতে দিতে বীরেশ উঠে বসে বলল—"না, ডেকে পাঠাতে হবে না। আপনি ব্যস্তও হবেন না। আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। এখুনি ফিরে যেতে হবে। পরশু তাড়াতাড়ির মধ্যে একটা ভুল হয়ে যায়, সেই জন্যে আসা আমার। বরং ওদের কেউ না থাকাতেই সুবিধে হয়েছে।"

"আবার কি কাজ বাবা? অত তো করলে···"

"আসলটাই ছেড়ে গিয়েছিলাম তাড়াতাড়িতে। আপনি বললেন, একেবারে নিঃসম্বল হয়ে এসেছেন সেখান থেকে, তা, সদ্য খরচ-পত্র যে কি করে চালাবেন···"

বলতে বলতেই ব্যাগ থেকে পাঁচটা দশটাকার নোট বের করে বলল—"নিন, এটা ধরুন।"

"সে কি বাবা!" উনি গুটিয়েই গেলেন একটু, বললেন—"না, সে আমি পারব না। বাড়ি এসে গেছি—গুছিয়েই নোব আস্তে আস্তে।"

"আপনি ধরুন আগে দয়া ক'রে। আপনার আপত্তির কারণটা আমি বুঝব না কেন? সে কথাও কি না ভেবে রেখেছি?"

উনি বিমূঢ়ভাবে হাত বাড়িয়ে দিতে ব্যাগ থেকে আর এক তাড়া নোট বের করে বলল—"এটাও ধরুন, একশ টাকার পাঁচটা নোট আছে।"

উনি ভীত, যন্ত্রচালিতের মতো হাত বাড়িয়ে নিলে বলল—

"এ-টাকাটা দিয়ে আপনি বন্ধকী কোবালাটা ছাড়িয়ে নিন। বাকী থাকে আমার কথা। (একটু হেসে)—আপনার রাধারমণের আমার ওদিকে একটু দয়া আছে, আপনার এ অবস্থায় আমার কিছু প্রণামী বলে যদি না-ই নেন, এটা বিপদে পড়ে কর্জ বলে নিতে তো কোন বাধা নেই।"

"আমি তো এ কর্জ জন্মেও শুধতে পারব না বাবা?"—ব'লেই হু হু করে কেঁদে উঠে কান্নার মধ্যেই বলে যেতে লাগলেন—"আমায় এ কী পরীক্ষায় ফেললেন রাধারমণ বাবা—যা করেছ, তারই ঋণ সারা জন্মে শুধতে পারব না—তার ওপর—ও বাবা, তিনি কি বেশ ধরে এ কী ছলনা করতে এলেন?..."

"আপনি শান্ত হোন। অনেক কথাই বলবার আছে; একটু মনস্থির ক'রে চারিদিক না ভেবে দেখলে চলবে না।"

"বলো বাবা, আমার মাথায় তো কিছু আসছে না।"

চোখ মুছে নিয়ে স্থির হয়ে বসলেন উনি, বললেন—"ঋণ নিতে বলছ, বেশ নিচ্ছি...না পারি বাড়ি বেচে শোধ দিয়ে রাস্তায় দাঁড়াব, রাধারমণের যদি সেই রকমই ইচ্ছে থাকে—কিন্তু ঐ একটা ধুমড়ো মেয়ে ঘাড়ের ওপর..."

"আমি আরও একটু ভেবে রেখেছি, বলেন তো বলি।"

"বলো বাবা—আমার মাথায় তো কিছু আসছে না।"

"প্রথমত, এতগুলা টাকা হঠাৎ এল কোথা থেকে..."

"তাও তো বটে!"—একবার টাকাগুলো দেখে নিয়ে কতকটা শঙ্কিত ভাবেই বললেন।

"একটা কথা আমি ভেবে রেখেছি, যদি দোষ না ধরেন।"

"বলো। দোষ কি?"

একটু হাসল বীরেশ। বলল—"একটু সুবিধে, আপনি যে রাধারমণের পুজো করেন, তিনি নিজেই...মানে, কপট শিরোমণি বলে তাঁর নাম আছে। বিনা দরকারেই। আপনি তো অমনিই

এক অবস্থায় পড়েছেন, বা, তিনি ফেলেছেন। আপনাকে—অবশ্য দরকার হলেই—এই কথাটাই চারিয়ে দিতে হবে—স্বামী বেহিসাবী খামখেয়ালী লোক ছিলেন—এ অবস্থায় স্ত্রীকে কিছু কিছু করে সরিয়ে রাখতেই হয়, সেটা কাজে এল।”

“বলব বাবা, তাই বলব আমি।”—চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন—“তীর্থে ডেকে নিয়ে গিয়ে কেড়ে নিয়েছেন, এটুকু মিথ্যে বলতে একটুও বাধবে না আমার·· ”

অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছেন।

“এবার একটা কথা···”—বীরেশ বলল।

“কি, বলো।”

“ঐ যা বললেন—ঘাড়ে একটি অত বড় মেয়ে। একা পড়ে গেলেন, এখন আরও বিপদই তো?···”

“বিপদ বলে বিপদ বাবা? রাত্তিরে ঘুম হয় না।···আমি একটা কথা বলি বাবা?”

হঠাৎ বুদ্ধির স্ফুরণে আবার চোখ দুটো চকচক করে উঠেছে।

“বলুন।”

“আমি বলি, বন্ধক ছাড়ানো থাক এখন. আগে ঐ টাকা দিয়ে মেয়েটাকে পার করি। নিশ্চিন্দি হই।”

একটু ভাবল বীরেশ। তারপর বলল—“তাও করতে পারেন। মোট কথা ওর বিয়ের ব্যবস্থাটা আগে সব কাজ ছেড়ে করে ফেলুন। আমার মনে হয় এত কমে হবে না। হয়ে যায় তো ভালই, নয়তো আমায় জানাবেন। তবে, যদি দেখেন, ঠিক হতে দেরি হচ্ছে, বন্ধকীটাই আগে ছাড়িয়ে নেবেন। নৈলে সুদও তো জমা হতে থাকবে।”

একটু হেসে বলল—“একটা কথা কিন্তু নিয়ে যাচ্ছি আপনার কাছ থেকে, বিয়ের খরচটা আমারই রইল। পাঁচশতেই হয়, বুঝব আপনার রাধারমণের আমার ওপর দয়া, নৈলে···”

একটু হেসে বলল—"আমি উঠি এখন।"

"ও বাবা, সে কি হয়। একটু কিছু মুখে দিয়ে যেতেই হবে দাঁড়াও, হয়েছে। দেরি করাব না তোমায়। অনেকটা পথ যেতে হবে।"

উঠে গিয়ে একটা শ্বেতপাথরের বাটি করে চারটি ক্ষীরের নাড়ু আর শ্বেতপাথরের গেলাসে জল এনে সামনে রাখলেন।

বীরেশ হেসে বলল—"আপনার নাড়ুগোপালের নাড়ু নিশ্চয় ?"

"তা হোক, আমি মনে করব নাড়ু ক'টা গোপালই খেলেন আমার।"

"আমার আপত্তি নেই।"—একটা তুলে নিয়ে হেসে বলল বীরেশ —"ভয়, আপনার নাড়ুগোপাল না আবার বায়না ধরেন।"

"ধরেন, তার উপায়ও করে রেখেছেন। ওঁর সেবার জন্যে একটা গোরু থাকে। একজনকে দিয়ে গিয়েছিলাম, পুষবে, দুধ খাবে। মাস দুয়েক হোল একটা বাছুরও হয়েছে। সের দুয়েক করে দুধ দিচ্ছে, নাড়ু তাঁকে ক'রে দিলেই হবে।"

ঠিকানাটা লিখে দিয়ে উঠে পড়ল বীরেশ। বলল—"দরকার হলে চিঠি দেবেন। ৭৪।৷০ দিয়েই।…হ্যাঁ, একটা কথা তখন আপনাকে বললাম না?—ওরা দুজনে না থেকে ভালোই হয়েছে। আমি এসেছিলাম জানতে পারবেই, তবে টাকার কথাটা ওদের একেবারে জানতে দেবেন না।…আসি।"

সন্ধ্যার একটু পরে কলোনীতে পৌঁছে গেল। ওরা দুজনে কলেজ থেকে এসে গেছে, চিত্রা জানাল—ছন্দা ব'লে যে মেয়েটি বিপাশাদের পাড়ায় থাকে সে আজ আসেনি।

চা খেতে খেতে অবহেলাভরেই বীরেশ বলল—"এলে তখন খোঁজ নিবি। কী এসে যাচ্ছে এর জন্যে। বলেছিলি দেখা করতে, তাই…"

পরের দিন চিত্রা এসে বলল—"ও দাদা, আসবে কে?" ম্লে

হাবাত। ওরা এখানেই নেই আর। ওর দাদা ব্যাঙ্কে কাজ করতেন তো? বদলি হয়ে দিনাজপুর, জলপাইগুড়ির দিকে কোথায় চলে গেছেন. ছন্দা বলতে পারলে না। বললে খোঁজ নেবে ভালো ক'রে।···আহা, বেশ ছিল।"

"একেবারে যে হেদিয়ে পড়লি তুই!"—সহজ কণ্ঠেই উত্তর করল বীরেশ।

"আমার কি গরজ? বহরমপুরে কলেজের ঠিকানায় দু'খানা চিঠি দিয়েছিলাম, উত্তরই দিলনা। একখানাও কি পায়নি?···যখন ছিল তখন অত ভাব, অত যাওয়া-আসা···ওদের বাড়িটাও যে ইদানীং কি রকম হয়ে গিয়েছিল!···"

কলেজের জামাকাপড় পাল্টাতে পাল্টাতে গজগজ করতে লাগল ঘরের ভেতর।

বাইশ

যে-আঘাতটা লাগল সেটাকে লুকাবার জন্যেই চিত্রাকে কথাগুলা বলল বটে, তবে, কিন্তু নিজের মনেও ঐ রকম একটা অবহেলার ভাবই আনবার চেষ্টা করল বীরেশ। কী আর হয়েছে এমন? এরকম কত হচ্ছে, আবার মিলিয়েও যাচ্ছে মানুষের জীবনে। মায়ের অতবড় শোকটাও সে তীক্ষ্ণতা নিয়ে আর আছে কি?

যুক্তিরও আশ্রয় নেয়।

বিপাশা কলোনীতে ফিরে আসছে—এই অন্ধ উল্লাসে ও অনেক কথাই যেন ভুলে গিয়েছিল। ব্যাপারটা যা হওয়া সম্ভব, বহরমপুরের খবরটা কোন রকমে বেরিয়ে পড়ায়—ওঁরা নিশ্চয়ই সতর্ক ছিলেন—ওর দাদা চেষ্টা করেই দূরে ট্রানস্ফার নিয়ে ওকে এ-প্রান্ত থেকেই একেবারে সরিয়ে নিয়েছেন।···খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যবস্থা. ওঁদের দিক থেকে খুবই উপযুক্ত, এমন কি প্রশংসনীয়ও। বীরেশের

দিক থেকেও এতে অনুযোগের কি থাকতে পারে? ও কি যেদিনই ওকে পেয়েছিল ওর সম্মতিতে, সেই দিন থেকেই ওর থেকে সরে আসবার চেষ্টা করেনি? মায়ের মৃত্যুর কারণ ব'লে—যতই অপ্রত্যক্ষ হোক—বিপাশাকে গ্রহণ করা অসম্ভবই হয়ে পড়েনি ওর পক্ষে? একদিন কথোপকথনের মধ্যে মাস্টারমশাইকেও সেকথা বলল না?

মনকে বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ভালোবাসার সোনা খাঁটি হলে তাকে যুক্তি-তর্ক দিয়ে মেকি ক'রে ফেলা যায় না।···খাঁটি বলেই —বিপাশার অমঙ্গল আছে বলেই না নিরস্ত করবার চেষ্টাও করে এসেছে?

বিপাশা যে শূন্যতা রেখে গেল, সেটা থেকেই গেল। অন্তত বেশ কিছু দিনের জন্যে।

তারপর পূর্ণও হয়ে আসতে লাগল: জীবনের ধর্মেই।

অবন্তীর বিয়েটা এসে পড়েছে। একটিমাত্র মেয়ে, পড়ছেও উপযুক্ত পাত্রে, অপরেশ এটা ঘটা করেই করতে চান। বীরেশ, বিপাশা নিয়ে শেষতম ব্যাপারটা জানায়নি ওঁকে। অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসেন ওকে, ওকে উপলক্ষ্য করেই বিপাশার ওপরও একটা দরদ জেগে উঠেছে, এই একটা শুভ কাজের মধ্যে মনটা বেদনাতুর হয়ে থাকবে বলেই আর বিপাশার প্রসঙ্গটা তোলে না। উনি জানেন, ব্যাপারটা একই অবস্থায় স্থাণু হয়ে আছে। উনিও তোলেন না।

বিবাহ-সংক্রান্ত সব কাজে ও এখন ওঁর দক্ষিণ হস্ত। কলকাতায় যাওয়া-আসা করে কেনাকাটা, অঙ্গনার সব ব্যবস্থার প্ল্যান, আয়োজন, সব বিষয়েই। দ্বিতীয় সঙ্গী বন্ধু অতীন।

এত কাছে টেনে নেওয়ার মূলে যে বিপাশাঘটিত ট্র্যাজেডী থেকে কতকটা মন ঘুরিয়ে রাখাও, সেটা বোঝে বীরেশ, মনটা শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে ওঠে। ঢেলে দিয়েছে সমস্ত মন। শূন্যতার বেদনাটা তরল হ'য়ে গিয়ে একটা অননুভূতপূর্ব আনন্দে ভরে উঠছে মন। সরে যাচ্ছে বৈকি বিপাশা, আর সেই যে সর্বক্ষণ মনটাকে

অভিভূত করে রাখা—সে ভাবটা কোথায় ? বোঝে বীরেশ। বোঝার মধ্যে যে একটা বেদনা রয়েছে, সেইটেই রয়ে গেছে অবশেষ।

এর মধ্যে একদিন ছেলের আশীর্বাদ উপলক্ষে তিনজনে বারাণসী থেকে ঘুরে এলেন। শাড়ি, চেলি, বিবাহের দানপত্রের অনেক কিছুই সেখানে সবাই মিলে পছন্দ করে কেনায়, আশীর্বাদ নিয়ে সেও একটা ছোটখাট উৎসবই হয়ে গেল।

বিবাহটা তার আড়ম্বর, অভিনবত্ব আর সৌষ্ঠবে অঙ্গনায় একটা বেশ সাড়া জাগিয়ে মাস দুয়েক পরে শেষ হোল। তখন আবার সে এক কর্মহীনতার বিপুল শূন্যতা।

সেটা বীরেশের চেয়ে অপরেশের যে কত বেশি তা উপলব্ধি করে একদিন বীরেশই নূতন ক'রে একটা পুরণো কথা উত্থাপিত করল।

সপ্তাহখানেক হোল বরপক্ষ চলে গেছে। চার-জন নিয়ে সংসার, তার মধ্যে একজন চলে গিয়ে বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করছে। সেই যে ছিল প্রধান, আরও সাম্প্রতিক কালে হয়ে উঠেছিল, এটা যেন মর্মে মর্মে বুঝে বাড়িটা নিঝুম হ'য়ে গেছে। উৎসব-সংক্রান্ত সব কিছু শেষ হয়ে গিয়ে শূন্যতাটা আরও যেন অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

শ্রাবণ বৈকালের বিষণ্ণতা নেমে এসেছে। অতীনের স্ত্রী রোজই আসেন, আরও কয়েকজন প্রতিবেশিনীর সঙ্গে রমলা দেবী ভেতর-বাড়িতে গল্পস্বল্প করছিলেন। বাইরের বারান্দায় গোটাকয়েক চেয়ার পাতা। দূরের কাছের কয়েকজন প্রতিবেশীও আসেন আজকাল, যাঁর যেমন সময় থাকে : কেউ আসেন নি এখনও। অতীন রোজই আসেন। তাঁর স্ত্রী এসে জানালেন—একটা কাজে বাইরে গেছেন, আজ আসতে পারবেন না।

বীরেশ একাই অপরেশের সঙ্গে বসে ছিল। দু'জনেই আজ খানিকটা মৌন। তুলছেন কথা, বীরেশও শুরু করতে যাচ্ছে কিছু, কিন্তু কোন কথাই যেন বেশি দূর এগুতে চাইছে না ; শুধু নীরবতা-টুকুই আরও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বেয়ারা ট্রেতে করে চা দিয়ে গেল।

নীরবেই দুটো চুমুক দিয়ে বীরেশ হঠাৎ মুখ তুলে একটু হেসে বলল—"নাঃ, আর যেন সহ্য হচ্ছে না স্যার। প্রণবটা বড্ড ছোট নৈলে শর্দা আইন-টাইন ওসব না মেনে ওর একটা বিয়ে দিয়ে ঘাটতি পূরণ করে নেওয়া যেত…"

হো-হো ক'রে সজোরেই হেসে উঠলেন অপরেশ—"বলেছ ঠিক হে, কী করা যায় বলো দিকিন। একেবারে যেন মন টেঁকছে না। অবন্তীটা যে এতখানি ছিল…"

হঠাৎ গলাটা রুদ্ধ হয়ে আসতে চায়ে চুমুক দিয়ে সামলে নিলেন। সুরটা কেটে যেতে একটু নীরবতা এসে গেল আবার। চা শেষ হলে আবার বেশ সহজ হয়ে গিয়ে হাত মুখ মুছে বললেন—"তুমি ঘাটতি পূরণ করবার কথা কি বলছ, এমন জানলে আমি এমন ঘাটতি হতেই দিতাম না।"

"একটা কথা আমি ভেবেছি স্যার।"

"কি বলো, বলো।"

"কাগজটা বের করাই যাক। সাদামাটা আর পাঁচটা সাহিত্য-পত্রিকার মতো, প্রগতি-ট্রগতির দিকে না গিয়ে। দেখা তো গেল…"

"বেশ বলেছ—Just the thing—"

গেট খুলে দু'জন প্রতিবেশী প্রবেশ করতে দাঁড়িয়ে উঠে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন—"কাল অতীন এলে, ঐ প্রথম কথা। ভুলো না।"

পরদিন অপরেশ অতীনকে খবর দিয়েই রেখেছিলেন, সবাই চলে গেলে তিনজনে কাগজের পরিকল্পনা নিয়েই বসলেন। পরিচালনার ব্যবস্থা যেমন পূর্বে নিরুপিত হয়েছিল তাই থাকবে। স্থির হোল, সামনের পূজার আগে মহালয়াতেই বের করে দেওয়া হবে। নাম 'অঙ্গনা'ই থাকবে। এবার অতি-প্রগতির জোয়ার রোধ করবার

ব্যবস্থাও ভেবে ঠিক করে রেখেছিলেন অপরেশ। বিজ্ঞাপনের অন্যান্য কথার সঙ্গে সাহিত্যিক ভাষাতেই একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত জুড়ে দেওয়া হোল—'অঙ্গনা'র অঙ্গনে আমরা তাঁদেরই সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যাঁরা শুধু বাঙালীর জীবনের সাধারণ সুখদুঃখ, আশা নিরাশার কথা নিয়ে উপস্থিত হবেন। গ্রামাঞ্চলের অল্পপরিসর গৃহস্থ-অঙ্গনে অতি-প্রগতিদের স্থান সংকুলান হবে না।'

মাত্র কিঞ্চিদধিক দুটো মাস হাতে, বেশ ত্বরান্বিত হয়ে উঠতে হোল তিনজনকে। কাগজের ব্যবস্থা, প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ—কলকাতায় ঘোরাঘুরি করে এই জাতীয় সব কাজ বীরেশের হাতেই রইল। অপরেশ তার অতীন নিয়ে রইলেন লেখার দিকটা—বাছাই করা, প্রতিশ্রুতি আছে এমন কাঁচা লেখা শোধরানো, এর ওপর অপরেশের রইল একটা ভালো সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আর কিছু খ্যাতনামা ব্যক্তির কাছ থেকে শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ আনানো। সময়ের অভাব অবস্তীর অভাবকে বেশ খানিকটা দিয়েছে ভুলিয়ে। দিন ঘনিয়ে আসতে যেন খানিকটা বিপর্যস্তই হয়ে পড়েছেন। একদিন বীরেশ যেতেই একটা ছেঁড়া খাম দেখিয়ে কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন—"একি এক কাণ্ড করে বসলে বীরেশ। মেয়েটা একটা চিঠি দিয়েছিল—তা, আসছেই প্রায়—উত্তর পায়নি; এই ত্যাখো, দুঃখ করে রিমাইণ্ডার!'

বীরেশেরও একটা বড় ভূমিকাই ছিল বিবাহে। এদিকে স্মৃতির সঙ্গে বিপাশাও ঝাপসা হয়েই আসছে, ভাববার সময় পায় না, ভাবতে গেলেও সে আবেগ নেই। মনটা কেমন যেন নিঃসাড় হয়ে গেছে।

কাগজ বেরুল। শারদীয়া সংখ্যা, যতটা সম্ভব বড় এবং রুচিসম্মত করেই বের করতে হোল। কলকাতায় যাওয়া-আসা করে, স্টল আর হকারদের সঙ্গে বিক্রয়ের ব্যবস্থা বীরেশকেই করতে হোল। তারপরে যে একটা নিরুদ্যমের পালা, সেটা আর যেন শেষ হ'তে চায় না। ত্রৈমাসিক পত্রিকা, এখন আর বিশেষ তাগিদ নেই। ধীরে

সুস্থে সব গুছিয়ে নিতে আর, অবসর যাপন হিসাবেই বাড়ি, কলোনী আর কলকাতা ক'রে কাটাতে লাগল বীরেশ।

প্রায় ন'টা মাস অতীত হয়ে গেল। এর পরে মায়ের বাৎসরিক সেটা বেশ ভালো করেই করতে চায় বীরেশ। অপরেশ, গৌরীদেবী, ধরণী থাকলে তাকেও নিয়ে আলোচনা করে। হালকাভাবেই, সূত্রপাত হিসাবে। রমলাদেবীও আসেন।

এই সময় শূন্যতা পূরণ করবার আর একটু ব্যাপার হোল হঠাৎ।

বিপাশার স্মৃতি যদি ঝাপসা হয়ে গিয়ে থাকে তো, কাজকর্মের মধ্যে বোষ্টমপাড়ার কথা প্রায় একেবারেই ভুলে গিয়েছিল বীরেশ। সেই রকম পরিস্থিতিতেই একটু কিছু করেছে, এমন অনেক কাজই করতে হয়েছে জীবনে, অভ্যাস আছে; ব্যাপারটা খুব বেশি দাগ বসাতে পারেনি মনে।

একদিন কলোনী-কলকাতায় সপ্তাহখানেক কাটিয়ে বাড়িতে এলে সুচিত্রা বলল—"ধিঙ্গি হয়ে ঘুড়ে বেড়াচ্ছ, কদ্দিন থেকে তোমার একটা চিঠি এসে পড়ে আছে। সাড়ে চুয়াত্তর দেওয়া, খুলতেও পারিনা।..."

"তোর জন্যেই ৭৪॥০, যা সর্বঘটের নারায়ণী হয়ে উঠেছিস! নিয়ে আয়, শীগগির।"

"ব্যস, শুনলে তো আর তর সয়না বাবুর!"—কথা মুখে ক'রেই পাশের বাড়ি থেকে গৌরীদেবীকে ডেকে নিয়ে আসতে, উনি বললেন —"এবার বড় যে দেরি হোল তোর! পরশুর ডাকে একটা চিঠি এসে পড়ে আছে। সাড়ে চুয়াত্তর দেওয়া, ভাবছিলাম দামোদরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিই। এসে গেছিস, ভালোই হোল।"

বাংলাতেই নাম-ঠিকানা লেখা খাম। একটু সরে গিয়ে পড়ল বীরেশ।

সেবারে আসতে রাস্তায় পরিচয় প্রসঙ্গে প্রৌঢ়া বলেন স্বামীর লেখাগুলা তাঁকেই নকল ক'রে দিতে হোত। মোটামুটি পরিষ্কার লেখার ছাঁদে এবং সুবোধ্য ভাষাতে প্রৌঢ়া জানিয়েছেন—অনেক

জায়গায় কথা ভেঙ্গে গিয়ে এতদিনে এক জায়গায় খানিকটা এগিয়েছে। ভালো গৃহস্থ, ছেলেটি এনট্রেন্স পড়ে, দেখতে শুনতে ভালোই। বোষ্টমপাড়া থেকে মাইল পাঁচেক দূরে পলাশপুরে বাড়ি। ওঁর বেশ পছন্দই, আর, একরকম একা মানুষই, বেশি খোঁজাখুঁজিও করতেও পারেন না। তবে বেশ খাঁই। উনি ঠিক করেছেন জোৎ-জমি যা কিছু আছে, তার খানিকটা বেচে দিয়ে পাকা করেই ফেলবেন। বীরেশের অভিমতের অপেক্ষায় রইলেন। ও এক করেছে, একটু কষ্ট করে যদি আসতে পারে তো ভালো হয়। সামনের জ্যৈষ্ঠ মাসে ছুটো দিন আছে। ও এলে তার একটা ঠিক করে ফেলবেন। তারপর, বিয়ের সময় তো ওকে এসে দাঁড়াতেই হবে।

চিঠির শেষে 'পুনশ্চ' দিয়ে লিখেছেন, গ্রামে, মথুরা থেকে আসতে হঠাৎ একটা সম্বন্ধ বেরিয়ে যাওয়ার কথা চালু ক'রে দিয়েছেন। ভুলই বা কৈ? জন্ম-জন্মের সম্বন্ধ না থাকলে আজকাল কেই বা করে এত?

নাম স্বাক্ষর করেছেন—'হেমনলিনী'।

ছুটো বড় বড় কাজ হয়ে গেল, সামনে একটা বড় কাজই, এ একান্ত নিজেরও। এর মধ্যে চিঠিটা বিশেষ আগ্রহ বা উৎকণ্ঠা জাগাতে পারল না মনে। ভাবটা, অনেকটা এগিয়ে দিয়েছেই; বাকিটা নিজের গুরুত্বে হয়েই যাবে সম্পন্ন। দিচ্ছি-দিচ্ছি করে চিঠিটার উত্তর দিতে প্রায় সপ্তাহখানেক বিলম্ব হয়ে গেল। তারপর যখন দিল উত্তর, তখন ওর স্বভাবগত আবেগ আর হৃদয়বত্তাটুকু ফিরেই এল। লিখল—উনি যেমন লিখেছেন তা থেকে বলা যায় সম্বন্ধটা বীরেশেরও মনোমতই হয়েছে। এখনও সময় আছে। পণের টাকাটা নামাবার চেষ্টা করতে থাকুন, তবে পাত্রটি হাতছাড়া করবেন না।

দ্বিতীয় কথা, খরচপত্র। এ সম্বন্ধে বীরেশের বক্তব্য, উনি জমি বিক্রয়ের কথা যেন একেবারেই না ভাবেন। ছেলেটিকে মানুষ করতে

হবে, একেবারে নিঃসম্বল হয়ে পড়া, আর কিছু না হোক, তার প্রতি অন্যায় হবে। এ সম্বন্ধে বীরেশ পূর্বে বলায় উনি জানান, দান নিয়ে বিবাহ দিলে ওঁর মেয়ের অকল্যাণ হবে। কথাটা ফেলে দেওয়ার মতো নয়। তবে যেভাবেই হোক, ওঁদের সঙ্গে ওঁর রাধারমণের ইচ্ছাতেই একটা সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে গেছে ওর, এবং তার মধ্যে ওদের হু'জনের সঙ্গে ওরও কি ভাইবোনের সম্বন্ধই নয়? সে-হিসাবে ওর একটা যৌতুক দেবার অধিকারটা স্বীকার করতেই হবে ওঁকে। না করেন, ও খুবই মর্মাহত হবে।

ওর ইচ্ছা এবং অনুরোধ, বিবাহে শুধু খাওয়ার দিকটা উনি নিজের হাতে রাখুন। প্রয়োজন হলে কিছু ঋণ করেও। নৈলে ওঁর মনে একটা খেদ থেকে যাবে। বাকি সব খরচই ভগ্নীর বিবাহে যৌতুক হিসাবে নিতেই হবে তাঁকে। নৈলে তার বিবাহে গিয়ে দাঁড়ানোর সার্থকতা কি?

ওর মায়ের বাৎসরিক নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। আর মাত্র প্রায় মাসখানেক সময়। এটা শেষ হয়ে গেলেই ও একবার যাওয়ার চেষ্টা করবে। ইতিমধ্যে ওঁর একটা চিঠি আশা করছে।

সময় এগিয়ে চলল?

দিন পনেরো পরে ওঁর একটা চিঠি এল। উনি কিছুই বুঝতে পারছেন না, শোকের ওপর এই তুশ্চিন্তার মধ্যে। মায়ের কাজ হয়ে গেলে ও যেন সুবিধা ক'রে একবার নিশ্চয় আসে, সাক্ষাতেই সব কথা হবে।

দাক্ষ্যায়ণীর কাজে প্রাণ মন ঢেলে দিল বীরেশ। ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়ে গিয়ে আরও যেন বিরাটতর এক শূন্যতা! জীবনের সব কাজ, সব সার্থকতা নিঃশেষ হ'য়ে গিয়ে একান্তই যেন নিরর্থক হ'য়ে গেছে জীবনটা।

এর পর আবার একটা সামান্য ঘটনা থেকে শুরু হয়ে পূর্ণ হ'য়ে

উঠতে লাগল ; দ্রুত, অপ্রতিহত। এবার শুধু বিপাশা, আর কেউ বা কিছু নয়। আগেকার মতোই সব কিছু ঠেলে সরিয়ে একমাত্র বিপাশা।

তেইশ

'অঙ্গনা'র দ্বিতীয় সংখ্যা বের করতে হবে। ত্রৈমাসিক, বিলম্ব আছে, এক রকম অবসর কাটানো হিসাবে ধীরে-সুস্থে কাজ হচ্ছে ; দু একটা ক'রে লেখাও আসছে।

প্রথম ঝোঁকে, প্রগতিশীল পত্রিকা বের করবার সময় যে-সব লেখা আসে, তার মধ্যে থেকেও বেছে বেছে শারদীয়ায় কিছু লেখা নেওয়া হয়েছিল। বাকিগুলির ভাষা-ভাবের দিক দিয়ে আপত্তিজনকগুলির মধ্যে, টিকিট দেওয়া থাকলে ফেরৎ দিয়ে, অভাবে, নষ্ট করে ফেলে, কিছু থেকেও যায়। দ্বিতীয় সংখ্যার জন্যে অলসভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে একটি লেখার ওপর দৃষ্টি আটকে গেল বীরেশের। একটি নোটবুকের ছেঁড়া পাতায় একটি কবিতা। বেশি বড় নয়, পাতাটার উল্টো পিঠের প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত। নীচে নাম লেখা আছে —'উপেক্ষিতা'। শিরোবন্ধনীর মধ্যে, অর্থাৎ ছদ্মনাম।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত একদৃষ্টে চেয়ে থেকে পড়ে গেল। কিছু অর্থগ্রহণ হোল না ; প্রতি পঙতিতেই বিপাশাকে নিয়ে কতকগুলা এলোমেলো চিত্র ভেসে ভেসে উঠে অর্থ যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেতে লাগল। চিঠিটা কিন্তু যে বিপাশারই তাতে আর সন্দেহ নেই। ওর হাতের লেখা খুব পরিচ্ছন্ন নয়, তবে 'অঙ্গনা'য় ছাপার জন্য যত্ন করে ধরে ধরে লিখলেও লেখার ছাঁদটা ধরা যায়। কবিতাটার নাম দিয়েছে "প্রতীক্ষা"।

কবিতাটা রবীন্দ্রনাথের "কাব্যে উপেক্ষিতা"-দ্বারা অনুপ্রাণিত। "রাজন !"—বলে শুরু হয়েছে। দুষ্মন্ত আশ্রম ছেড়ে চলে গেলেন, পরে শকুন্তলাও। পড়ে রইল অনসূয়া আর প্রিয়ম্বদা। কবিতাটায়

নাম না দিয়ে এদেরই একজনের বিরহ-বেদনা, নিষ্ফল প্রতীক্ষার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। শকুন্তলাকে অতিক্রম ক'রে রাজার দৃষ্টি নিশ্চয় এদের ওপর এসে পড়েনি, কিন্তু এরা তো শকুন্তলার মতোই মনে মনে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছিল। কোনদিন এ-সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে কি উদয় হবেনা? সেইটুকুই মাত্র তার সান্ত্বনা। সেইটুকু আশা নিয়েই তাকে আমরণ প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে?...

কবিতাটির যে এদের প্রণয় কাহিনীর সঙ্গে খুব বেশি মিল আছে এমন নয়, তবু যেন বেশ একটা ছায়া পড়েছে। দুর্বল ছন্দ, কাঁচা-ভাষা। তবে, তাদের দৈন্যই যেন মর্ম আরও উজাড় ক'রে দিয়েছে... "হে রাজন, আমি রূপহীনা, ভাগ্য বিড়ম্বিতা, আমার এই অকিঞ্চন ভালোবাসা প্রতিদান প্রত্যাশা করেনা, তোমায় পাওয়া তো আমার স্বপ্নেরও বাইরে। আমি চাই শুধু দিগন্তে তোমার একটু দর্শন। সেটুকু থেকেও বঞ্চিত কোরনা আমায়।"...নিজেকে যতটা সম্ভব কারুণ্যে প্রকাশ ক'রে ধরবার জন্যে প্রতীক্ষার একটি সুকরুণ চিত্র রবীন্দ্রনাথ থেকেই ধার করে নিয়েছে—ভাব-ভাষা—"হে প্রিয়, আমি নিদহীন আঁখিতারা নিয়ে কতদিন আর তোমার আশায় একা বাতায়নে থাকব বসে! আর কিছু নয়, শুধু একটু দর্শনের ভিখারিণী হয়ে?..."

একবার, দু'বার তিনবার কবিতাটা পড়ে গিয়ে পাতাটা বুকে চেপে চুপ করে ব'সে রইল বীরেশ; অশ্রুর দুটি শান্ত ধারা নামল দু'গাল বেয়ে।

অনেকক্ষণ একভাবে বসে থেকে স্মৃতির আলোড়নে একটা কথা মনে পড়ে গিয়ে 'উপেক্ষিতা'র অর্থটা যেন আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠল।

ঠিক স্মরণ হচ্ছেনা, ওদের মন-জানাজানির আগের কথা কি পরের। বিপাশা মাঝে মাঝে তার কাছে কোন কবিতা, কি প্রবন্ধ বুঝে নিতে আসত। সাধারণত চিত্রার সঙ্গে, কখন কখনও একাও। একদিন—বোধ হয় দিন বুঝেই, একটি মেঘলা দিনে "কাব্যে

উপেক্ষিতা" প্রবন্ধটা নিয়ে এল। বেশ মনে আছে, চিত্রা ছিলনা, কিসের দু'দিনের ছুটিতে ধরণীর সঙ্গে বাড়ি গিয়েছিল ···

আজ হঠাৎ মনে প্রশ্ন জাগছে ; এই মন-নিয়ে-খেলায় বীরেশ কি একাই এগোয় ?···ওই কি আগে এগোয় ?···

এত বেদনার মধ্যেও একটি মৌন আনন্দ-প্রবাহ মনটাকে ধীরে ধীরে সিঞ্চিত ক'রে দিচ্ছে।

কবিতাটা ভালো লেগেছিল অপরেশের ; তবু শারদীয়া সংখ্যায় নেননি। সেই একবারের পর এর আর উল্লেখও করেননি ওর কাছে। কেন, বেশ বোঝা যায়। নষ্টও ক'রে দেননি। দিতে চাইলে বীরেশ নেয়নি ; ওঁর হাত থেকে নেওয়া ঠিক হবেনা বলেই। কোন দিন এই রকম হাতে পড়ে যাবে এই ভেবেই কি দিয়েছেন রেখে ?

গুরু, সচিব, বন্ধু—এ-মানুষের তুলনা হয় না।

পাতাটা যথাবৎ ফাইলের মধ্যে রেখে দিল বীরেশ। উনি আজ নেই, অতীনের বাড়ি গেছেন। সব গুছিয়ে রেখে, রমলা দেবীর কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

বিপাশা আবার ফিরে এল মনে। কয়েকটা যে বাঁধ বাঁধা ছিল, সরে গিয়ে একেবারে সর্বময়ী হয়ে ফিরে এল।

দিন থাকতেই ফিরেছে আজ। বিপাশা আর ওর যুগ্ম ফটোটা নিয়ে ঘাটে গিয়ে বসল। কবিতার লাইনগুলি ছাড়া-ছাড়া হয়ে মনে গুঞ্জন তুলেছে। উত্তর আপনি উৎসারিত হয়ে আসছে মর্ম-কন্দর থেকে—আমি আসছি বিপু। আমি তোমায় ভালোবাসি। ভালোবাসি বলেই তো—তোমায় অমঙ্গল থেকে বাঁচাবার জন্যেই তোমায় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিরবিচ্ছেদকে জীবনের সঙ্গী করে নিতে চেয়েছিলাম। এবার চিরমিলনের জন্যই আসছি।

এমনই এক নিভৃত চিন্তার মধ্যে একটা কথা মনে পড়ে গেল।

চিত্রার কলেজের ছন্দা বলেছিল, সে খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করছে বিপাশার দাদা কোথায় বদলি নিয়ে সবাইকে নিয়ে গেছেন। মনটা উৎসাহে দীপ্ত হয়ে উঠল। কলোনীতে যাবে! অপেক্ষা করতে হয়, দু'দিন না হয় অপেক্ষা ক'রেই ভালো করেই জেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। ব্যাঙ্কও নিশ্চয় দেশময় ছড়ানো নয়, ছন্দা কোন সন্ধানই না দিতে পারে, বের করে নিতে অসুবিধা হবেনা। কলোনী থেকেই ওদিকে চলে যাবে। কয়েক দিন দেরি হয়ে যেতে পারে, এদিকটা গুছিয়ে নিতে দু'দিন যে দেরি হোল, তার মধ্যে ধরণী আর চিত্রা এসে পড়ল। শনিবার সন্ধ্যায়। মুসলমানদের কী একটা পর্বে সোমবার ছুটি।

রবিবার দুপুরে কলোনী থেকে জগবন্ধু এসে জানাল, আগের দিন ধরণীরা চলে আসার পর একটি ভদ্রলোক আর একজন মহিলা বাসায় আসেন। বললেন, বীরেশের সঙ্গে দেখা করতে চান। ওরা কেউ নেই বলতে, বলেন, বিশেষ দরকার আছে, ওঁদের হাতে সময় নেই, সোমবার বিকেলে আবার আসবেন। বীরেশকে কেউ গিয়েই ডেকে আনতে বলে গেলেন।

ধরণীর সঙ্গে গল্প করছিল বীরেশ; জগবন্ধু আসতে গৌরীদেবীও এসে উপস্থিত হলেন। বীরেশ কিছু প্রশ্ন করতেই যাচ্ছিল ওকে, না ক'রে বলল—"আচ্ছা, তুই যা, নেয়ে খেয়ে নিগে।"

"না বাপু, এরা একটু স্থির হয়ে বসতে দেবেনা বাড়িতে! চলে আসবি কিন্তু শীগগির!"—ব'লে গৌরীদেবীও চলে গেলে, বীরেশ ধরণীকে প্রশ্ন করল—"কিছু আন্দাজ করতে পারছিস?"

"রায়-দম্পতিই মনে হয়না?"—ধরণী উত্তর করল।

"কিন্তু তাদের তো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, ডিভোর্স স্যুট চলছে।"

"ওদের ছাড়াছাড়ি আর মিলন! এবেলা-ওবেলা হচ্ছে!"—তাচ্ছিল্যভ'রে মন্তব্য করে বলল—"তুই তাহলে কাল সকালেই বেরিয়ে পড়।"

"আজ বেরুতে পারলেই হোত। বিশেষ দরকার রয়েছে, কোন বাধা পড়ে গেলে ঠিক হবেনা।"

গৌরীদেবী যেতে দিলেন না; খাওয়া-দাওয়া করেই অত দূর ছুটে যাওয়া; সামনে রাত্রি।

জগবন্ধুর নাওয়া-খাওয়া হয়ে গেলে, তাকে জিজ্ঞেস করে, কে ছিল, রায়-দম্পতি কিনা, তার কোনও হদিস পাওয়া গেল না। সেবারে ওরা এসে সোজা ওপরে চলে যায়, নেমেও সোজা চলে যায়। একবার শুধু চা-জলখাবার দিতে যা ওপরে যায় জগবন্ধু। ভালো ক'রে দেখা হয়নি। শুধু এইটুকু জানাতে পারল, এবার ভদ্রলোকটি সায়েবী পোষাকে ছিলনা, মহিলাটির বয়স কম, ঠাটবাট ছিলনা। নাম জিজ্ঞেস করতে বলেনি।

দু'জনে আন্দাজ-আলোচনার মধ্যে বেশ খানিকটা চিন্তিতভাবে কাটিয়ে, সকালে চা-জলখাবার খেয়ে জগবন্ধুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বীরেশ। ধরণীকে বলল—"যদি যেতে হয় বাইরে, চিঠি রেখে যাবে।"

বিকালে ঘরের ভেতরেই টেবিল-চেয়ার পাতিয়ে বাইরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে অপেক্ষা করছিল, রাস্তায় ট্যাক্সির হর্নের আওয়াজ হতে, জগবন্ধুকে দরজা খুলে দিতে বলে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াল বীরেশ। সিঁড়ি থেকেই দেখা যায় দরজা, ওদের ঢুকতে দেখেই 'ধক' করে উঠল বীরেশের বুকটা, মুখটাও গেল শুকিয়ে। পুরুষটিকে চেনে, যদিও মাত্র একবারই, হয়তো কোন পার্টিতে দেখেছে। বিপাশার দাদা। মহিলাটি নিশ্চয় ওর বৌদিদি। ওঁরা এগিয়ে আসার সঙ্গে, অতি কষ্টে মুখে সহজভাব এনে, দু-ধাপ নেমে গিয়ে, নমস্কার করে বলল—"আসুন।" ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসাল। ভদ্রলোক বসতে বসতে আত্মপরিচয় হিসাবে বললেন—"আমি হচ্ছি বিপাশার দাদা, ইনি বৌদিদি।"

"আপনাকে চিনি, হয়তো দু'একবার দেখে থাকব।"—বীরেশ

বলল। মহিলাটির দিকে চেয়ে বলল—"আপানাকে দেখিনি আগে।"

চুপচাপই গেল একটু, দু'জনের মুখ একটু থমথম করছে।

ভদ্রলোক একবার ঘরটার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে, যেন কথা চালিয়ে যাওয়ার জন্যেই ওর দিকে চেয়ে বললেন —"ঘরটি বেশ বড়, ওয়েল ভেন্টিলেটেড।"

"নীচেরটা পর্যন্ত কিনে ওপরের অংশটা নিজেরাই করে নিয়েছি।" —বীরেশ বলল।

আবার একটু চুপচাপ। তারপর, একটা শক্ত কথাকে যতটা সম্ভব নরম, সরল করা যায়, যেন ক'রে নিয়ে উনি বললেন—"আমি —আমরা আপনার কাছে একটা ভিক্ষা চাইতে এসেছি, বিপাশাকে ফিরিয়ে দিন আমাদের।"

বীরেশ মুহূর্তেই নিজের ইতিকর্তব্য ঠিক করে নিয়েছে, একেবারে শেষ পর্যন্ত। বলল—"ভিক্ষার কথা ব'লে লজ্জা দেবেন না। আমায় 'আপনি'ও বলবেন না। লজ্জাই পাব।"

"নিজের জিনিসও তেমন অবস্থায় পড়লে ভিক্ষে ক'রে নিতে হয়।" —বৌদিদি মুখটা যেন চেষ্টা করেও বেশ নরম ক'রে আনতে পারলেন না। খুব উগ্ররকম না হলেও থমথমে হয়েই রয়েছে।

বীরেশ ওঁর দিকেই চেয়ে বলল—"মাফ করবেন আমায়। আপনাদের জিনিস আপনাদেরই হাতে। নিজের ক'রে নিতে চাইলে আমি অনেক আগেই ক'রে নিতে পারতাম। এটা আপনার ননদকে প্রশ্ন করলে সেও স্বীকার করত।"

মাথা নীচু করেই শুনে গেলেন দাদা। তারপর মাথা তুলে স্ত্রীকে চুপ করতে বলে বীরেশের দিকে চেয়ে বললেন—"ব্যাপারটা অপ্রীতিকর করে তোলবার আমাদের একেবারে ইচ্ছা নেই। অপ্রীতিকর যেটুকু হয়ে গেছে, তাতে আমাদের ভুলত্রুটি যে হয়নি অভিভাবক হিসাবে, একথা অস্বীকার করতে পারি কি করে?…"

"অসতর্কতার কথা বলছেন ?"

বলে, ইংগিতটুকু যেন সহজ করার জন্য বীরেশ একটু মাথা হেঁট করে রইল। তারপর তুলে একটু দুঃখের হাসি হেসে বলল—"তাহলে আমার দিকটা আমায় একটু বলতে দেবেন ?"

"বলুন।"

"তাতে কিছু এমন কথাও এসে পড়তে পারে—যা বেশ শোভন নয়—অবস্থাগতিকেই বলতে হবে আমায়।"

"বলুন।"

বদলে নিয়ে বললেন—"বেশ, বলো।" মুখ দু'জনেরই খানিকটা নরম হয়ে এসেছে।

বীরেশ বলল—"ভুলত্রুটি আমারও হয়েছে, বরং বেশিই। কিন্তু কি অবস্থায়, একটু ভেবে দেখুন। বিপাশার মতো একটি মেয়ে বুদ্ধি, শিক্ষা, বয়স—সব দিক দিয়েই…"

"বুঝেছি।"—বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলেন—"তারপর ?"

"তারপর যেদিন বিপাশার মনের ভাবটা বুঝতে পারলাম, সেইদিন থেকেই আমি নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে স'রে আসবার চেষ্টা ক'রে আসছি—নিজের চেয়ে ওর কথা ভেবেই…"

"রেজেষ্টারির ব্যবস্থা…"

—দাদা চোখ তুলে চাইলে বৌদিদি অসমাপ্ত রেখেই চুপ করে গেলেন।

বীরেশ ওঁর দিকে চেয়ে বলল—"সেই দিন থেকেই বলছি আমি।"

মুহূর্তমাত্র থেমে কথাটায় জোর দেওয়ার জন্যে পূর্বের কথাটা আবার ঘুরিয়ে এনে বলল—"নিজের চেয়ে ওর কথা ভেবেই। বিশ্বাস করুন।"

"সেই বিশ্বাসেও তো আমরা নিশ্চিত ছিলাম। শিক্ষিত তুমি। বুদ্ধিমান।"

মনের কথা, কি বক্রোক্তি, নির্ণয় করবার জন্যে সোজা মুখের ওপর

দৃষ্টি রেখে শুনে গেল বীরেশ। যে-ভাবেই হোক, নিজেকে আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে ধরবার আরও একটু সুবিধাই হোল ওর। বলল—"অবস্থায় পড়ে, ভাষা আমার একটু যে অপ্রীতিকর হতে পারে তার জন্যে আমি মার্জনা চেয়ে রেখেছি। আপনাদের বিশ্বাস, আমি ও-অবস্থায়, সাধ্যমত যে রক্ষা করেছি এটা আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি। আপনার ভগ্নী যে-শুদ্ধা কুমারী এ বাসায় পা দিয়েছিল, সেই শুদ্ধা কুমারীই গেছে ফিরে। বাকী থাকে মনের কথা। সেখানে···"

"থাক, যা হওয়ার হয়ে গেছে। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এ দিকটা, অর্থাৎ আমাদের দিকটা তোমায় বলি। বলেছি তো, নিশ্চিন্তই ছিলাম আমরা, তারপর যেদিন জানতে পারলাম, সেইদিন থেকেই আমাদের ভুলটা সংশোধন করবার চেষ্টা করে এসেছি। নিজের ভগ্নীব ওপর এ-ধরণের একটা সতর্ক দৃষ্টি রেখে যাওয়া—আজ প্রায় দু' মাস ধরে—এটা যে কত কষ্টকর তা বুঝতেই পার। তুমি জান কিনা, তোমাদের মধ্যে পত্র-ব্যবহার ছিল কিনা···"

"সে বিষয়েও আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। বিপাশা এখান থেকে যখন চলে যায়, সেই যে একবার জানায়, তারপর আর আমাদের কোন পত্রাচারই হয়নি। বিশ্বাস করুন, বিপাশাকে রেজেষ্টারী করে পাওয়া আর তার সঙ্গে গোপনে পত্রাচার করা—দুটোই আমি মন থেকে,··· মানে, দুটোর কোনটাতেই আমার মন সায় দেয়নি। দিলে আজ অন্য-রকম ব্যাপার হয়ে যেত।"

এক একবার ক'রে দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে বলছিল। দু'জনের মুখ শান্ত হয়ে এসেছে। দাদা শান্ত কণ্ঠে বললেন—"সেটা আমরা বুঝি বলেই আজ তোমার কাছে এসেছি ভাই। কি ক'রেছি সেসব কথা এনে কোন ফল নেই। আজ একটা কথা তুমি স্বীকার করবে, বিপাশাকে এখান থেকে সরিয়ে নেওয়াটা নিতান্তই দরকার হয়ে পড়েছিল। বিবাহের বয়স হয়ে আসছে, চেষ্টা করছিলাম। এদিকে

বদলীর চেষ্টাও ক'রে আসছিলাম। যতদিন না হয় আমাদের এক আত্মীয়ের কাছে রেখে, উত্তরবঙ্গের এক শহরে—তোমায় বলিই না কেন—জলপাইগুড়িতে চলে গেছি। এখানে অনেকটা জানাজানি হয়ে গিয়ে বিয়ের চেষ্টা বিপজ্জনকই ছিল, দ্বিতীয়, পবে যেখানে যায়, সেখানেও অনেকটা তাই।"

একটু ছেড়ে দিয়ে বললেন—"এবার তোমায় এদিকের কথা বলি, যা আসল কথা, আর যার জন্যেই বিশেষ করে আসা আমাদের। আমার আত্মীয়, যাঁর ওখানে ওকে রাখি তিনি নিজে প্রফেসার, পড়াশুনার দিকে বেশ সুবিধাই ছিল, চলছিলও ভালো, কিন্তু এদিকে বাড়ির অবস্থা দিন দিনই খারাপ হয়ে পড়ে। বাবা মা'র বয়স হয়েছে —আমারই পঞ্চাশ হ'তে চলল, টের পাওয়ার পর থেকে তাঁদের অবস্থা কি রকম হতে পারে আন্দাজ করতে পার। প্রথম ধাক্কাটাতেই তাঁরা একেবারে ভেঙে পড়লেন। তারপর, এই এতদিন ধরে, নানা অবস্থার মধ্যে এই উৎকট সাস্‌পেন্স্ দু'জনে দুভাবে নেন। মাব এটিচ্যুড্‌টা ছিল রাগের, ঘেন্নার—যে-মেয়ে বাড়ির বাইরে পা দিলে, তার সঙ্গে সম্বন্ধটা কি আর ? যেখানে খুশি যাক, যা খুশি করুক। অন্তত প্রথম-প্রথম এই ভাবই, তারপর মা-ই তো। বাবা কিন্তু গোড়া থেকেই একেবারে মুষড়ে পড়েন। একান্তই না দেখলে থাকতে পারতেন না, সেই মেয়েকে এইভাবে হারানো, বুঝতেই পার। স্বাস্থ্য বেশ ভালো ছিল বলেই, তাঁকে এখনও হারাতে হয়নি। তবে, আর কতদিন যে···"

মাথা নীচু করে শুনছিল বীরেশ, "এখুনি আসছি।" ব'লে মুখটা একটু ঘুরিয়ে বাইরে চলে গিয়ে বারান্দাটার একেবারে অন্যদিকের রেলিঙের পাশে দাঁড়াল একটু ঝুঁকে।···ও যে হারিয়েই বসেছে, হঠাৎ সেই স্মৃতিতে অশ্রু নেমে, আর একটু হ'লে আর সামলাতে পারত না নিজেকে, অপ্রতিভ হয়ে পড়তে হোত। মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে সামলে নিয়ে, চোখ দুটো ভালো ক'রে মুছে নিয়ে সমস্তটুকু

চাপা দেওয়ার জন্যে একটু শুনিয়ে বলল—"জগবন্ধু, কত দেরি হবে তোমার একটু চা তৈরি ক'রে আনতে ?"

ভেতরে গিয়ে ব'সে প্রশ্ন করল—"ফিরে গেছে, এখন তাঁরা কেমন আছেন ?"

"অনেকটা ভালো।..."

বৌদিদি বললেন—"বিয়েও তো করতে রাজি হয়েছে..."

বীরেশের মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে পড়েছিল—"হয়েছে নাকি ?" সামলে নিয়ে সহজ কণ্ঠেই প্রশ্ন করল—"কোথায় ঠিক হোল ?"

"সে অনেক কাণ্ড ক'রে ভাই।"—ওর মুখের ভাব লক্ষ্য করবার জন্যে দাদা সোজা দৃষ্টি ফেলে রাখলেন। বৌদিদিও চেয়ে আছেন। বীরেশ শোনবার জন্যে নির্বিকার ভাব নিয়ে বসে আছে, উনি বলে চললেন—"আমরা স্বভাবতই আগে-আগে চাপা দিয়েই চেষ্টা করছিলাম। তার পরিণামটা ভালো হবেনা বুঝে যেখানেই কথা তুলি—স্পষ্টাস্পষ্টি এসব কথা না বললেও ফল হয় না। তুমি জানই, বিয়ের কথা উঠলেই আমাদের মধ্যে ভাংচি আছেই, কোথা দিয়ে যায়ই পেঁাছে, কথা ভেঙে যায়। অকূল পাথারে পড়ে গেছি, তারপর একদিন বিপাশাই ওর বৌদিকে বলল—আগে সব কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে যদি বিবাহ হয় তবেই সে করবে বিবাহ, নয়তো, কথা দিচ্ছে, কোনখানেই করবে না। 'কোনখানে' বলতে বুঝতেই পারছ।

আরও শক্তই হয়ে উঠল। বাবা, মা একটু সামলে উঠছিলেন, আবার ভেঙে পড়লেন। এখানে ওভাবে করবে না, তা থেকে আর কতটুকু ভরসা পাওয়া যায় বলো ? যাওয়ার দিন হয়েছে, এদিকে বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে, এ অবস্থায় ফেলে যাওয়া—বুঝতেই পার তাঁদের মনের অবস্থা।

এই সময় হঠাৎ একটি ছেলে পাওয়া গেল ; পাত্রই বলা ঠিক হবে। একটু বয়স হয়ে গেছে, ত্রিশ-বত্রিশ হবে। হঠাৎই পরিচয় হোল ওঁর সঙ্গে। আমাদের ব্যাঙ্কের এজেণ্ট ট্রানসফার নেওয়া

উপলক্ষ্যে একটা পার্টি ছিল, কি সূত্রে উনিও কার্ড পেয়ে আসেন। দৈবযোগে যে টেবিলে আমি বসি, তার একদিকে তিনিও ছিলেন বসে। যেমন আজকাল এইসব ক্ষেত্রে প্রায়ই হয়, বর্তমান রাজনীতি আর সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের আলোচনা চলছিল।···দেখলাম বেশ উদার মতের মানুষ।···এইখানে তোমায় একটা কথা বলে রাখি ভাই। যুগের হাওয়া বদলাচ্ছে, এত বাঁধাবাধি আর বেশিদিন চলবে না (বৌদিদিকে দেখিয়ে)—উনি বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, এটা তোমার আশ্চর্য লাগবে, আমি না করে পারিনা। কি হোত না হোত সে কথায় এখন লাভ নেই, এখন দেখছি—এইটে শেষ চান্স—এইটে হাতছাড়া হয়ে গেলে বাবাকে তো ধরে রাখতে পারা যাবেই না—মার বুকে ছুটো ধাক্কা, মাকেও হারাতে হবে—বাবা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ, পূজাপার্বণ নিয়ে থাকতেন, এখন···”

গলাটা ধরে এসেছে, বীরেশও আর সামলাতে না পেরে—“কত দেরি করছে।” বলে উঠে পড়ল। এবার যেটুকু বিলম্ব হোল, তাতে জগবন্ধু আর দামোদর চা-খাবার নিয়ে ওর সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে এসে সাজিয়ে রাখতে লাগল। বসতে বসতে ঘরের থমথমে ভাবের জন্যেও বীরেশের দৃষ্টি অনিচ্ছাকৃতভাবেই ছু'জনের মুখের ওপর থেকে ঘুরে এল। যুগের হাওয়ার কথা তুলতে গিয়ে ওঁরা যেন ছু'দিকের ট্র্যাজেডীতে অভিভূত হয়ে গিয়ে থাকবেন। ওর অনুপস্থিতির সুযোগে ভালো করে চোখ মুছে নেওয়ার চিহ্ন রয়েছে।

চা-খাবার-জলের গেলাস গুছিয়ে রাখার মধ্যে তিনজনেরই নিজেদের একটু সামলে নেওয়ার সময় হয়েছে। “এত করতে গেলে কেন?” বলে উনি চায়ের কাপটা তুলে নিলেন। বৌদিদিও।

বীরেশ নিজেরটা তুলে নিয়ে, আর সব বাদসাদ দিয়ে প্রশ্ন করল—“ঠিক হয়ে গেল?”

“একরকম। ওই দিকেই মন রয়েছে, কি খেয়াল হতে খোঁজ নিলাম—ব্রাহ্মণ। তবে, আধুনিক ব্রাহ্মণই—একটু এ্যাডভেনচারার

(adventurer) গোছের, তারই ঝোঁকে বিলাত পর্যন্ত ঘুরে এসে এখন এখানে ওঁর বড় বোনের কাছে এসে উঠেছেন। তিনি বিধবা, লেডি-ডাক্তার। ওঁর কাছে থেকে এবার কিছু একটা করতে চান। অবিবাহিতই—ঘোরা-ফেরার ঝোঁকেই বিবাহ করা হয়ে উঠেনি। শিক্ষিতই। এবার এখানে ব'সে কিছু একটা করতে চান। তাঁদের সব কথাই বলেছি আমরা। রাজি। এখন···"

"বুঝেছি। অন্তরায়—এখন আমি, পেছনকার সব ইতিহাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।···একটু মাফ করবেন আমায়, এখুনি আসছি।"

এবার বাইরে গিয়ে অনেকক্ষণ রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। একটা সংকল্পে কঠিন ক'রে নিতে চাইছে মনটা, অথচ যেন সেটাকে স্পষ্ট রূপ দিতে পারছে না। তারপর হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ চমকে স্পষ্ট হয়ে উঠল সেটা।···পেয়ে গেছে। ওঁরা অল্প-স্বল্প একটু মুখে দিয়ে হেঁট মুখে অপেক্ষা করছিলেন, আস্তে আস্তে এসে বসল। একটু অন্যমনস্ক মুখটা কিন্তু তার মধ্যেই কী একটা দীপ্তি ফুটে রয়েছে। বলল—"আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, আমাদের পূর্ব সম্বন্ধের কোন চিহ্নই থাকতে দোবনা।"

ওঁরা মুখ তুলে চাইলেন, মুখের করুণ অথচ দৃঢ় ভাবটা দেখে শঙ্কিত হয়েই দু'জনে একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠলেন—"কী করবে?···কী করতে চান আপনি?"

দাদা আলাদা করে স্পষ্ট করে দিলেন ওঁদের মনোভাব—"তাহলে থাক, যেমন আছে···ওর অদৃষ্ট!"

বীরেশ একটু মলিন হেসে বলল—"না, যা ভয় করছেন, তা নয়।"

"তবে?"—দু'জনেই উদ্বেগের সঙ্গে বললেন। দাদা প্রশ্ন করলেন—"যেমন আছ, তেমনি থাকতে চাও?"

"তাও কি নিরাপদ? তাতেও তো···"

ছেড়ে দিয়ে বলল—"আপনারা অন্যায় করেই ভিক্ষা চাওয়ার কথা বলেছিলেন। এবার আমি চাইছি, দেবেন?"

"কি বলো।"

"একবার বিপাশার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

দু'জনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। প্রচণ্ড দ্বিধা, তখুনি কিন্তু কাটিয়ে দাদা বললেন—"হবে। আমরা তিনজনেই শ্যামবাজারে এক আত্মীয়ের বাড়ি উঠেছি, ওকেও এনেছি। যদি হয়ই কোন প্রয়োজন, এই ভেবে। তাঁরা, অবশ্য, এসব কিছু জানেন না।..."

"না, সেখানে যেতে পারব না। এখানেই আনবেন। কয়েক মিনিটের বেশি দরকার হবে না। আপনারাও অবশ্য সঙ্গে আসবেন।"

"আসবে। কালই তাহলে এই সময়। এখন উঠলাম তাহলে।"

উঠে পড়লেন দু'জনে। বীরেশ সঙ্গে সঙ্গে নেমে গিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে এল।

তখনই জগবন্ধুকে ধরণীর নামে একটা চিঠি দিয়ে সাইকেলে ক'রে অঙ্গনায় পাঠিয়ে দিল। একটা বিশেষ কারণে, সাক্ষাতে জানাবে—ও যেন একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে পরের দিনও বাড়িতেই থেকে যায়। কোন একটা ছুতো খাড়া ক'রে জগবন্ধুকেও আটকে রাখে।

চব্বিশ

পরদিন বিকালে বারান্দার শেষের দিকে বাইরে মুখ করে বসে ছিল। অনেক স্মৃতি-বিজড়িত; এইখানেই একদিন বিপাশার মাথায় চাঁপা-ফুল পরিয়ে দেয়। পাশে চায়ের ছোট টেবিলটা আর একটা খালি চেয়ার। চাকরটাকেও একটা ঘণ্টা দু'য়েকের ফরমাস ক'রে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে। বাড়িটা একেবারেই শূন্য ক'রে দরজা খুলে একা বসে ছিল, "বীরেশ আছ?"—প্রশ্ন শুনে ঘুরে চেয়ে দ্যাখে সিঁড়ির মাঝামাঝি বিপাশার দাদা আর বৌদিদি; তাঁদের পেছনে বিপাশা। "আসুন।"—বলে উঠে দাঁড়াতে বললেন—"বিপু এসেছে। আমরা নীচেই আছি।"

বাড়ির দেয়ালের মধ্যেই খানিকটা জমিতে চাকরেরা একটা তরি-তরকারির আর কিছু সাধারণ ফুলের বাগান করেছে ; আদত বাড়িটার একটু আড়ালেই পড়ে যায়, ওঁরা দু'জনে সেইদিকে চলে গেলেন। বীরেশ এসে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াল।

একবার দেখে নিয়ে বিপাশা যেন দেহটাকে টেনে নিয়ে তুলছে। দু'জনে সামনাসামনি হয়ে বসল।

"আমায় ডেকেছেন ?"—প্রশ্ন করল বিপাশা।

"আজ তোমায় একটি কথা বলবার জন্যেই ডেকেছি।"

বিপাশা প্রতীক্ষায় দৃষ্টি তুলে চাইল।

"আর সব কথা, যেদিন তোমায় ফিরিয়ে দিই সেই দিনই বলা হয়ে গেছে। তোমায় প্রাণমন দিয়ে চেয়েছিলাম বলেই—আজও আমি বদলাইনি বলেই, ফিরে যেতে বলি। কাল দাদার মুখে, তুমি রাজি হয়েছ শুনে, অনেকটা স্বস্তি পেয়েই···"

চোখের জল নেমেই ছিল, "পেয়েছেন স্বস্তি ?"—ব'লে দুটো বাহুর বেষ্টনীতে মাথা গুঁজড়ে পড়ল টেবিলে। মুখে চাপা গলায় "উঃ! উঃ!—কী আমার দোষ ?—কেন এমন হোল ?···"

বীরেশ কাঁধে হাত রেখে বলল—"তার বিচার তো আজকের এ-যুগ করতে পারে না। সে সত্যদৃষ্টি তার এখনও হয়নি। তবে, তার আর বেশি দেরিও নেই বিপু। থাক সে পরিশুদ্ধ, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা। আমি তোমায় ডেকেছি একটি কথাই বলতে আজ। একটা জীর্ণ সংস্কারের সামনে আমরা দু'জনে বলি হয়ে চলেছি।—আমি একাই নই, এই সংস্কারের নিষ্করুণ দাবীতেই আমি মাকেও হারিয়েছি —উঃ, আমি মাতৃহন্তা বিপু!···"

আটকে আটকে বলে যেতে যেতে ও-ও টেবিলে মাথা গুঁজড়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত কে কাকে সান্ত্বনা দেয়।

এক সময় উঠে আবার রুদ্ধস্বরে আরম্ভ করল—"কাল তোমার দাদার মুখে শুনে, তুমিও যাতে এই পাপে লিপ্ত হয়ে না পড়,

তার মাত্র একটি উপায় হিসাবে, আমি একটা কাজ করেছি বিপু…"

"কী কাজ?"—ভীত-চকিতভাবে উঠে বসল বিপাশা। গাল দুটো অশ্রুতে ভিজে গেছে।

"না, তোমার দাদা যা ভয় করছেন তা নয়। দেখছ, তোমার সামনেই ব'সে আছি।…আমি…আমি বিবাহ করেছি বিপু!"

"কবে? কোথায়?"—তীব্র কৌতূহ'ল মুখের দিকে একটু চেয়ে রইল, তারপরেই আবার লুটিয়ে পড়ে—"উঃ! কেন হোল এমন? কী করেছিলাম আমি?…"

"কবে, কোথায়—সে-প্রশ্ন আর আসে না বিপু"—ধীরে ধীরে পিঠে হাতটা টানতে টানতে বলে চলল বীরেশ। তোমার অপরাধের পথ বন্ধ করতে, এই একটি উপায়ই ছিল। চুপ করো বিপু। তোমায় এইটুকুই বলতে ডেকেছিলাম। আমায় ভুল বুঝো না। ওঠ; লক্ষ্মীটি। আমি শুধু একটা দুর্বিপাক দিয়ে আর একটা অনেক বড় দুর্বিপাক বাঁচাবার চেষ্টা করেছি।…ওঠ।"

দাঁড়িয়ে উঠেও যেন চলবার শক্তি হারিয়েছে বিপাশা। কয়েকবার চাপা কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠল। তারপর সিঁড়িতে নেমে রেলিঙে হাত চেপে আস্তে আস্তে নেমে গেল। ওঁরা এগিয়ে এসেছেন, দরজা পর্যন্ত গিয়ে বিদায় দিয়ে উঠে এল বীরেশ।

পরদিন সকালেই চাকরটাকে দিয়ে বাজার থেকে একটা ট্যাক্সি আনিয়ে একেবারে বোষ্টমপাড়া পর্যন্ত যাওয়া-আসার ফুরণ করে বেরিয়ে পড়ল বীরেশ। যেন একটু বিলম্ব হলেও সংকল্প শিথিল হয়ে গিয়ে সব ভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে; অনিশ্চিতকে লক্ষ্য করে যাত্রাও।

যখন নামল ট্যাক্সি থেকে, তখন ঘড়িতে সাড়ে দশটা। পাড়াগাঁ জায়গা, মোটর দেখলেই ভীড় জমে যায়; বাড়ি থেকে বেশ কয়েক রশি দূরে মোটর দাঁড় করিয়ে হেঁটে বাড়িতে গিয়ে উঠল। সামনের

রকে প্রৌঢ়ার মেয়েটি হাঁটু গেড়ে বসে ভাইকে স্কুলের জন্যে জামাজুতো পরাচ্ছিল, ঘুরে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। বীরেশ প্রশ্ন করল—"মা বাড়িতে নেই ?"

"না, তিনি কাছেই একজনের বাড়ি গেছেন।"—শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর হোল।

"আগে গিয়ে ডেকে দাও। তুমি থেকেই যেও, ওঁর সঙ্গেই কথা।"

ও চলে গেলে ছেলেটিকে প্রশ্ন করল—"স্কুলে যাচ্ছ খোকা ?"

"হ্যাঁ"।—উত্তর করল ছেলেটি।

"দিদি দিয়ে আসে ?"

"না, এই তো কাছেই।"

"হয়ে গেছে তোমার ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে যাও। দেরি হয়ে যাবে, না ?"

ছেলেটি মাথা দুলিয়ে পাশে-রাখা বইখাতা তুলে নিয়ে চলে গেল। মিনিট দুয়েক পরে প্রৌঢ়া একটু হন্তদন্ত হয়েই এসে উপস্থিত হলেন।

"কি বাবা, হঠাৎ অসময়ে তুমি যে !"—উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করলেন।

"আপনার মেয়ের বিয়ের পাকাপাকি হয়ে গেছে সেখানে ? দিন তারিখ···"

"হয়েই গেছল। তোমায় লিখব ; এমন সময় হঠাৎ এক বিপদ। ভালো হয়েও বিপদই বলব না তো কি বলব বাবা ?"

"কি হয়েছে ?"—তীব্র কৌতূহলে চোখ দুটো জ্বলছে বীরেশের।

"ছেলে পরীক্ষা দেবে এই জানতাম। এখন শুনছি ওটা একটা ভাঁওতা ছিল। পরীক্ষা দিয়ে ফেল করা ছেলে। আমাদের গরীবের ঘরে পাস আর ফেল ! তাইতেই রাজি হয়ে পণ-টন ঠিক হয়। দুদিন হোল চিঠি এসেছে, ছেলে সাপ্লিমেণ্ট্ না কিসে পাস করেছে ; অত কমে হবে না। অকুলপাথারে পড়ে গেছি বাবা। আজই তোমায়

লিখতে যাচ্ছিলাম, রাধারমণ তোমায় আনিয়ে দিয়েছেন। এখন কি করি বলো।"

চোখে হঠাৎ জল এসে যেতে আঁচল তুলে নিলেন।

"আমায় মেয়ে দিতে আপত্তি আছে আপনার ?"

"কী বলছ বাবা ! তুমিও ঠাট্টা করবে ?···চারিদিকে টিট্‌কিরিতে টেঁকতে পাচ্ছি না।···"

আরও যেন কিরকম হয়ে গিয়ে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে আছেন : বীরেশ বলল—"যে সম্বন্ধটা পাতাতে চাইছি সেটা তো ঠাট্টার সম্বন্ধ নয়। আপত্তি থাকতে পারে বলেই বলছি। আপনারা জাতটাত মানেন ?"

"তা মানি বৈকি বাবা। কথায় যে বলে—"জাত খোওয়ালেই বোষ্টম"—আমরা সে-বোষ্টম তো নই···আমরা হচ্ছি মূলে···"

"ব্রাহ্মণ ?"

"না বাবা, অত উঁচু নয়।"

"তাহলে বোধহয় ঠিক আছে। আমরা কায়েৎ।"—আরও বিশদ ভাবে কুলশীলের পরিচয় দিচ্ছিল -উনি আশানিরাশার মধ্যে দোল খেয়ে বললেন —"চলবে বাবা।···অবিশ্যি তুমি যদি সত্যি ক্ষ্যামাঘেন্না করে নাও। আমরা অতটা উঁচুতে নয়।"

"ক্ষমা-ঘেন্নার কোন কথাই নেই। দয়াটা তো আপনার দিকেই। ব্রাহ্মণ হলে তো ··"

হঠাৎ চোখে জল এসে যাওয়ায় মুখটা ঘুরিয়ে নিতে উনি উদ্বিগ্ন-ভাবে প্রশ্ন করলেন —"কী হোল বাবা ? · থেমে গেলে যে ?"

"না। তেমন কিছু নয়।"—চোখ মুছে নিয়ে ঘুরে বলল—"বলছিলাম ব্রাহ্মণ হলে তো পেতাম না এ দয়াটুকু। তাহলে যাই আমি, বিশেষ কাজ আছে। আপনি ওখানে নাকচ করেই লিখে দিন। শীগ্‌গিরই আমার মাসীমা মাসতুতো ভগ্নীপতি এসে দিনক্ষণ ঠিক করে যাবেন। এখন আসি।"

যেন ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না কথাগুলা, এইভাবে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন, যাওয়ার কথায় চটক ভাঙল। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে উঠলেন —"ও বাবা, সে কি হয়! আজ আমার—আজ আমার—কি বলব—এমন শুভদিন—যদিও স্বপ্নই ব'লে মনে হচ্ছে…"

"নিতান্তই আপনার শুভদিন তো, আপনার নাড়ুগোপালের দুটো নাড়ু দিন।"—একটু ম্লান হেসে বলল বীরেশ।

দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল। উনি ভেতরে চলে গেলে দৃষ্টি আকাশলগ্ন করে দাঁড়িয়েই ছিল, বেরিয়ে এলে রেকাবি থেকে চারটে নাড়ুর দুটো তুলে নিল।

এই প্রথম হেঁট হয়ে প্রণাম ক'রে বেরিয়ে গেল।

মাস চারেক পরের কথা।

একদিন মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি থেকে 'অঙ্গনা'র চিঠিপত্র দেখে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরতে নববধূ মল্লিকা একটা খাম হাতে দিয়ে বলল —"আজকের ডাকে এসেছে।"

শিলিগুড়ির পোস্টাফিসের ছাপ। একটু ত্রস্ত হাতেই খামটা ছিঁড়ে পড়ল বীরেশ—

আমার স্বামী উদার মতের মানুষ। একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছি, যা আমাদের জীবনে হোল না। আমাদের সন্তান, যেদিকে যেমন হোক, বিবাহসূত্রে দুটি পরিবার বেঁধে ফেলবে। ততদিনেও যদি যুগের হাওয়া না বদলায় তো আর কতদিন অপেক্ষা ক'রে থাকব! সম্মতি দিয়ে একটা চিঠি দেবেন। এই আমাদের শেষ চিঠি।

বিপাশা

ঠিকানা

C/o ডাক্তার হরিপ্রিয়া চৌধুরী, এম. বি.

মল্লিকা দাঁড়িয়েই ছিল, প্রশ্ন করল—"খবর ভালো তো?"

"ভালোও নয়, মন্দও নয়।"—একটু অন্যমনস্কভাবে চেয়ে থাকল বীরেশ; বলল—"একদিন শুনবে'খন।"

সমাপ্ত